# গৃহ-বিজ্ঞানের কথা



জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক **সপ্তম** ও **অষ্টম শ্রেণীর** পাঠ্যরূপে **অনুমোদিত**
বিজ্ঞপ্তি নং সিল/৮০।৫৪, তাং ২৭।১২।৫৪ [কলিকাতা গেজেট, ২০।১।৫৫ দ্রষ্টব্য]

# গৃহ-বিজ্ঞানের কথা

**[ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য ]**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডোমেষ্টিক সায়েন্স বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষা,
বিহারীলাল কলেজ অব্ হোম এণ্ড সোস্যাল সায়েন্সের
প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা,
বিহারীলাল মিত্র ফেলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট'
ও 'ফ্যাকাল্টি অব্ এডুকেশন'-এর প্রাক্তন সদস্যা
***জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা***, এম.এ., বি. টি., টি. ডি. (লণ্ডন)
প্রণীত

এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সিনেটের সদস্য
***ডক্টর নীরজনাথ দাশগুপ্ত***, এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
এফ. এন. আই., কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

প্রাপ্তিস্থান :
**জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স**
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : জি. দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড সন্‌স
৪৪ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৬
তৃতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৮
চতুর্থ সংস্করণ—মে, ১৯৫৯
পঞ্চম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৬০
ষষ্ঠ সংস্করণ—মার্চ, ১৯৬১
সপ্তম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৬১
অষ্টম সংস্করণ—মার্চ, ১৯৬৩
নবম সংস্কবণ—জানুয়ারী, ১৯৬৪
দশম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫
একাদশ সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৬৬
(পরিমার্জিত ও পরিশোধিত)
দ্বাদশ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬
ত্রয়োদশ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭
চতুর্দশ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮
(পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
পঞ্চদশ সংস্করণ—মার্চ, ১৯৬৯
(পরিমার্জিত ও পরিশোধিত)







মুদ্রাকর :
শ্রীরাধেশ্যাম সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৩।১, হায়াৎ খান লেন,
কলিকাতা-৯



মূল্য—তিন টাকা সতের পয়সা

# সূচীপত্র

## সপ্তম শ্রেণী

### *প্রথম অধ্যায়*



### *দ্বিতীয় অধ্যায়*

## তৃতীয় অধ্যায়

## গৃহ-পরিচালনা ( House Management)

## চতুর্থ অধ্যায়

### খাদ্য ( Food )

# অষ্টম শ্রেণী

## প্রথম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

### গৃহ ( The House )



## দ্বিতীয় অধ্যায়

### গৃহ-সজ্জা ( House Decoration )

## তৃতীয় অধ্যায়

## গৃহ-পরিচালনা ( House Management )

## চতুর্থ অধ্যায়

## খাদ্য ( Food )

# সপ্তম শ্রেণী

## গৃহ

### গৃহ ও উহার বিভিন্ন অংশ

***গৃহনির্মাণ ও সভ্যতার সূচনা***—হাজার কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে জানিত না। তোমরা রবিন্‌সন ক্রুশোর কথা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। তখনকার মানুষ বন্য জন্তু জানোয়ার বা ঝড় বৃষ্টির হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য রবিন্‌সন ক্রুশোর মতই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইত। বেশির



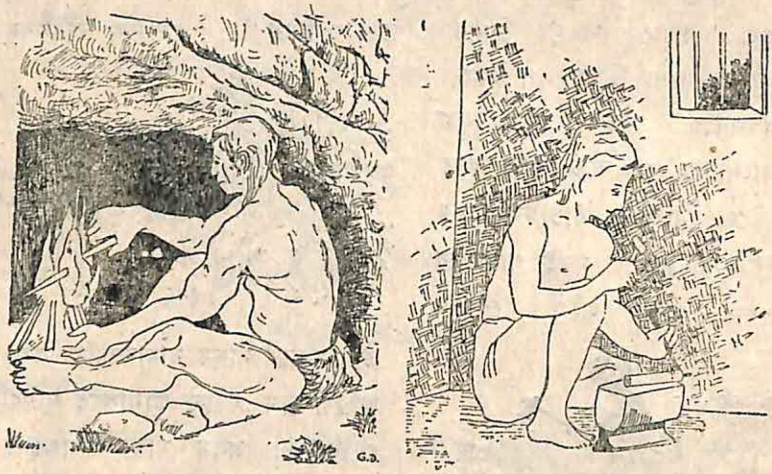


ভাগ সময়েই মানুষ যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখিল; তামা, লোহা প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহারও উহাদের আয়ত্তে আসিল এবং সেই সঙ্গে জমি চাষ করিয়া জমি হইতে



ফসল উৎপাদনের চিন্তাও উহাদের মনে দেখা দিল। মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা হইল। মানুষ বুঝিতে পারিল স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপালন কিংবা চাষ-বাস অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং জমি হইতে যতদূর সম্ভব নিকটস্থ কোন স্থানেই স্থায়িভাবে বসবাস করা আবশ্যক।

মানুষের এই স্থায়িভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তার মধ্য হইতেই গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করিল। যাযাবর জীবনের গিরিগুহা বা খড়কুটার তৈয়ারি পথের তাঁবু পিছনে পড়িয়া রহিল। অধিকতর স্থায়ি এবং উন্নততর জীবনযাত্রার উপযোগী গৃহনির্মাণে মানুষ সচেষ্ট হইল। বিভিন্ন উপাদানের তৈয়ারি বিভিন্ন ধরনের গৃহাদি যাহা তোমরা দেখিতে পাও তাহা ঐ প্রচেষ্টার

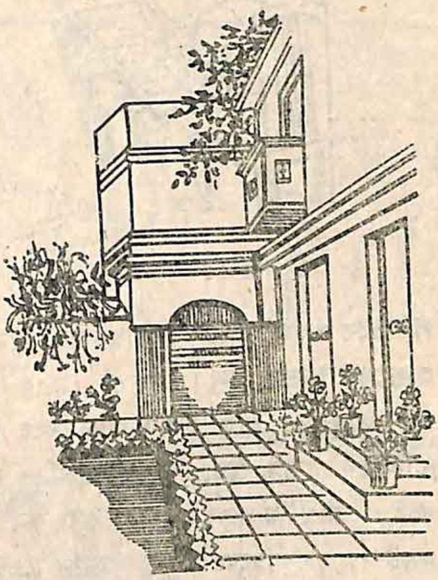


গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ গৃহবাসী মানুষে পরিণত হইল

ফল। কোথাও বা খড়ের ছাউনি কুঁড়েঘর, কোথাও বা টিনের চালা, কোথাও বা মাটির কোঠা কোথাও বা আবার ইটের গাঁথুনির বড় বড় পাকা দালান। প্রকৃতপক্ষে যেদিন হইতে মানুষের মনে চাষ-বাসের চেষ্টা আসে, সেই দিন হইতেই সভ্যতার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই দিন হইতেই গুহাবাসী অরণ্যাচারী আদিম মানুষ গৃহবাসী মানুষে রূপান্তরিত হইল। বস্তুতঃ ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিবার পরিকল্পনা সভ্যতার পথে মানুষের একটি বিরাট পদক্ষেপ।

***বাসগৃহ***—কেবলমাত্র একখানি ঘর হইলেই কিন্তু গৃহ হইল না। স্থায়িভাবে বসবাস করার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন বিভিন্ন প্রয়োজন সম্বন্ধেও সজাগ হইয়া উঠে। গোপালন করিতে গেলে গোশালার প্রয়োজন,

আহার্য প্রস্তুত করিতে হইলে রান্নাঘরের প্রয়োজন, নিদ্রার জন্য প্রয়োজন শয়নঘরের। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। একটি সু-সম্পূর্ণ গৃহ বলিতে সেই গৃহকেই বুঝায়, যে গৃহের মধ্যে ভোজন, শয়ন, রন্ধন, স্নান, পূজা, শিশুদের পড়াশুনা, খেলাধূলা বা বড়দের আমোদ-প্রমোদ, গল্প-গুজব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি-প্রয়োজন পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। শয়নঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর, বৈঠকখানা, শিশুদের খেলাঘর, আঙিনা, উঠান বা গৃহ-প্রাঙ্গণ, ফুলের বাগান ইত্যাদির সম্মেলনেই একখানি সু-সম্পূর্ণ বাস-গৃহ। তোমরা অনেকেই পল্লী গ্রামের জমিদার-বাড়িগুলির কথা শুনিয়াছ। পুরাতন জমিদার-বাড়িগুলি প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুইটি অংশে বিভক্ত—'সদর মহল' ও 'অন্দর মহল'। জমিদারের কাছারি, পূজার দালান, বৈঠকখানা-ঘর ইত্যাদি থাকিত সদর মহলে, আর অন্দর মহলে থাকিত শয়ন ঘর, রাঁধিবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি। দুই মহলের মধ্যে থাকিত একখানি বড় উঠান।



জমিদার বাড়ি

***সুন্দর গৃহ-পরিবেশ***—তোমার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম এইরূপ বাসগৃহ তৈয়ারির পরিকল্পনা করিতে হইবে। বাসগৃহ বলিতে গৃহ এবং তাহার সংলগ্ন উঠান, বাগান ইত্যাদি বুঝিতে হয়। গৃহের কোন্ অংশটি কাহার পর আসিবে, কোন্ অংশটির **প্রাধান্য** কতখানি, কোন্ অংশের দরজা-জানালা কোন্ দিকে বসাইলে বায়ু চলাচলের **সুবিধা** হইবে, এই সমস্তই

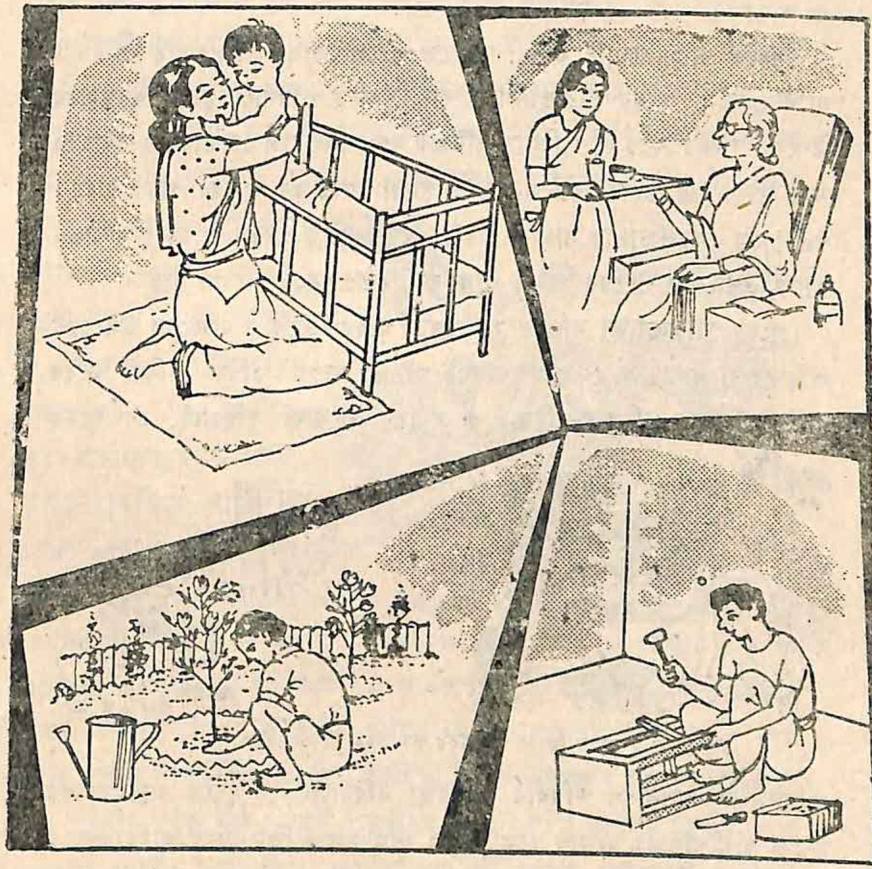
বিশদভাবে বিবেচনা করিয়া তবে একটি বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হয়। আবার ইহাও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যাহাতে বাসগৃহের প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে, কারণ তাহা না হইলে বিভিন্ন অংশ মিলিয়াও সম্পূর্ণ বাসগৃহের সৌন্দর্য আসিতে পারে না। এখন দেখা যাউক, গৃহ বলিতে আসলে কি বুঝায়, উহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাই বা কি। গৃহ বলিতে কেবলমাত্র একটি আচ্ছাদিত স্থানই বুঝায় না। মানুষের বসবাসের উপযুক্ত ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম, এইরূপ সু-আচ্ছাদিত স্থানকে গৃহ বলা যায়। তাই **গৃহ মানুষের আশ্রয় স্থল।** গৃহ যে কেবল মানুষকে বন্য জন্তু-জানোয়ার বা চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করে তাহা নহে—ঝড়-বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শীত, সূর্যতাপ প্রভৃতির হাত হইতেও মানুষকে রক্ষা করে গৃহই। কিন্তু মানুষের গৃহের প্রয়োজন কেবলমাত্র তাহার নিরাপত্তার জন্যই নহে। মানুষের নিকট গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত। এখনকার মানুষের নিকট ঘর নিরাপদের, ঘর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের। আজকাল গৃহ বলিতে বুঝায় একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, যাহার মধ্যে দেহ ও মন দুই-ই সমানভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে। এই কারণেই মানুষের জীবনে গৃহের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ও ব্যাপক।



গৃহ রচনায় দেখিতে হইবে

***আদর্শ গৃহ***—গৃহবাসী মানুষের সমষ্টিই হইল সমাজ। গৃহই আনিয়া দিয়াছে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক দায়িত্ব ও চেতনা। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর গৃহ এবং গৃহ-পরিবেশের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, উভয় প্রকার

জীবনেই ইহার মূল্য অনেক। কেবলমাত্র একখানি দালান বা একটি বাসাবাড়ী হইলেই, উহা গৃহ হইল না। **গৃহের অর্থ—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ, সু-সম্পূর্ণ ও শ্রীমণ্ডিত মানুষের একটি আশ্রয়স্থল।** সেই গৃহই আদর্শ গৃহ, যে গৃহের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, ছোট-বড় প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য কর্ম ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। অধিবাসীদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যে গৃহ শিশু,



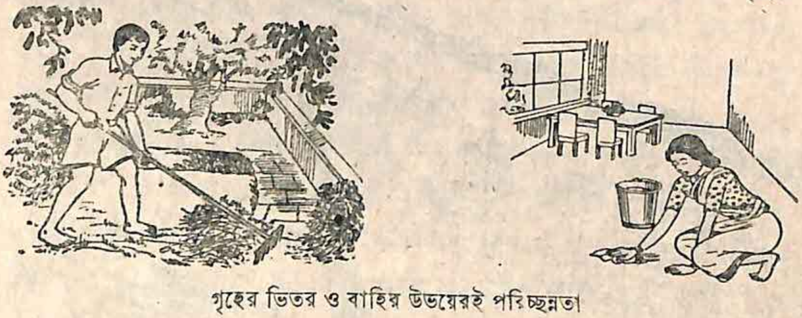
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচে

যুবা ও বৃদ্ধ প্রত্যেকের পক্ষেই বাসোপযোগী এবং যে গৃহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আকর হইয়া গড়িয়া উঠে, সেই গৃহই আদর্শ গৃহ। আহার, বিহার, বিশ্রাম,

নিদ্রা, শয়ন. রন্ধন, স্নান, শিশু-পালন, শিশু-শিক্ষা, অতিথি-সেবা, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন সাধনের যেখানে সুব্যবস্থা রহিয়াছে ও সুশৃঙ্খলভাবে যেখানে অভীষ্ট সাধিত হয়, সেই গৃহই যথার্থ গৃহ। সেই গৃহই যথার্থ বাসোপযোগী, যে গৃহে আলো-হাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা-নিষ্কাশন প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। বস্তুতঃ গৃহ ও গৃহের নিকটবর্তী স্থানসমূহের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের উপরেই নির্ভর করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম।

গৃহকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে উহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। গৃহের পরিচ্ছন্নতা আবার অনেক পরিমাণে গৃহের অবস্থানের উপরেও নির্ভর করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহ কেবলমাত্র যে স্বাস্থ্যের সহায়তা করে তাহা নহে, উহার একটি অনবদ্য শ্রী গৃহবাসীদের মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখে। পল্লীগ্রামে এখনও চাষীর সামান্য একটি খড়ের বাড়ি যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, এখনকার শহরের অনেক পাকা বাড়িতেও সেইরূপ দেখা যায় না।

গৃহের **পরিচ্ছন্নতা** বলিতে সাধারণতঃ গৃহের ভিতর ও বাহিরের উভয়েরই পরিচ্ছন্নতা বুঝায়। যে গৃহে শয়নঘর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি ঘরের প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ **সংন্যস্ত** রহিয়াছে, যে গৃহের



গৃহের ভিতর ও বাহির উভয়েরই পরিচ্ছন্নতা

আবর্জনাদি অপসারণ করিবার সুব্যবস্থা রহিয়াছে, যে গৃহের আশেপাশের উন্মুক্ত স্থান পরিচ্ছন্ন থাকার ফলে নির্মল বায়ু গৃহের ভিতরকার আবহাওয়াকে মনোরম করিয়া তোলে, সেই গৃহকেই একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ বলা হয়।

পরিচ্ছন্নতার পরেই আসে **গৃহ-সজ্জার** কথা। মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেমন গৃহের পরিচ্ছন্নতার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গৃহ-সজ্জার। গৃহ-সজ্জা যে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার তাহা নহে, অতি

সাধারণ জিনিস দিয়াও বাসগৃহ সুচারুরূপে সাজানো যাইতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের উপরেই গৃহ-সজ্জার সম্পূর্ণতা নির্ভর করে। পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত গৃহই গৃহস্থকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। মানুষ যেখানে বাস করে সেই স্থান ও সেই স্থানটিকে ঘিরিয়া যে পারিপার্শ্বিক, উহা সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ও শ্রীমণ্ডিত থাকিবে, ইহাই মানুষ কামনা করে। কাজেই যেমন-তেমন করিয়া বাস করিলেই হইল না, যাহাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে বাস করা যায়, সেইভাবে প্রত্যেক গৃহকেই শ্রী-সম্পন্ন ও সু-ব্যবস্থিত করিয়া গড়িয়া তোলার প্রতি প্রত্যেক গৃহস্থেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

**গৃহ-উদ্যান**—গৃহ-উদ্যানের দ্বারা গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। এই জন্য যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা সাধারণতঃ গৃহনির্মাণ করিবার সময় বাসগৃহের সংলগ্ন কিছুটা স্থান উদ্যানের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়া দেন। গৃহ-উদ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনেক। স্বল্প পরিসরে ছোটখাট একটি বাগান থাকিলে উহা গৃহের অধি-বাসীদের অবসর বিনোদনে সহায়তা করে। গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও অন্যান্য পরিজনেরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু সময় বাগানের কাজে অতি-বাহিত করিতে পারেন ও খোলা আকাশের তলায় উন্মুক্ত স্থানে প্রত্যহ এই-ভাবে পরিশ্রম করিলে সকলের শরীর-মন সহজেই সতেজ ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। দিনের শেষে নিড়ানি দিয়া মাটি কাটা, গাছের গোড়ায় জলসেচ, সার দেওয়া, বীজ বপন প্রভৃতি কাজগুলির মধ্য দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির সঞ্চালনের ফলে দেহ সুগঠিত হইয়া উঠে। এই পরিশ্রমের পুরস্কার হইল বাগানে বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত ফুল-রাশি। গৃহ-উদ্যানের এই পুষ্পের সৌরভেই সান্ধ্যবায়ু সুরভিত হইয়া উঠে এবং গৃহের আবহাওয়াকে মনোরম করিয়া তোলে।



শরীর ও মন সহজেই সতেজ হইয়া উঠিতে পারে

গৃহ-উদ্যান কখনও একের চেষ্টায় সুরচিত হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্যান-রচনা সমবেত চেষ্টার ফল। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে

সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই গৃহ-উদ্যান গড়িয়া উঠে। উদ্যানের মধ্য দিয়াই গৃহের সকলের একসঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ ঘটে এবং প্রকৃতির সঙ্গেও সকলের যোগাযোগ গভীর হয়। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও বর্ণের মধ্য দিয়াই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। বিভিন্ন ফুল, ফুলের বিভিন্ন পাতা, কোন্ ঋতুতে কি ফুল হয়, কোন্ গাছের কি সার প্রয়োজন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়েই বাগানের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-লাভ পূর্ণ হইতে পারে। আবার উদ্যান-রচনার মধ্য দিয়া ছোট-বড় সকলেই সৃষ্টির আনন্দ লাভ করিতে পারে। যখন চারাগাছটি বড় হয় ও তাহাতে ফুল ফোটে তখন ইহা নিজেদের সৃষ্টি মনে করিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। সৃষ্ট বস্তু হইতে ক্রমেই মানুষের মন—সৃষ্টি-কর্তার প্রতি ধাবিত হয় এবং তাঁহার অসীম শক্তির কথা স্মরণ করিয়া মন মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

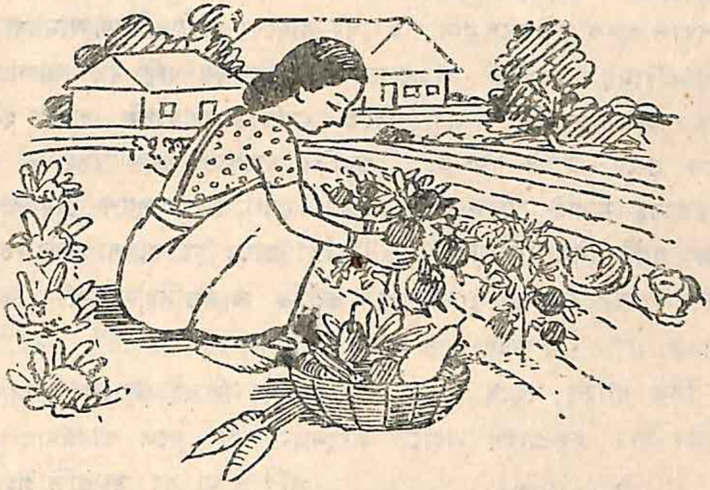


শিশু-শিক্ষায় সূচনা

মনের শান্তি ও সমতা রক্ষার জন্যই গৃহ-উদ্যানের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। কর্মকোলাহল-মুখর দিনের শেষে মানুষের মন স্বভাবতঃ শান্তি খুজিয়া বেড়ায়। সে-সময়ে গৃহ-উদ্যানে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্লান্ত মানুষের মন শান্ত হয়। সন্ধ্যার বাতাস, প্রস্ফুটিত ফুল, পাখীর কল-গান—সব কিছুর মধ্যেই যেন মানুষ প্রকৃতির কোমল স্পর্শ লাভ করিয়া পুলকিত হয়।

উদ্যান-রচনার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সুরুচিরও বিকাশ হয়। উদ্যান-রচনা একটি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। কোন্ গাছটি কোথায় লাগাইতে হইবে এবং দুইটি গাছের মধ্যে কতটুকু ব্যবধান প্রয়োজন, কোন্ ফুলের গায়ে কোন্ ফুল লাগাইলে বর্ণ-বৈচিত্র্য মনোরম হইবে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান উদ্যান-রচনায় একান্ত আবশ্যক। এই জ্ঞান যাহার যত নিখুঁত, রুচিও উহার তত উন্নত। উদ্যান-রচনা মানুষের রুচিকে বিকশিত করিয়া তোলারই একটি উপায়।

**সব্‌জি-বাগান**—অনেকে আবার গৃহপার্শ্বে সব্‌জি-বাগানও করিয়া থাকেন। সব্‌জি-বাগান রন্ধনগৃহের সংলগ্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহা হইলে ভাতের ফেন, চাউল-ধোওয়া জল ইত্যাদি জিনিসগুলি অন্যত্র না ফেলিয়া ড্রেনের সাহায্যে সব্‌জি-বাগানের মধ্যেই ফেলা যাইতে পারে, যাহাতে ক্রমে উহা



সব্‌জি-বাগান আয়েরও একটি পথ

পচিয়া সারে পরিণত হয়। সব্‌জি-বাগানের সাহায্যেও আমরা নানা শাক-সব্‌জি, গাছ-গাছড়া, বিভিন্ন ফল-মূল ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং বাগানের কাজের বিবিধ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধেও যথাযথ ধারণা পাইতে পারি। সুতরাং সব্‌জি-বাগানের কাজগুলিকে আশ্রয় করিয়াও আমাদের প্রকৃতি-পরিচয় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। সব্‌জি-বাগান গৃহস্থের আয়েরও একটি সহজ ও সুগম পথ। ইহার সাহায্যে গৃহস্থ কিছুটা স্বাবলম্বী হইতে পারে।

সব্‌জি-বাগান বা ফুলের বাগান, যে বাগানই হউক না কেন, উহার অবস্থান এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে গৃহের অধিবাসীদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি না হয়। কারণ, তাহা হইলে উদ্যানের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাজেই আবাসস্থলের স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া বাগান করিতে হইবে এবং বাগানটি যাহাতে বৃক্ষবহুল না হয় ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

**গৃহ-প্রাঙ্গণ**—বাড়ির সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানকে সাধারণতঃ গৃহ-প্রাঙ্গণ বা উঠান বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। শহরের খুব কম বাড়িতেই প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর গৃহ যে স্থানেই অবস্থিত হউক না কেন, বাড়িতে একটি মাঝামাঝি আয়তনের প্রাঙ্গণ থাকিলে গৃহের বায়ু-চলাচল সহজে রুদ্ধ হইতে পারে না এবং আবহাওয়া দূষিত হইবার আশঙ্কাও কতক পরিমাণে হ্রাস পায়। গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। সমস্ত দিনের একটানা পরিশ্রমের পর কিছুক্ষণ যদি মুক্ত আকাশের নীচে গৃহ-প্রাঙ্গণে বসা যায়, দেখিতে দেখিতে স্নায়ুগুলি শান্ত হইয়া আসে, দেহের ক্লান্তি দূর হয়। প্রকৃতির সংস্পর্শে ক্লান্ত দেহ ও মন কিছুক্ষণের মধ্যেই সতেজ হইয়া উঠে। মুক্ত বায়ুর স্পর্শে দেহ মনের সকল গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া যায়। ইহা ছাড়া গৃহ-প্রাঙ্গণ গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা প্রভৃতি কাজগুলির একটি প্রধান সহায়।

কিন্তু বাড়ির সম্মুখে কিছুটা স্থান রাখিয়া দিলেই উহাকে প্রাঙ্গণ বলা চলিবে না। গৃহ-প্রাঙ্গণ যাহাতে অমনোযোগিতার ফলে আবর্জনার স্তূপে পরিণত না হয় তৎপ্রতি গৃহস্থের সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। গৃহ-প্রাঙ্গণ যথাযথভাবে রক্ষিত হইলে, উহা গৃহের সুস্থ পরিবেশের সহায়ক হয়। গৃহ-প্রাঙ্গণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বস্তুতঃ গৃহ-প্রাঙ্গণের উপরেই গৃহের শ্রী ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। তোমরা গ্রামের কুটীরগুলি নিশ্চয় দেখিয়াছ। প্রায় প্রতি কুটীরের সম্মুখেই গোবরমাটি দিয়া নিকানো একখানি ছোট প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইবে। এই প্রাঙ্গণেরই এক-



যেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয়

পাশে হয়ত তুলসীমঞ্চ—যেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয়, অপর পার্শ্বে হয়ত গৃহস্থের দেবালয়-সংলগ্ন কয়েকটি ফুল গাছের ঝাড়। প্রায় প্রতিদিনই

গোবরজলের ছিটা দিয়া এই গৃহ-প্রাঙ্গণটিকে পরিষ্কার করা হয়। পরিচ্ছন্নতাই গৃহ-প্রাঙ্গণ বা আঙ্গিনার প্রধান সৌন্দর্য। ছোট এক ফালি প্রাঙ্গণের অভাবে গ্রামের কুটীরগুলিকে যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। শহরের বাড়ীতে হয়ত তুলসী-মঞ্চ বা ফুলের বাগান করিবার মত অতখানি উন্মুক্ত স্থান নাও থাকিতে পারে, কিন্তু যতটুকু স্থানই থাকুক না কেন, উহার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিবে।

গৃহ-প্রাঙ্গণ ও গৃহ-উদ্যানের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। উদ্যান বলিতে আমরা সাধারণতঃ ফুলের বাগানই বুঝিয়া থাকি, যেখানে নানা রঙের ফুল ও পাতা-বাহারের গাছ ইত্যাদি রোপণ করা হইয়া থাকে। গৃহ-প্রাঙ্গণ যদিও ফুলের বাগান নহে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় গৃহস্বামী প্রাঙ্গণের ভিতরকার ছোট ছোট পথগুলির উপর লাল সুরকি বিছাইয়া দিয়াছেন এবং উহার দু'ধারে নানান রঙের ছোট ছোট ফুলগাছের কেয়ারি করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবলমাত্র প্রাঙ্গণটিই সুন্দর হইয়া উঠে তাহা নহে, প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যে গৃহও মনোরম হইয়া উঠে।

## গৃহ-পরিকল্পনা

***গৃহের জমি ও অবস্থান***—গৃহ-পরিকল্পনার সর্বপ্রথমেই গৃহের **অবস্থান** ও উহার **জমি** সম্বন্ধে বিবেচনা আবশ্যক। কারণ গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সৌন্দর্য নির্ভর করে গৃহের অবস্থান ও উহার জমি নির্বাচনের উপর। ভাল জায়গায় গৃহ নির্মাণ করিলে উহার পরিবেশটি হয় সুন্দর, এবং এই সুন্দর পরিবেশ গৃহের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলে। এই জন্যই গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচন করিবার পূর্বে গৃহের অবস্থান ও জমি সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্বমুখী করিয়া গৃহ নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ তাহা হইলে আলো-হাওয়ার অবাধ চলাচল থাকে। বাসগৃহের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই উহার জমির কথা ভাবিতে হয়। আস্তাবল, গোশালা, গোরস্থান প্রভৃতির নিকটবর্তী জমি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও গৃহের পক্ষে অনুপযোগী। নীচু জমি কিংবা আবর্জনা দ্বারা ভরাট জমিও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পুকুর-বোজানো জমির উপরেও গৃহ-নির্মাণ না করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ উহাতে কিছুদিনের মধ্যেই গৃহ হেলিয়া পড়িতে পারে এবং জমির

আর্দ্রতাহেতু গৃহ অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠে। কলকারখানা হইতে বাসগৃহ দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়, কলকারখানার নানা শব্দে ও ধোঁয়ায় শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। গৃহ নির্মাণের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করিবে যেখানে আলো, জল, যাতায়াত প্রভৃতির সু-বন্দোবস্ত আছে। গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচনে **গৃহবাসীর শান্তি, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের** বিষয়ই সর্বাগ্রে চিন্তা করিবে।

***পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা***—গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে **পরিকল্পনার** প্রয়োজন হয়। বিনা পরিকল্পনায় গৃহ নির্মাণ একরূপ অসম্ভব। জমির উপর ইমারত গাঁথিবার পূর্বে, সেই ইমারতের একটি **নক্শা** তৈয়ারি করা হয়। কতখানি জমির উপর গৃহ নির্মিত হইবে এবং উহা কতজন লোকের বাসোপযোগী হইবে এবং ঐ গৃহের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের কোন্ কোন্ কাজগুলির ব্যবস্থা থাকিবে ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ই গৃহের নক্শা করিবার সময় বিবেচনা করিতে হয়। শয়ন, ভোজন, রন্ধন, পূজা, স্নান, অবসর-বিনোদন, শিশুপালন প্রভৃতি প্রতিটি কাজ লইয়াই আমাদের প্রতিদিনকার জীবন। সুতরাং গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় গৃহের এইরূপ প্রতিটি কাজ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। শয়ন ঘর, স্নানের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, খাওয়ার ঘর ইত্যাদির অবস্থান ও পরিসর প্রভৃতির বিশদ প্রয়োজন বুঝিয়াই নক্শা তৈয়ারি হয়।

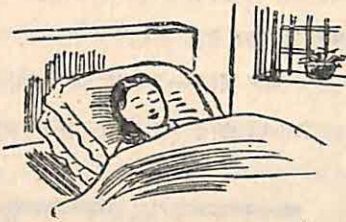

স্নানের ঘর

গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় বিশুদ্ধ পানীয় জল কিভাবে পাওয়া যাইতে পারে, জল-নিষ্কাশনের কি ব্যবস্থা হইবে, নর্দমা ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিশেষজ্ঞের সহিত আলোচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক, যাহাতে বাড়ীর নক্শাটি সব দিক দিয়াই সু-সম্পূর্ণ হয়। গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে এইভাবে গৃহের একটি নক্শা প্রস্তুত করিয়া লইলে গৃহ-নির্মাণের সময় আর উহাতে ত্রুটি থাকিবার আশঙ্কা থাকে না।

**রন্ধন-গৃহ**—রন্ধন-গৃহ বাড়ির একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। বাড়ির মেয়েরা অধিকাংশ সময় রন্ধন-কাজে রন্ধন-গৃহেই কাটাইয়া থাকেন। কাজেই



খাওয়ার ব্যবস্থা



শোয়ার ব্যবস্থা

রন্ধন-গৃহের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা যাহাতে ত্রুটিহীন হয়, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। রান্না-ঘরের অবস্থান শয়নঘর হইতে কিছুটা ব্যবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাহাতে নিদ্রা বা বিশ্রামের সময় শয়নঘরে ধোঁয়া বা কোন তীব্র গন্ধ প্রবেশ করিয়া গৃহস্থ পরিজনদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ গৃহস্থই কাঠ কিংবা কয়লার উনান ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উনান ধরাইবার সময় প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। এই ধোঁয়া যাহাতে অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে, রান্নাঘরের দরজা-জানালার সেই রকম ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আজকাল কয়লার নির্ধূম চুল্লী পাওয়া যায়, ইহাতে রান্নাঘরে ধোঁয়ার উৎপাত মোটেই হয় না।

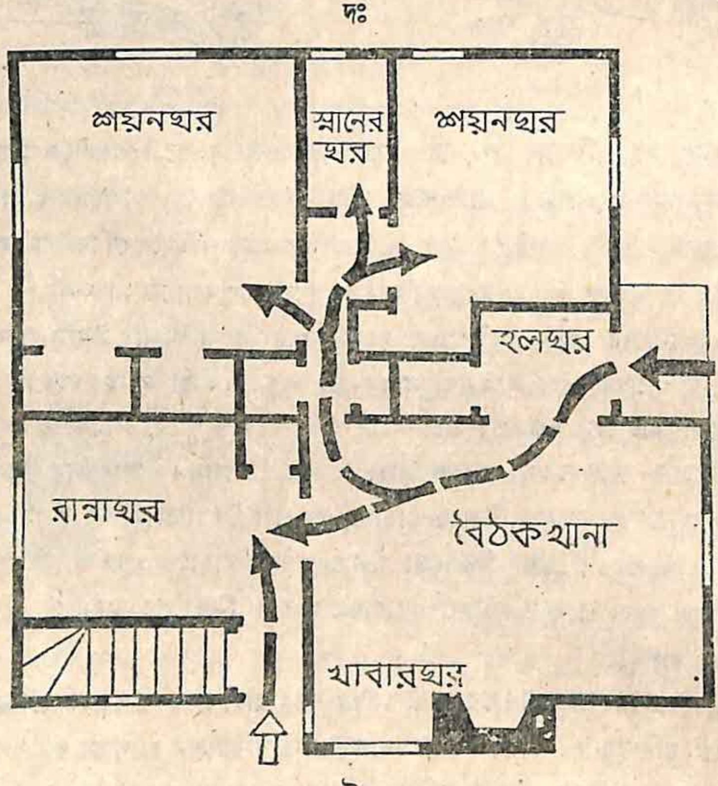
রান্নাঘরের ভিতর, বিশেষতঃ উনানের উপর যাহাতে প্রচুর আলো পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রান্নাঘরের জল নিকাশের নর্দমাও প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**খাওয়ার ঘর**--খাওয়ার ঘরটি যতদূর সম্ভব রান্নাঘরের সংলগ্ন করিয়া নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ উহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশন ব্যাপারে রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘরে অযথা ছুটাছুটি করিতে হয় না। অনেক সময় স্থানাভাব-হেতু রান্নাঘরের মধ্যেই আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সেই সকল ক্ষেত্রে আহারের জন্য জানালার ধারে একটি ভাল জায়গা বাছিয়া লইবে যেখানে যথেষ্ট আলো-বাতাস পাওয়া যায়। খাওয়ার স্থান যতদূর সম্ভব জানালার কাছাকাছি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

**ভাঁড়ার ঘর**—ভাঁড়ার ঘর, অর্থাৎ বাসন-কোসন, চাল, ডাল ও নানারকম তৈজসপত্রাদি রাখিবার ঘর, যতদূর সম্ভব রান্না-ঘরের সন্নিকটেই অবস্থিত

হওয়া প্রয়োজন। অনেকে আবার রান্নাঘরের মধ্যে রান্নাঘরেরই এক অংশে ভাড়ার, অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে গৃহ-নির্মাণের সময়ই ভাঁড়ার রাখিবার জন্য কাঠের বা সিমেন্টের উঁচু তাক তৈয়ারি করিতে হয়।

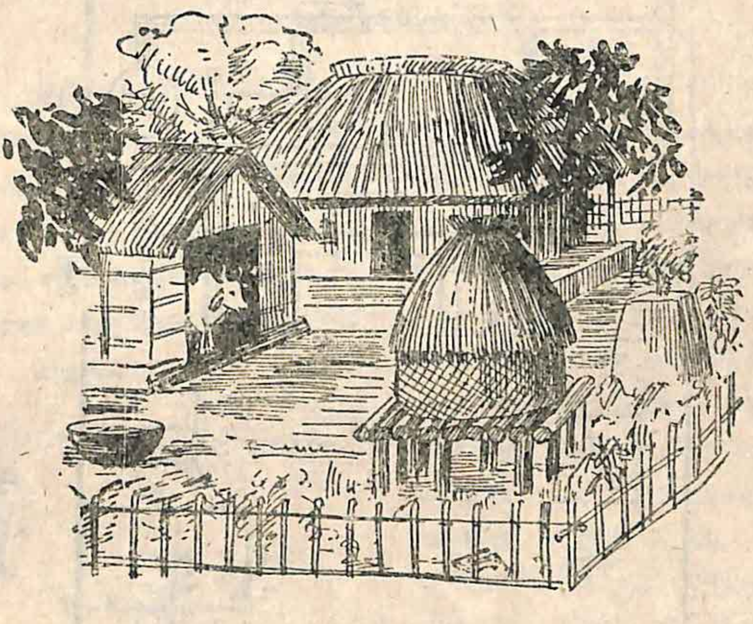
**শয়ন-ঘর**—শয়ন-ঘরের পরিকল্পনা কবিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে আলো-হাওয়ার যথেষ্ট চলাচল থাকে। শয়নকক্ষের অবস্থান দক্ষিণ অথবা




সহরের বাড়ির একটি নক্সা

দক্ষিণ-পূর্বমুখী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে দক্ষিণের মুক্ত বায়ু কক্ষ-মধ্যে অবাধে চলাচল করিতে পারে ও সূর্যালোকেরও কোন অভাব হয় না। গৃহের নকশা তৈয়ারি করিবার সময় এমনভাবে শয়ন-ঘরের পরিকল্পনা করিবে, যাহাতে এই ঘরে অপরাপর অংশের কর্ম-কোলাহল আসিয়া না পৌছায়। শয়ন-ঘরের অবস্থান গৃহের একান্তেই হওয়া আবশ্যক।

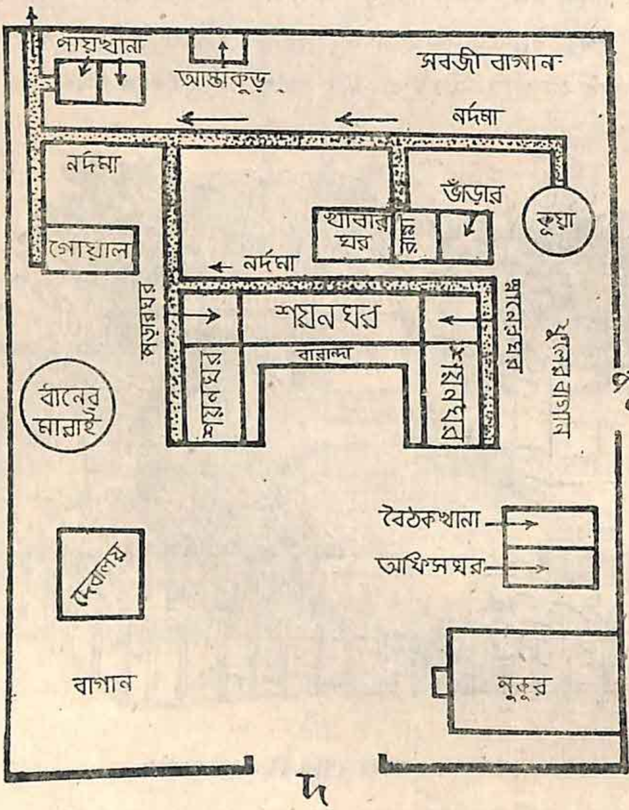
**বৈঠকখানা**—বাড়ির বৈঠকখানা ঘরটি সাধারণতঃ গৃহের বাহিরের দিকেই থাকে, যাহাতে গৃহকর্তার পরিচিত লোকজন কিংবা বাড়ির ছেলেদের সহপাঠী বা বন্ধুরা আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলে, বাড়ির মেয়েদের চলাফেরা বা অন্যান্য কাজকর্মের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় বা উহারা যেন অসুবিধা বোধ না করেন। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে শয়নঘর বা বৈঠকখানার অবস্থান এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে জানালা খুলিয়া দিলেই সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তর, অনন্ত নীল আকাশ, অথবা সবুজের কোলে নানা রঙের ফুল-বিছানো বাগানের কোনও না কোনও অংশ চোখে পড়ে। গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবে কিভাবে পরিকল্পনা করিলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গৃহবাসীদের মন প্রতিনিয়তই প্রকৃতির স্পর্শে সজীব হইতে পারে।



গোলাঘর ও ধানের মরাই সহ একটি পল্লীগৃহ

গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সিঁড়ি, আঙিনা, স্নানের ঘর, শিশুদের ঘর ইত্যাদির প্রত্যেকটিরই যথাযথ পরিকল্পনা করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ স্নানের ঘর ইত্যাদির প্রতি আমরা অনেক কম মনোযোগ দিয়া থাকি, যদিও স্নান দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ। স্নানের ঘর, পায়খানা ইত্যাদির অবস্থান রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর

হইতে কিছুটা দূরে হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং এইগুলির পরিকল্পনা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঐ ঘরগুলি হইতে বাহির হইয়াই গৃহের লোকদের বাহিরের অতিথি অভ্যাগতদের সামনে পড়িতে না হয়। এই ঘরগুলি সাধারণ ঘর হইতে কিছুটা আড়ালে থাকাই যুক্তিযুক্ত এবং এইগুলির পরিসরও যেন নিতান্ত ছোট না হয়। স্নানের ঘরের আয়তন ঠিক একজন লোকের অনুপাতে না রাখিয়া ন্যূনতম আয়তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় করিয়া রাখাই বিধেয়। ৫´×৭´ আয়তনই স্নানের ঘরের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। কারণ




পল্লীগ্রামের গৃহের একটি নক্সা

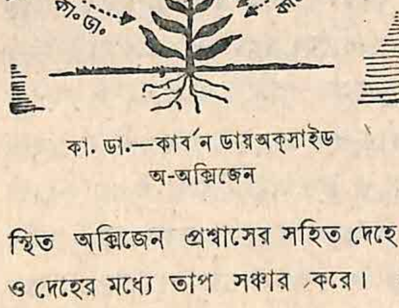
অনেক সময়ে গৃহে যখন কেহ অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন দুইজন লোককেই এক সঙ্গে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। এই কারণেই স্নানের ঘরের আয়তন ন্যূনতম অপেক্ষা কিছুটা বড় করা প্রয়োজন।

***পল্লীগ্রামের গৃহ***—পল্লীগ্রামে গৃহের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য থাকে। কাজেই গৃহ নির্মাণ করিবার সময় সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। পল্লীগ্রামে অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতেই একখানি গোয়ালঘর ও একটি ধানের মরাই থাকে। কোনও কোনও গৃহস্থ আবার জলের সুবিধার জন্য গৃহের সম্মুখ বা পশ্চাদ্ভাগে পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকেন। সুতরাং পল্লীগ্রামের গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় গোয়ালঘর, ধানের মরাই, পুষ্করিণী, নর্দমা, খাটা-পায়খানা ইত্যাদির অবস্থানের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিবে। যে স্থানে গৃহ-পরিকল্পনা করিবে, সে স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। আধুনিক পদ্ধতিতে পল্লীগ্রামে খাটা-পায়খানার বদলে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা আরও প্রশস্ত। পল্লীগ্রামের একটি আদর্শ গৃহের নক্সা দেওয়া হইল।

## বায়ু-সঞ্চালন

**বায়ু**—বায়ুই আমাদের **প্রাণ**। খাদ্য গ্রহণ না করিলে বা জল পান না করিলেও মানুষ কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাতাসের অভাবে মানুষের কয়েক মিনিটও বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর। স্বাস্থ্যের পক্ষে বায়ু একান্ত প্রয়োজন বটে, কিন্তু আবার বন্ধ ঘর, ঘনবসতি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদির দরুন দূষিত বায়ু হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নানারকম রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া মানুষকে রোগগ্রস্থ করিতে পারে।

অক্সিজেন বা অম্লজান, নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান, কার্বন ডায়ক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল—প্রধানতঃ এই তিনটি গ্যাসই বায়ুর মূল উপাদান। এইগুলির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক অক্সিজেন ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। উহার দাহনশক্তি অত্যন্ত প্রবল; সেইজন্য উহার সহিত সর্বদাই অনেক নাইট্রোজেন গ্যাস সংমিশ্রিত থাকে। বায়ু-




কা. ডা.—কার্বন ডায়অক্সাইড
অ-অক্সিজেন

স্থিত অক্সিজেন প্রশ্বাসের সহিত দেহে গিয়া রক্তকণিকাগুলিকে জীবিত রাখে ও দেহের মধ্যে তাপ সঞ্চার করে। এই কারণেই জীবিতের দেহে তাপ

থাকে ও মৃতের শরীর দেখিতে দেখিতে শীতল হইয়া যায়। বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে দেহে তাপ, কার্বন ডায়ক্সাইড ও জল উৎপাদন করে। দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডায়ক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কার্বন ডায়ক্সাইড প্রাণিদেহের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু আবার গাছপালার জীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য। দিনের বেলায় গাছের সবুজ পাতাগুলি আলোর সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুর কার্বন ডায়ক্সাইডের কার্বনাংশ নিজ দেহে রাখিয়া অক্সিজেন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। এই কারণেই বন্ধ-ঘরের বায়ু অপেক্ষা বাহিরের-বায়ু অনেকখানি বিশুদ্ধ ও নির্মল।

***বায়ু চলাচল***—কোন গৃহের বা স্থানের আবদ্ধ দূষিত-বায়ুকে বিতাড়িত করিয়া উহার স্থানে বাহিরের মুক্ত-বায়ুকে লইয়া আসার নামই **'বায়ু চলাচল করানো'** বা **'বায়ু-সঞ্চালন'**। ঘরের ভিতর বায়ুর যদি যথাযথ সঞ্চালন না হয়, তাহা হইলে ক্রমে বায়ু দূষিত হইয়া উঠে ও আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য বায়ু-সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন। ঘন বসতি, অত্যধিক ভিড়, লোকজনের হাঁচি-কাশি, বন্ধ বায়ুর জলীয় বাষ্প, ধূলা, ধোঁয়া, নানারূপ গলিত পচা পদার্থ ও আবর্জনা ইত্যাদি দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। দূষিত বায়ু স্বাস্থ্যহানি ঘটায় ও নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে।

বায়ু সঞ্চালনের উপায় দুইটি—

(১) নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক উপায়।

(২) কৃত্রিম উপায়।

**নৈসর্গিক উপায়—**

(ক) **সূর্যকিরণ দ্বারা ঃ**—সূর্যের কিরণ আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষায় ও সুষ্ঠু জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যকিরণে মাটি উত্তপ্ত হয় এবং মাটির তাপে বায়ুর যে অংশ ভূ-পৃষ্ঠের সান্নিধ্যে থাকে, সেই অংশও গরম হইয়া উঠে। বায়ুর ধর্ম অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাস গরম ও হাল্কা হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে উপরে উঠিয়া যায় ও উপরকার বিশুদ্ধ, শীতল ও ভারী বায়ু নীচের শূন্যস্থান অধিকার করে। এইভাবে আমাদের গৃহের চারিদিককার দূষিত বায়ু উত্তপ্ত ও হাল্কা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং উপরের বিশুদ্ধ

শীতল ও অপেক্ষাকৃত ভারী বায়ু নীচের দিকে সঞ্চালিত হয়। ইহা ছাড়া প্রখর সূর্যকিরণে রোগ-জীবাণু সকল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সূর্যকিরণ অপরিচ্ছন্ন আবর্জনাযুক্ত জায়গাগুলির সমস্ত পচনশীল পদার্থকে শুকাইয়া দেয় ও বায়ুকে বিশোধিত করে।

(খ) **গাছপালার দ্বারা**ঃ—তোমাদের চারিদিকে কত গাছপালা দেখিতে পাও। এগুলির দ্বারাও বায়ু অনেকাংশে বিশোধিত হয় এবং উহারা বায়ু চলাচলেও সাহায্য করে। গাছপালার সবুজ পাতায় **ক্লোরোফিল** ( Chlorophyll ) নামক যে রঞ্জন-পদার্থ আছে, উহা সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু হইতে কার্বন ডায়কৃসাইড নামক গ্যাস আকর্ষণ করিয়া লয় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বন নিজ দেহে রাখিয়া অক্সিজেন বাহিরে ছাড়িয়া দেয়। এই কারণেই দিনের বেলা বৃক্ষবহুল স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। কিন্তু রাত্রিকালে গাছপালা প্রাণীদেহের ন্যায় বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডায়কৃসাইড বাহির করিয়া দেয়। সেইজন্য রাত্রিকালে গাছপালার নীচে বা শয়ন-ঘরে গাছপালা রাখিয়া শয়ন করিতে নাই।


ঝড়ে বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে।

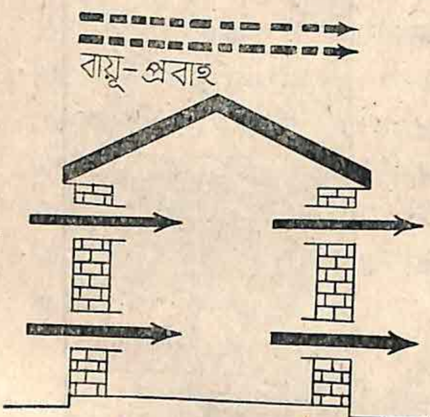
এতদ্ব্যতীত তোমরা জান বৃক্ষবহুল স্থানে বৃষ্টি বেশী হয়। বৃষ্টির জলে নানারকম দূষিত পদার্থ ধুইয়া যায় এবং বায়ুস্থিত ধূলা ও ধোঁয়ার পরিমাণও অনেকাংশে কমিয়া আসে। অনেক সময় দেখিবে, গৃহস্থ গৃহের চারিপাশে নিম, তুলসী, ইউকেলিপ্টাস, শাল, পাইন ইত্যাদি গাছ লাগাইয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল গাছের প্রভাবে বায়ু বিশুদ্ধ ও সুবাসিত হয়।

(গ) **ঝড়বৃষ্টির দ্বারা** ঃ—বায়ুর মধ্যে জৈব রেণু, ধূলা, তূলার আঁশ, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি অনেক দূষিত পদার্থ থাকে। প্রবল বৃষ্টিপাতে এই সকল পদার্থ ধুইয়া যায় ও দূষিত গ্যাস চলিয়া যায়। অধিকন্তু বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে বায়ুতে ওজোন গ্যাসের মাত্রা বাড়িয়া যায়। **ঘনীভূত অক্সিজেনের নামই ওজোন।** ওজোন স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী। প্রবল ঝড়বৃষ্টির সময় বায়ুর বেগ বাড়িয়া যায়। ঝড়ের বেগে বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘরের দূষিত হাওয়া বিতাড়িত হয়। এইভাবে ঝড়বৃষ্টিও বায়ু-সঞ্চালনে সহায়তা করে।

**কৃত্রিম উপায়**—কৃত্রিম উপায় দুই প্রকারের—

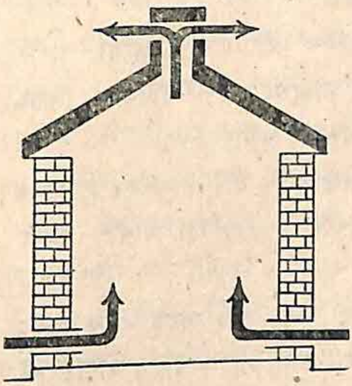
(ক) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, (খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

(ক) **কৃত্রিম উপায়** ঃ—যেমন ঘরের মধ্যে যদি পরস্পর বিপরীতমুখী দরজা-জানালা নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে ঘরের ভিতর বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা সহজ হয়। ঘরের কেবল একদিকে যদি অনেকগুলি জানালা থাকে, তাহাতে বাহিরের মুক্ত বায়ু স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়, সহজে গৃহের মধ্যে চলাচল করিতে পারে না। সুতরাং গৃহ নির্মাণ করিবার সময় যতদূর সম্ভব ঘরে দরজা জানালাগুলি মুখোমুখি করিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিবে। বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যেও ঘরের বদ্ধ-বায়ু বিতাড়িত করিয়া বাহিরের মুক্ত বিশুদ্ধ-বায়ু ঘরে লইয়া আসা যায়। বড় বড় কারখানায় বা অফিস ঘরের দেওয়ালে **বায়ু নিষ্কাশক** ( **Extraction** ) বৈদ্যুতিক পাখা বসাইয়া যেমন বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে টানিয়া আনিয়া বদ্ধ বায়ুকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি আবার **বায়ু-বিতাড়ক** ( **Propulsion** ) পাখার সাহায্যে ঘরকে বায়ুশূন্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক হইতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে ঢুকিতে থাকে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে জানালার উপরিভাগে তোমরা অনেক

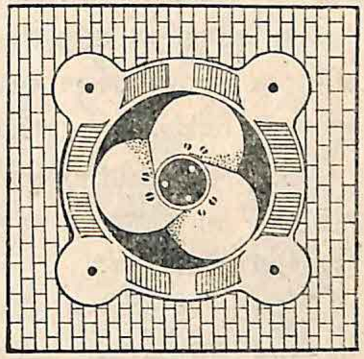


মুখোমুখি দরজা-জানালায় বায়ু সঞ্চালন

সময় **'ভেন্টিলেটার'** বা ঘুলঘুলি দেখিতে পাও। ঘরের ভিতরকার দূষিত গরম বায়ু যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্যই এই

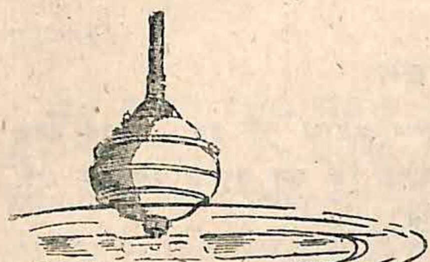


গরম বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে উঠিতেছে



দেওয়ালে বসানো বায়ু-আকর্ষক পাখা

ব্যবস্থা। বায়ুর প্রকৃতি অনুসারে উহা গরম হইবামাত্র হাল্কা হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। সেই সময় উপরের দিকে যদি কোন নির্গম-পথ পায়, তাহা হইলে ঐ গরম বায়ুর বাহির হওয়া অনেক সহজ হয়। শীতপ্রধান দেশে বেশির ভাগ গৃহেই তোমরা অগ্নিতাপ ও চিমনির ব্যবস্থা দেখিয়া থাক। গরম বায়ু ঐ চিমনি ও দরজা-জানালার উপরের অংশ দিয়া যতই বাহির হইয়া যায়, ততই নীচের দিক দিয়া বাহিরের শীতল ও বিশোধিত বায়ু ঘরে আসিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করে। ঘরের মেঝে ও সেই অনুযায়ী ছাদের দিকেও যদি অনুরূপ নল বা ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে বায়ু-সঞ্চালন সহজ হয়।



বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে লইয়া আসা যায়

আজকাল বড় বড় অফিস-বাড়ী, ছায়াছিত্র-ঘর প্রভৃতিতে আধুনিক

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাহির হইতে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইয়া যন্ত্রপাতি দ্বারা বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা পরিমিত রাখা হয়। ইহাকেই বলে **বায়ু-নিয়মন প্রক্রিয়া (Air conditioning)**।

(খ) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া** ঃ—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার দ্বারা ঘরের বায়ুকে কতক পরিমাণে বিশুদ্ধ করা যায়। কাঠকয়লা ঘরের দূষিত গন্ধকে শোষণ করিয়া লয়।

যদি তোমাদের ঘরগুলি অত্যন্ত স্যাঁতসেতে বোধ হয়, তাহা হইলে ঘরের মধ্যে কিছু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পাথুরে চুণ রাখিয়া দিবে। ইহারা বায়ুর আর্দ্রতা টানিয়া লয়।

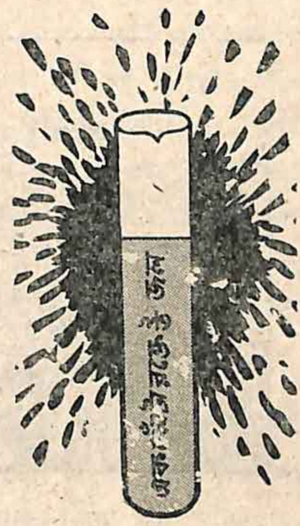
ফিনাইলের জল দিয়া ঘর ধৌত করিলে, কিম্বা যদি মাঝে মাঝে ঘরের আশেপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়াইয়া দাও, তাহা হইলে রোগ-জীবাণু নষ্ট হইয়া যায় এবং বায়ুও বিশোধিত হয়। ঘরের মধ্যে ধূপ-ধুনা জালাইলেও ঘরের দুর্গন্ধ চলিয়া যায় এবং বায়ু সুবাসিত হয়।

## জল

বহুলক্ষ বৎসর পূর্বে জলেই প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়। আজও সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য জল শুধু প্রয়োজনীয়ই নহে, অপরিহার্য। জলের অপর নাম **জীবন**।

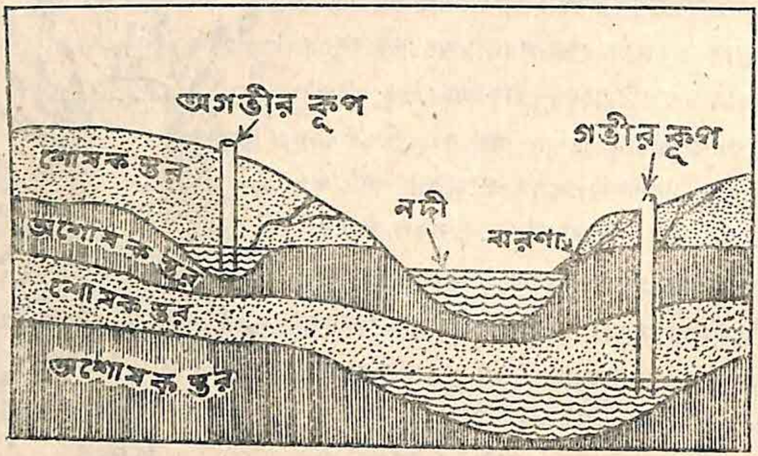
***জলের প্রয়োজনীয়তা***—অভুক্ত থাকিয়া, কেবল জলপান করিয়াও মানুষ কয়েক সপ্তাহ টিকিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নির্জলা অবস্থায় ৪।৫ দিনের বেশী বাঁচা সম্ভব নহে। আমাদের দেহের সর্বত্রই জল, এমন কি সূক্ষ্মতম কোষটি পর্যন্ত জলভারে টলমল করিতেছে। দেহের মোট ওজনের তিন ভাগের দুই ভাগই জল। ইহা ছাড়া, আমাদের দেহের মধ্যে সব সময়েই একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। জল ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্ভব নহে। নিঃশ্বাস, ঘর্ম, মল ও প্রস্রাবের আকারে আমাদের দেহ হইতে প্রত্যহ প্রায় ২½—৩ লিটার জল বাহির হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় হইতে এই জল পূরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া স্নান করা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, গৃহাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা,

অগ্নিনির্বাপণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে আমাদের প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। একজন মানুষের পক্ষে প্রতিদিন কতখানি জলের প্রয়োজন তাহা সঠিক বলা যায় না। ইহা নির্ভর করে মানুষের অভ্যাস ও দেশের জলবায়ুর উপর। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভ্যাস ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অনুযায়ী জলের প্রয়োজনের পরিমাণেও তারতম্য হইয়া থাকে। তবে শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের জলের প্রয়োজন অধিক। আবার লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, সকল ঋতুতেই মানুষের সমপরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না; গ্রীষ্মকালে সাধারণত জলের বেশি দরকার, শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম। কলিকাতার প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য দৈনিক প্রায় ৬০ গ্যালন ( ১ গ্যালন = ৪$\frac{১}{২}$ লিটার ) হিসাবে জল ধার্য আছে।



***জল কোথা হইতে আসে***—প্রথমেই বৃষ্টির জলের কথাই ধরা যাউক্। জল আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য বলিয়াই হয়ত সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তোমরা জান, পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। সূর্যকিরণে এই জলের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেই বাষ্পই শীতল বায়ুর-সংস্পর্শে আসিয়া মেঘে রূপান্তরিত হয়। মেঘই আবার বৃষ্টির জল হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে। বৃষ্টির জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বটে কিন্তু উহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে। কারণ সমুদ্রের জল যখন বাষ্পের আকারে উঠিয়া যায়, তখন বায়ুস্থিত কতকগুলি গ্যাস ঐ বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হয়। এই কারণেই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় উহার মধ্যে কার্বনিক অ্যাসিড, অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি গ্যাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বড় বড় শহরে কলকারখানার কার্বনিক অ্যাসিড-মিশ্রিত ধোঁয়া ও দূষিত পদার্থ ইত্যাদি আসিয়া বায়ুতে সঞ্চিত হয়। বৃষ্টির জল বায়ু হইতে এই সকল দূষিত পদার্থ ও অ্যাসিড ইত্যাদি নিজের মধ্যে টানিয়া লয়। এইজন্যই বৃষ্টির জলকে একেবারে বিশুদ্ধ বলা যায় না।

তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, ঝরণা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপায়ে এবং অন্যান্য যে সব কৃত্রিম উপায়ে জল পাওয়া যাইতে পারে, তন্মধ্যে বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।




কিভাবে ঝরণার সৃষ্টি হয়

বৃষ্টির জল হইতেই নদী, নালা, হ্রদ, ঝরণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই সবগুলিই প্রাকৃতিক জলের পর্যায়ে পড়ে। নদীর প্রয়োজন মানুষের জীবনে অত্যধিক। পাহাড়-পর্বতের গায়ে পড়া বৃষ্টির স্বচ্ছ-জল নদীর আকারে লোকালয়ের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয় এবং মানুষের জলের প্রয়োজন মিটাইয়া, লোকালয়ের অনেক দূষিত পদার্থ ধৌত করিয়া লইয়া যায়। এই সকল প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া জলকে আমরা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বলিতে পারি, কিন্তু নির্দোষ বলিতে পারি না। পান করিবার পূর্বে এই সব জল বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বৃষ্টির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর এবং মাটিতে পড়িবার পূর্বেই উহা সংগ্রহ করা এবং ছাঁকিয়া লওয়া উচিত, নতুবা মাটির সংস্পর্শে আসিলেই উহাতে জৈব ও দূষিত পদার্থ ইত্যাদি মিশিয়া যাইতে পারে।

পূর্বোক্ত **স্বাভাবিক** উপায় ছাড়াও কৃত্রিম উপায়েও জল পাওয়া যায়।

**কৃত্রিম উপায়ঃ**—কূপ, পুষ্করিণী, নলকূপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। গ্রামদেশে ফিল্টার করা জলের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসীরা কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতেই জল সংগ্রহ করে।

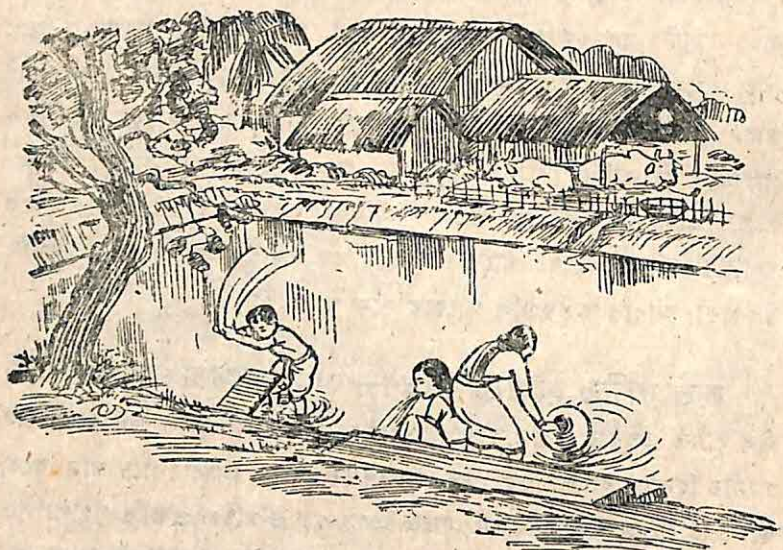
মনে রাখিও, যে জল পৃথিবীর যত তলদেশ হইতে আসে, সে জলে ধাতব পদার্থের পরিমাণ ততই অধিক থাকে। মাটির মধ্যে গিয়া জল নানা ধাতব পদার্থকে দ্রবীভূত করে।

বৃষ্টির জল কিছু নদীতে গিয়া পড়ে; কিছু পৃথিবীর মাটি শোষণ করিয়া লয়। মাটির শোষক স্তর ভেদ করিয়া এই জল পৃথিবীর অশোষক স্তরে গিয়া ঠেকে; এই অশোষক স্তর যে যে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে জল উদ্দাম বেগে ছুটিয়া যায় ও পরে মাটি ভেদ করিয়া ঝরণারূপে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসে। এই কারণেই নদী বা হ্রদ অপেক্ষা ঝরণার জলে ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক। কূপ প্রভৃতির জলেও ধাতব পদার্থের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। এই ধাতব পদার্থগুলির মধ্যে কতকগুলি উপকারী, আবার কতকগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।

***জল দূষিত হইবার কারণ*—**মানুষের **অজ্ঞতা** ও **অসাবধানতাই** জল দূষিত হইবার প্রধান কারণ। পল্লীগ্রামে দেখা যায়, যে জলাশয়ের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেই জলাশয়েই মানুষ নিঃসংকোচে স্নান করে, কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, বাসন মাজে এবং গরু ও মহিষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুগুলিকেও স্নান করায়। কখনও কখনও গৃহ হইতে নিষ্কাশিত নানারকম ময়লা ও আবর্জনা-মিশ্রিত জলগুলি কিভাবে জলাশয়ে গিয়া পড়িতে পারে, গৃহের অধিবাসীরাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। পানীয় জলের পুষ্করিণীতে মলমূত্র ত্যাগ করিতেও গ্রামের লোকেরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। রন্ধন ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে মানুষের সতর্কতারও একান্ত অভাব দেখা যায়। জলে ঢাকা না দেওয়া, জলে ময়লা ঘটি-বাটি বা অপরিষ্কৃত হাত ডোবানো ইত্যাদি অনাচার অহরহই ঘটিয়া থাকে। এই সকল অপরিচ্ছন্ন কার্যকলাপের ফলে জল যে কতখানি দূষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন।

গ্রাম্যদেশে সাধারণতঃ পুষ্করিণীর সন্নিকটে বা অন্যান্য জলাশয়ের পাড়ে ঝোপঝাড়, গাছপালা প্রভৃতি এত অধিক থাকে যে, জলে অনেক সময়ে সূর্যালোক পড়িতে পারে না। সূর্যালোকের অভাবে বহু রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয় এবং গাছের শুকনো পাতা ইত্যাদি জলে পড়িয়া পচিতে থাকে, ফলে জল

দূষিত ও দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, মশা-মাছির সৃষ্টি হয় এবং উহারা অসংখ্য ডিম পাড়িয়া বংশ বৃদ্ধি করে। দেখিতে দেখিতে জলাশয়টি নানা রোগ-জীবাণু ও দূষিত পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠে। আবার অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে মৃত পশুপক্ষী

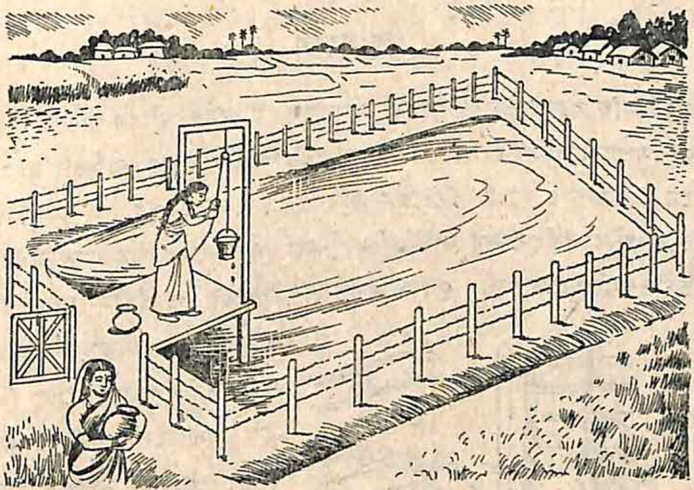


জল কিভাবে দূষিত হয়

ইত্যাদিকেও দুর্গন্ধ ও গলিত অবস্থায় জলাশয় প্রভৃতির পাড়ে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কখনও কখনও আবার উহা জলেও আসিয়া পড়ে। ইহার দ্বারা জল যে কতখানি দূষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকারক হইয়া পড়ে তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। সেইজন্য প্রয়োজন সংরক্ষিত পুষ্করিণীর। সংরক্ষিত পুষ্করিণী বলিতে উঁচু পাড় বিশিষ্ট নির্দোষ জায়গায় অবস্থিত, যাতায়াতের একটি মাত্র পথ ব্যতীত আর চতুর্দিকে দেওয়াল বা টিনে ঘেরা একটি বড় গভীর জলাশয়কে বুঝায়—যে পুষ্করিণীতে জলে নামা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি নিষিদ্ধ থাকে। সেইজন্য কোন ঘাট থাকে না। একটি উঁচু প্লাটফরম হইতে দড়ি, বালতি বা কপিকলের সাহায্যে জল তোলা হয়।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জলের মধ্যে **দৃশ্য** দূষিত—পদার্থগুলির বিষয় আলোচনা করিলাম। জলের উপরে ভাসমান লতাপাতা, শেওলা, কচুরিপানা ইত্যাদি দূষিত পদার্থগুলিই অতি সহজে দেখা যায়। কিন্তু **অদৃশ্য** ভাবেও

জলে বহু দূষিত পদার্থ থাকে ; যেমন—আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের জীবাণু। এই সকল রোগ-জীবাণুগুলি সর্বদাই অবিশোধিত জলের সহিত মিশিয়া থাকে, যদিও আমরা উহাদের দেখিতে পাই না। দূষিত জল বলিলে এই রোগ-জীবাণুগুলির কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়।



সংরক্ষিত পুষ্করিণী

এতদ্ব্যতীত জলের সহিত কিভাবে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হয় তোমরা পড়িয়াছ। এই ধাতব পদার্থের মধ্যে সীসা, নিকেল, দস্তা, তামা ঘটিত লবণগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। পানীয় জলে এইগুলির মিশ্রণ হজম-ক্রিয়ায় নানারূপ গোলযোগ ঘটায়।

———

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# গৃহ-সজ্জা

গৃহই মানুষের আশ্রয়। গৃহের অন্তরালে মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনকে বিকশিত করে গৃহ। সুতরাং মানুষের জীবনে গৃহসজ্জারও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। সুন্দর গৃহ ও গৃহপরিবেশ মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য আনিয়া দেয় এবং জীবনকে আরও মনোরম ও লোভনীয় করিয়া তোলে। গৃহ-পরিবেশ যদি বিশৃঙ্খল ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে, তবে মানুষের জীবনেও দেখিতে দেখিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মন সৌন্দর্য-বিমুখ হইয়া উঠে। গৃহসজ্জা বলিতে আমরা প্রধানতঃ গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও আড়ম্বরহীন সহজ প্রসাধনই বুঝিয়া থাকি, যাহার দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শ্রী বর্ধিত হয় এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে গৃহ শান্তির ও শক্তির উৎস হইয়া উঠে। গৃহকে সজ্জিত করিতে হইলে গৃহস্বামীকে যে অঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্ন চারুকলা ও শিল্পগুলিতে পারদর্শী হইতে হইবে তাহা নহে। গৃহসজ্জার বিষয়ে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন **সু-রুচির**। গৃহকে যদি শারীরিক ও মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন **সু-শিক্ষার**; সেই সু-শিক্ষার দ্বারাই রুচির যথাযথ বিকাশ সম্ভব। রুচি মার্জিত হওয়া চাই, তাহা না হইলে অনেক সময় প্রভূত অর্থ থাকিলেও **সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির** অভাবে গৃহস্থের মূল উদ্দেশ্যগুলিই ব্যর্থ



পরিচ্ছন্নতাই গৃহের সজ্জা

হইয়া যায়। গৃহসজ্জা ও গৃহের ব্যবস্থা হইতেই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন পরিবারের বৈশিষ্ট ও শালীনতা নির্ণীত হয়, সেই পরিবারের লোকদের কথাবার্তা, চাল-চলন ও গৃহের সাজ-সজ্জার দ্বারাই। প্রতি গৃহেরই একটি স্বতন্ত্র চেহারা থাকে। সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই আমরা গৃহস্বামীর বিশিষ্ট মনোভাব ও রুচির পরিচয় পাইয়া থাকি। এই কারণেই বিভিন্ন গৃহের পরিকল্পনা যেমন একরূপ নহে তেমনি বিভিন্ন গৃহের বা গৃহাংশ সমূহের সজ্জাও কখনও এক হইতে পারে না। বিবিধ প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া এবং নিজের রুচি অনুযায়ী গৃহ ও গৃহের বিভিন্ন অংশকে সজ্জিত করিতে হয়।

***ঘরের মেঝে***—কোনও গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দৃষ্টি পড়িবে ঘরের মেঝের প্রতি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তুমি যে স্থানে পা বাড়াইবে সে স্থানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তোমার মন স্বভাবতঃই সচেতন থাকে। সুতরাং ঘরের মেঝে ও মেঝের সজ্জাই সর্বাগ্রে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

একই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও ব্যবহার অনুযায়ী উহাদের মেঝে বিভিন্ন উপাদানে তৈয়ারি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। যেমন রন্ধন-গৃহ ও শয়ন-কক্ষের মেঝের ব্যবহার একরকম নহে; রন্ধন-গৃহের মেঝেতে প্রায়ই জল ইত্যাদি পড়িয়া থাকে এবং প্রত্যহই উহা ধোওয়া-মোছা আবশ্যক, কিন্তু শয়ন-ঘরে বা বৈঠক-খানায় তদ্রূপ নহে। সুতরাং রন্ধন-গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে উহার মেঝে এমন উপাদান দিয়া তৈয়ারি করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যহ উহার ধোয়া মোছা, ঘষা-মাজা ইত্যাদি অবাধে চলিতে পারে। অপরপক্ষে শয়নঘর বা বৈঠকখানা ইত্যাদির মেঝে হালকা-রং-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-কারুকার্য-খচিত হইলেই যেন ঐ ঘরের প্রয়োজনের সহিত উহার সামঞ্জস্য বজায় থাকে। তেমনি, শিশুদের ঘরের পরিকল্পনা করিবার সময়ও শিশুর বয়স বৈশিষ্ট্য, উহার দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি চিন্তা করিয়াই সেই ঘরের মেঝেতে কোন্ উপাদান দেওয়া যুক্তিযুক্ত তাহা স্থির করা আবশ্যক। তোমার দুই বছরের ছোট ভাইটি সবেমাত্র টলিয়া টলিয়া চলিতে শিখিয়াছে। উহার ঘরের মেঝে যদি অত্যধিক পালিশ হয়, মেঝেতে যদি কিছু পাতা না থাকে, তাহা হইলে প্রতি পদেই ভাইটির পড়িয়া যাওয়ার ও চোট পাইবার

আশঙ্কা থাকে। এই ব্যবস্থায় উহার-হাঁটার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে বর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগতই ব্যাহত হইতে থাকিবে। এই কারণেই প্রয়োজন ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কোন্ ঘরের মেঝে তৈয়ারী করিতে কোন্ উপাদান করা হইবে, তাহা স্থির করা হইয়া থাকে।



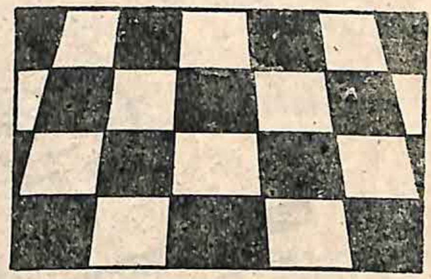
চোট পাইবার আশঙ্কা থাকে

***মেঝে তৈয়ারির উপাদান***—গৃহ যেমন বিভিন্ন উপাদানে তৈয়ারি হয়, তেমনি ঘরের মেঝেতেও বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোমরা গ্রামদেশে মাটির ঘরে মাটির দাওয়া দেখিয়াছ। শহরের পাকা বাড়ীগুলির মেঝে সাধারণতঃ সিমেণ্টেরই হইয়া থাকে। সাধারণ পাথর বা মার্বেল পাথরের মেঝেও তোমরা বড় বড় প্রাসাদ বা ইমারতগুলিতে দেখিয়া থাকিবে।

পশ্চিমের দেশগুলিতে এবং এই দেশেরও বহু শীতপ্রধান অঞ্চলে মেঝের জন্য কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঠ দুই রকমের—**নরম কাঠ ও কঠিন কাঠ** ( soft and hard wood )। পেণ্ট ( বা রঙ্ ) লাগানো নরম কাঠই অনেক সময় মেঝের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে খরচ কম পড়ে কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, ব্যবহারের দরুণ ইহার কোনও অংশ যদি দাগী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পেণ্ট লাগাইয়া আবার উহাকে পূর্বের ন্যায় করিয়া তোলা দুষ্কর। নরম কাঠের উপর বার্ণিশ লাগাইয়াও অনেক সময় উহা মেঝেতে ব্যবহার করা হয়। বার্ণিশ-করা কঠিন কাঠের মেঝে মসৃণ, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

***মেঝে সজ্জার উপাদান***—আমাদের দেশে গৃহসজ্জা সম্বন্ধে মানুষ এখনও খুব সচেতন নহে। বহু বাড়ীতেই কাঠের বা সিমেণ্টের মেঝে এমনিই পড়িয়া থাকে। অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আমরা গৃহ-প্রসাধনে তৎপর হইয়া উঠি। কিন্তু বাহিরের দেশগুলিতে গৃহসজ্জা দৈনন্দিন জীবনেরই একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। ঐ সকল দেশের লোকেরা অনেক সময় পালিশ, বার্ণিশ ইত্যাদি ছাড়াও অসুন্দর মেঝেকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য মেঝের উপর **রবার অ্যাস্ফাল্ট** ( asphalt ), **লিনোলিয়াম** ( linoleum ) ইত্যাদি বিছাইয়া দেয়। ইহা মেঝের সমস্ত দীনতা ঢাকিয়া দিয়া উহাকে সুন্দর

করিয়া তোলে। রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও শিশুদের ঘরের মেঝেতে লিনোলিয়ামের ব্যবহার যথেষ্ট দেখা যায়। অ্যাস্‌ফাল্ট, লিনোলিয়াম অপেক্ষা কম দামী এবং সেই কারণে লিনোলিয়ামের পরিবর্তে অনেকে আজকাল অ্যাস্‌ফাল্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। অ্যাস্‌ফাল্টের পাতখানির দুই দিকেই একটি লাল রং মাখাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে উহা মেঝের সহিত আঁটিয়া যাইতে না পারে। অ্যাজ্‌বেস্ট্‌স্‌-এর আঁশ হইতেই অ্যাস্‌ফাল্ট তৈয়ারি হয়। উহার মধ্যে রঙের গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। অ্যাস্‌ফাল্টের রং পাকা রং, উহা কখনও উঠিয়া যায় না বা মলিন হয় না। ছাপার মেসিনের সাহায্যে অ্যাস্‌ফাল্টের উপরেও নানা রকমের নক্‌শা ও ছবি ছাপানো হইয়া থাকে।



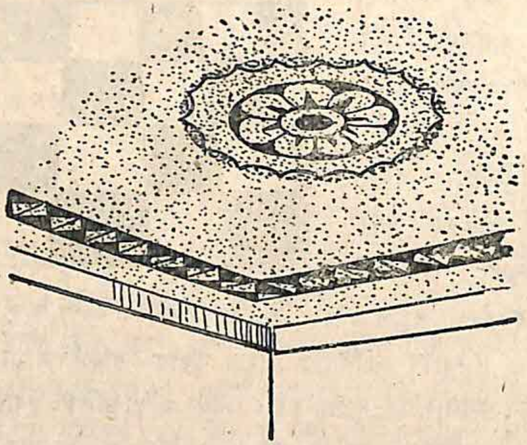
লিনোলিয়ামের পাত

রবারের পাত তৈয়ারি করিবার সময় উহার সহিত নানারকম ধাতব পদার্থের গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই গুঁড়াগুলিই রবারের পাতের মনোরম রং ও কাঠিন্য আনিয়া দেয়। রবারের পাতের দাম কিছু বেশি, কিন্তু সামান্য গরম জল অথবা অ্যামোনিয়া দিয়া সহজেই পরিষ্কার করা যায়। উপরিবর্ণিত মেঝের প্রত্যেকটি পাতই জল ও সাবান দিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে, যাহাতে সাবানটি বিশেষ কড়া না হয় ও জল যেন পাতের অপর পৃষ্ঠে চলিয়া না যায়। বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে তৈয়ারি এই পাতগুলির ব্যবহারে ঘরের মেঝের ভাঙাচোরা প্রভৃতি যাবতীয় দৈন্য ও মলিনতা ঢাকিয়া যায়, ঘরের ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয় এবং পায়ে চলার শব্দও কমিয়া আসে। উহার উজ্জ্বল রং ও চাকচিক্যে ঘরের চেহারাও অনেকখানি বদলাইয়া যায়। তবে কেবল পাত বিছাইয়া অসুন্দরকে ঢাকিয়া দিলেই চলিবে না; উহার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হইবে, কারণ **পরিচ্ছন্নতাই গৃহের প্রধান সৌন্দর্য।**

শহরের পাকা-বাড়ীগুলির মেঝে অনেক ক্ষেত্রেই সিমেণ্টের হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক জায়গায় আবার মোজেকের (mosaic) সাহায্যে মেঝেতে নানারকম ছবি ও নক্‌শা করিবার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। মোজেক আর কিছু

নহে, সিমেণ্টের সহিত নানা রঙের পাথরের গুঁড়া মিশাইয়া নক্শার সৃষ্টি করা। মোজেকের মেঝে তৈয়ারির খরচও অনেক। এই কারণে অনেকে আবার মেঝের চারিদিকে মোজেকের নক্শা করিয়া মেঝের প্লেন জায়গাটি নানা নক্শা করা ছোট এক টুক্রা কার্পেট দিয়া ঢাকিয়া দেন।

কার্পেট বা শতরঞ্জি ইত্যাদির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে আবার বহু রঙের নক্শা-করা দড়ির ম্যাটিং ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

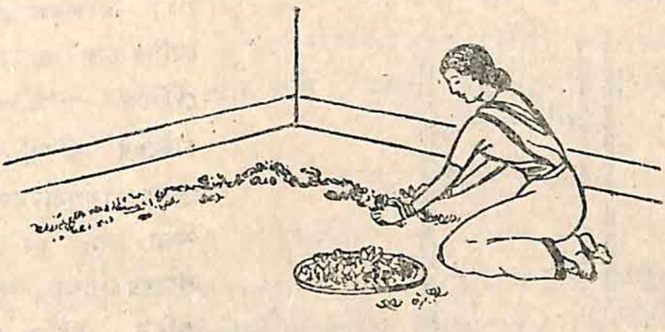


মেঝে মোজেকের নক্সা

লিনোলিয়াম, রবার, কার্পেট, শতরঞ্জি ও দড়ির ম্যাটিং ইত্যাদি যে কোনও জিনিসই ব্যবহার কর না কেন, উহা প্রত্যহ বা দুই-একদিন অন্তর পরিষ্কার করিয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক। নতুবা উহার উপর দিয়া চলাচলের দরুন মানুষের পায়ে ও হাওয়ায় বাহিত যাবতীয় ধূলা ও দূষিত পদার্থ আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকিবে, এবং ঘরের হাওয়াকে দূষিত করিয়া তুলিবে। মেঝের ঢাকাগুলি যদি নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঘরের মেঝে আ-ঢাকা রাখাই যুক্তিযুক্ত, কারণ আ-ঢাকা খালি মেঝে পরিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাই ঘরের সৌন্দর্য। ঘরের মেঝে সাজাইতে গিয়া যদি উহার পরিচ্ছন্নতাই নষ্ট হয়, তাহা হইলে সাজানোর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল জানিবে।

তাহাছাড়া ঘরের মেঝে সাজাইতে হইলেই যে মেঝেকে কোন-না-কোন আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই।। গ্রাম-দেশে

দেখিয়া থাকিবে, মাটির কুঁড়েঘরগুলিতে মেঝে ঢাকিয়া দিবার রেওয়াজ নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা গ্রামবাসীদের সামর্থ্যেরও বাহিরে। কিন্তু তথাপি



ফুলের আলপনায় মেঝের সজ্জা

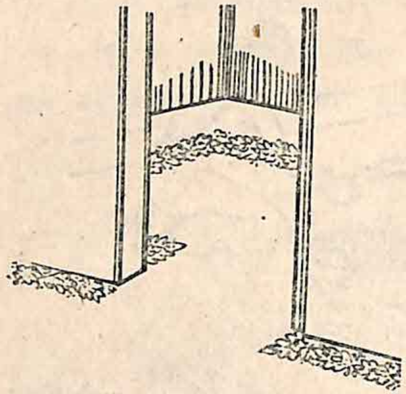
গোবর দিয়া নিকানো পরিষ্কার মেঝেটিকে উহারা সাজাইবার যথেষ্ট প্রয়াস পায়। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, মাটির ছোট ঘরখানিতে চলাচলের পথটুকু ছাড়িয়া দিয়া, ঘরের বিভিন্ন অংশ ও তক্তাপোষ ইত্যাদি ঘরের বিভিন্ন জিনিস-



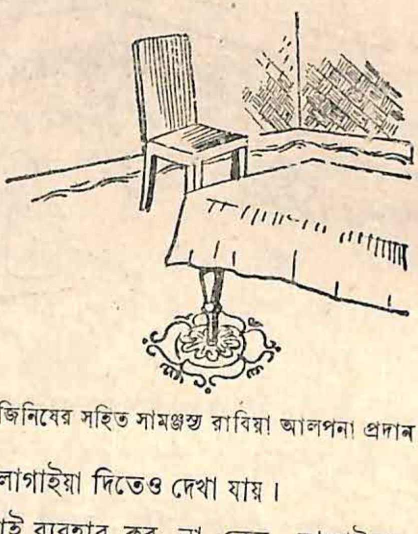
দেওয়াল-কাগজ দিয়াও মেঝের সজ্জা রচিত হয়

গুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, ঘরের মেয়েরা চাউলের গুঁড়া দিয়া আলপনা আঁকিয়া রাখিয়াছে। মাটির বুকে চাউলের গুড়ার সাদা আলপনায় মেঝের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই দেখিতেছ, মেঝে সাজাইতে হইলেই যে

মেঝের আচ্ছাদন বা ঢাকা ইত্যাদির সর্বদাই প্রয়োজন তাহা নহে। ঠাকুর-দালানে বা পূজা-গৃহে কখনও কার্পেট ইত্যাদির দ্বারা মেঝে সাজাইতে দেখিয়াছ কি? ঐ সকল ক্ষেত্রে বেশির ভাগ জায়গাতেই দেখিতে পাইবে, হয় চাউলের গুঁড়া, নয় ফুলের আলপনায় মেঝের সজ্জা করা হইয়াছে। শহরের পাকা দালান-গুলির সিমেণ্টের মেঝেতে, চলাচলের এবং সব সময় ব্যবহারের জায়গাগুলি বাদ দিয়া, তোমরা ঠিক সেইরূপ সহজভাবেই চাউলের গুঁড়ার আলপনা দিয়া সজ্জিত করিতে পার। চাউলের গুঁড়ার সহিত যদি পরিমাণ অনুযায়ী সামান্য গঁদ মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে। চাউলের গুড়ার বদলে ময়দাও ব্যবহার করা চলে।


চলাচলের জায়গা বাদ দিয়া আলপনা প্রদান

পশ্চিমের অনেক জায়গায় এবং আমাদের দেশেও বিশেষতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুন্দর সুন্দর নক্শাযুক্ত দেওয়াল-কাগজ কিনিয়া উহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারে কাটিয়া, উহার দ্বারাই মেঝে-সজ্জা করা হয়। ঐ কাজগুলিকে কখনও কখনও মেঝের চারিপাশে আঠা দিয়া লাগাইয়া দিতেও দেখা যায়।


জিনিষের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আলপনা প্রদান

দেওয়াল-কাগজ বা আলপনা, যাহাই ব্যবহার কর না কেন, সাজাইবার পূর্বে ঘরের আসবাবপত্রগুলি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাযথ সংস্থান করিয়া লওয়া আবশ্যক, যাহাতে প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে কোনও কোনও

আসবাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার চারিদকে আলপনার রেখা টানিয়া দেওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গা ও তাহার অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আলপনা দিবার রীতি। ঘরের মেঝে ও অন্যান্য যে-কোন অংশই সাজাও না কেন, সর্বদাই একটি সহজ শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। মনে রাখিবে, **গৃহসজ্জায় আড়ম্বরের স্থান নাই। বাহুল্য বর্জন করাই গৃহসজ্জায় প্রথম ও প্রধান নীতি।**

## কার্পেট

কার্পেট বা গালিচার ব্যবহার পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কার্পেট বয়ন বা কার্পেটের সৃষ্টি এত প্রাচীন যে উহা কোন্ দেশে বা কোন্ সময় হইতে প্রথম চালু হয় তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। মিশর দেশে খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছর আগে যে কার্পেটের ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পিরামিড হইতে পাওয়া গিয়াছে। তবে সাধারণতঃ বলা হয়, এশিয়া মহাদেশের মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেই উহার প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। 'ইজিপ্‌শিয়ান' বা 'পার্শিয়ান' কার্পেট আজ পৃথিবীতে এক-নামেই



কার্পেট পৃথিবীর একটী সেরা জিনিষ

পরিচিত। তখনকার দিনে একখানি হাতে-বোনা আসল কার্পেট উহার শিল্প-নৈপুণ্যে, বর্ণ বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন কারুকার্যে পৃথিবী একটি সেরা জিনিসরূপেই পরিগণিত হইত। রাজা-মহারাজা কার্পেটকে একটি অতি মূল্যবান উপহার

বলিয়া মনে করিতেন। যুদ্ধ-বিজেতারাও দেশ-দেশান্তর হইতে কার্পেট লুট করিয়া নিজেদের তাঁবুতে লইয়া আসিতেন। কখনও বা দেখা যাইত, কার্পেট রাজা-মহারাজার সিংহাসনের শোভা বর্ধন করিতেছে। তখনকার দিনে কার্পেটের উপর হাঁটিতে বা উপবেশন করিতে হইলে মানুষ জুতা খুলিয়া রাখিত।

কালক্রমে, কলে কার্পেট বোনার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে-বোনা এই আসল কার্পেটগুলির মূল্য কমিয়া যায় এবং মানুষও উহার সযত্ন ব্যবহার হইতে বিরত হয়। তথাপি এই কার্পেট আজও গৃহসজ্জায় একটি প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেঝেতে কার্পেটের ব্যবহার আজও গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়। একখানি ভাল কার্পেটের দাম নিতান্ত কম নহে এবং উহা এত মজবুত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় যে, বংশানুক্রমে কয়েক শত বৎসর ব্যবহার করিলেও উহা নষ্ট হয় না।

***কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার*** - কার্পেট যে কেবল মেঝের আবরণ হিসাবেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; উহা মলিন শ্রীহীন ঘরে আনে রঙের খেলা ও উজ্জ্বলতার ভাব। অনেক সময় চেয়ারের উপরেও কার্পেট



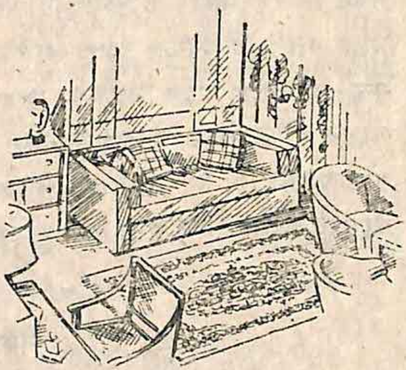
চেয়ারের উপরেও কার্পেট পাতিয়া দেওয়া হয়

পাতিয়া দেওয়া হয়। কার্পেটের আসনেরও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অনেক সময় আবার বহু বর্ণে বিচিত্র ছোট ছোট কার্পেট জায়গা বিশেষে

দেওয়ালের গায়েও ঝুলাইয়া রাখা হয়। তবে বেশির ভাগ ধনীর গৃহেই কার্পেটের অধিক ব্যবহার দেখা যায় মেঝেতেই।

মেঝের কার্পেট পরিষ্কার না করিয়া অনবরত ব্যবহার করিলে উহাতে যেমন দূষিত ধূলা-বালি সঞ্চিত হইয়া গৃহের আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া তোলে, তেমনি আবার কার্পেট পাতিয়া রাখিলে ধূলাগুলি উহার আঁশের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং উহা সহজে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না।

শীতপ্রধান অঞ্চলে ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ব্যবহার বিশেষ আরামদায়ক। মেঝেতে পাতা কার্পেট যে কেবল ঠাণ্ডা রোধ করে তাহা নহে, কার্পেটের উপর দিয়া খালি পায়ে চলিতেও বেশ আরাম বোধ হয়। কার্পেটের জমিন নরম ও পুরু হওয়াতে চলিবার সময় শরীরে মোটেই ঝাঁকানি লাগে না, অধিকন্তু পায়ের তলায় অত্যন্ত নরম ও মোলায়েম বোধ হয়। শিশুর কক্ষে কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী কারণ উহা শিশুকে আঘাত ও ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করে। কাঠের বা সিমেন্টের খালি মেঝেতে অনেক সময় চলাচল করিতে অত্যধিক শব্দ হইয়া থাকে। কার্পেটের ব্যবহারে সেই শব্দ হয় না। ঘরের কাঠের মেঝেতে যদি কার্পেট পাতা থাকে এবং সেই কার্পেটের উপর দিয়া কেহ যদি ভারী পদক্ষেপেও হাঁটিয়া যায়, তাহা হইলেও অনেক সময় উহা নীচের ঘর হইতে বুঝিবার উপায় থাকে না। এতদ্‌ব্যতীত ঘরের মেঝেতে কতকগুলি বিশেষ ধরনের কার্পেট বিশেষভাবে পাতিলে, উহাদ্বারা ঘরের আয়তনকেও ছোট-বড় করিয়া দেখানো যায়।



কার্পেটের অধিক ব্যবহার মেঝেতেই

গৃহ-প্রসাধনের দিক হইতে দেখিতে গেলে কার্পেটকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

**(১) এক রঙের কার্পেট, (২) বহুবর্ণের বিচিত্র কার্পেট।**

এই দুই রকম কার্পেটেরই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং শিল্প-নৈপুণ্যের

দিক দিয়া দুইটিই মনোরম। **এক রঙের কার্পেটে মেঝের আয়তনকে অনেক বড় দেখায়।** আজকাল অনেকেই এক-রঙা কার্পেটই পছন্দ করিয়া থাকেন। কারণ উহা ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র ও সাজসজ্জার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একটি স্নিগ্ধ পটভূমির কাজ করে। অধিকন্তু আধুনিক জীবনের কর্ম-কোলাহল ও অনবরত সংঘাতের দরুণ মানুষের মন ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠে। বাহুল্য-বর্জিত এক-রঙা কার্পেট ক্লান্ত মনে আনে শান্ত ও স্নিগ্ধতার আবেশ এবং বিশ্রামকে করে সুখপ্রদ। ক্লান্ত মানুষের দৃষ্টিও স্বভাবতঃই ক্লান্ত থাকে। সে দৃষ্টির সম্মুখে আড়ম্বরপূর্ণ বহু কারুকার্য-খচিত নকশা বা চিত্রের বিভিন্ন রেখা বা রঙ সময় সময় পীড়াদায়কই হইয়া পড়ে।

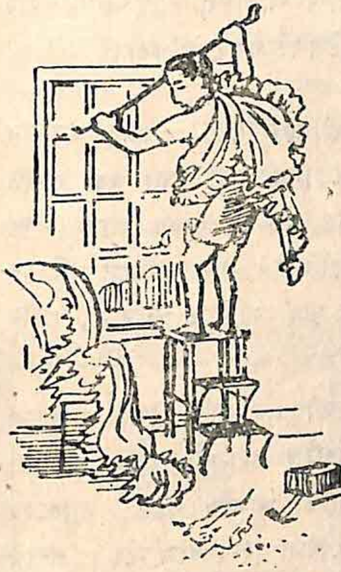
আবার বহু বর্ণে চিত্রিত কার্পেটেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ঘরের অন্যান্য জিনিসকে প্রাধান্য দিয়া মনোরম আবহাওয়া ও পটভূমি রচনা করার পরিবর্তে উহা নিজেই নিজের সৌন্দর্যে ও বর্ণ-প্রাচুর্যে প্রধান হইয়া উঠে। যে সকল কক্ষে আসবাব ও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণাদির অভাব, সেই সকল কক্ষে কার্পেটের বিচিত্র রঙ ও কারুকার্য সমস্ত অভাব ঢাকিয়া দেয়। ছোট ঘরে, বহু রঙে রঞ্জিত কার্পেট ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ উহাতে **ঘরের পরিসরকে আরও সংকীর্ণ মনে হইবে।** কাজেই দেখিলে, কত রকমের কার্পেট, আবার তাহাব ব্যবহারও কত রকমের হইতে পারে এবং উহাদের প্রয়োজনীয়তাই বা কি ও কতখানি।

## পর্দা

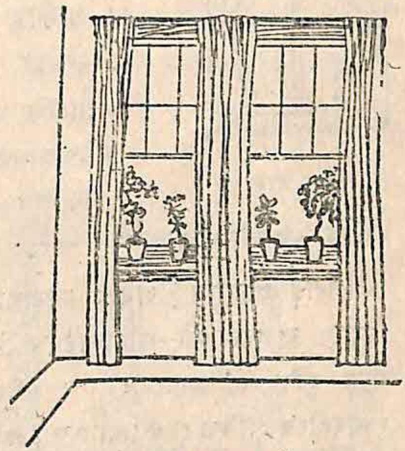
গৃহসজ্জায় পর্দা একটি প্রধান অঙ্গ। তুমি কিছুদিন অন্তর অন্তর প্রতিনিয়ত পর্দার পরিবর্তন কর—দেখিবে, তোমার গৃহখানি নিত্যই নূতন রূপ ধারণ করিবে। পর্দা-সংযোজনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির ও মাত্রাজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। পর্দা—দেওয়ালের রং, ঘরের আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণাদির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিবার একটি যোগসূত্র।

পর্দা বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কতকগুলি পর্দা প্রায় জানালার কাঁচের সঙ্গে লাগাইয়া জানালার সমান সমান করিয়া টাঙানো হয়। কতকগুলি পর্দা আবার জানালা হইতে কিছুটা দূরে একটি পিতল বা লোহার 'রড্' হইতে মেঝের সঙ্গে লাগাইয়া বা মেঝে হইতে এক ইঞ্চি উপর করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া

হয়। এই পর্দাগুলি সাধারণতঃ মোটা কাপড়ের হইয়া থাকে ও উহাতে যথেষ্ট ভাঁজ পড়ে। গৃহের প্রচ্ছদপট বা পটভূমি রচনা করিতে এই পর্দাগুলি অদ্বিতীয়। ঘরের এমন কতকগুলি জানালা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে,



পর্দা গৃহসজ্জায় একটি প্রধান অঙ্গ



যথেষ্ট ভাঁজ বহুল পর্দা

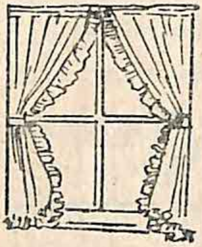
যেগুলি ঘরের ভিতর ও বাহির দুইদিকেই খোলা যায়; এই জানালাগুলির পর্দা আবার অন্য ধরণের। জানালার ফ্রেমের সহিত এই পর্দাগুলি আঁটা



নূতন ডিজাইনে পরিকল্পিত পর্দা

থাকে, যাহাতে জানালা খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময় পর্দার জন্য কোনও অসুবিধা না হয়। এই পর্দাগুলিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য পিতল বা টিন, কখনও বা কাঠের একরকম ক্লিপ ব্যবহৃত হয়। ভালো ভালো ফিতা ইত্যাদি

দিয়া বিভিন্ন জায়গায় পর্দাগুলিকে বাঁধিয়া পর্দার নূতন নূতন 'ডিজাইন'-এর পরিকল্পনা করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জানালার আকার ও আয়তন অনুযায়ী আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারের পর্দা তৈয়ারি হইয়া থাকে এবং কুঁচি, ফ্রিল, লেস ইত্যাদি লাগাইয়া প্রায় প্রতি পর্দায় কিছু-না-কিছু বৈচিত্র রচনার চেষ্টা করা।



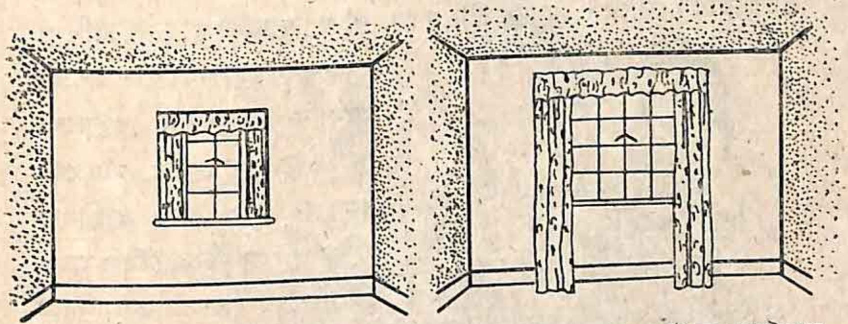
ফ্রেমে আঁটা পর্দা

***পর্দার প্রয়োজনীয়তা***—পর্দার প্রয়োজন কেবলমাত্র যে কোনও অপ্রীতিকর দৃশ্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বা গৃহের আব্রু রক্ষা করিবার জন্য, তাহা নহে। পর্দা থাকিলে বাহিরের ধূলাবালিও সহজে গৃহে আসিতে পারে না, পর্দায় ঠেকিয়া কতকটা বাধা পায়।

পর্দার প্রয়োজন প্রধানতঃ জানালার সজ্জায়। পর্দা জানালার কাঠামো হিসাবে ব্যবহৃত হয়—জানালার কাঠের কাঠিন্য পর্দা-সংযোজনায় কতকটা নরম হইয়া প্রতিভাত হয় ও দৃষ্টির স্নিগ্ধতা আনয়ন করে। বাহিরের দৃশ্যাবলীকে ঢাকিয়া দেওয়া বা অস্পষ্ট করিয়া তোলা পর্দার কাজ নহে। পর্দার কাজ বাহিরের **দৃশ্যাবলীর দৃশ্যপট হওয়া,** অর্থাৎ বাহিরের দৃশ্যাবলীকে পর্দার সাহায্যে আরও মনোরম করিয়া ফুটাইয়া তোলা হয়। গৃহসজ্জা হিসাবেও পর্দার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। পর্দা-সংযোজনায় যথেষ্ট রুচির প্রয়োজন। বিভিন্ন কক্ষে বিচিত্র পর্দার নিপুন সংযোজনায় কক্ষখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া উঠে। পর্দা গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান উপকরণ। ঘরের মধ্যে যেখানে উজ্জ্বল রঙ-বিশিষ্ট ও বহু কারুকার্য খচিত নানা আসবাবপত্র থাকে, পর্দা সেখানে পটভূমির কাজ করে অর্থাৎ পর্দা সেখানে পিছনে থাকিয়া ঐ জিনিসগুলির রঙ ও সৌন্দর্যকে সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে। আবার যেখানে আসবাবপত্রের স্বল্পতায় গৃহস্বামী বিব্রত বোধ করেন, সেখানে মনোরম রঙ বা নক্শার একখানি বড় পর্দা নিজের সৌন্দর্যে নিজেই ফুটিয়া উঠে ও গৃহের সমস্ত দীনতা ঢাকিয়া দেয়। পর্দা একাধারে **গৃহসজ্জা** ও **গৃহসজ্জার পটভূমি,** দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়াও **বাহিরের আলোককে উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল করিতে** পর্দার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দরজা-জানালায় পর্দা টাঙানো

থাকিলে বাহিরের অত্যুজ্জ্বল ও প্রখর আলোক কিছুটা ম্লান ও স্নিগ্ধ হইয়াই গৃহে প্রবেশ করে। যেমন, ফিকে-নীল রঙের পর্দার মধ্য দিয়া যখন আলো ঘরে আসে, সেই আলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মনে হয়। এইভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পর্দার সাহায্যে ঘরের আবহাওয়াকে মনোরম ও স্নিগ্ধ করিয়া তোলা যায়। আবার, অপরপক্ষে একটি উত্তরমুখী ঘরে—যেখানে সূর্যালোক কদাচিৎ প্রবেশ করে সেখানে এই নীল পর্দা ঘরের আবহাওয়াকে আরও ম্লান, আরও অন্ধকার করিয়া তুলিবে। সেই ঘরের আলোককে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলার জন্য হালকা হলুদ রঙ, সোনালী রঙ অথবা ফিকে গোলাপী রঙের পর্দার ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। কাজেই দেখিতেছ, পর্দার সাহায্যে কিভাবে ঘরের আলোককে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করা যায়।



একই আয়তনের দুইটি জানালা, কেবল পর্দা সংযোজনার বিভিন্নতার জন্য ছোট বড় দেখাইতেছে

নিপুণভাবে পর্দা-সংযোজনায় জানালা-দরজার আয়তনও আপাতদৃষ্টিতে ছোট-বড় করিয়া দেখানো যায়। যেমন, অত্যধিক লম্বা জানালার দৈর্ঘ্য কমাইয়া তুমি যদি উহাকে অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া দেখাইতে চাও, তাহা হইলে উহাতে সেই অনুযায়ী পর্দা ব্যবহার কর। গৃহসজ্জায় পর্দার প্রয়োজনীয়তা কেন এত অধিক এবং পর্দা-সংযোজনায় মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্য-বোধেরই বা কেন এত প্রয়োজন, আশা করি উপরের আলোচনা হইতে তাহা তোমরা এইবার বুঝিতে পারিয়াছ।

## পুষ্পবিন্যাস

গৃহসজ্জায় পুষ্প-বিন্যাসও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। অতি দরিদ্রের কুটীর, যেখানে প্রতি বস্তুতেই দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট, সেখানেও সুবিন্যস্ত কয়েকটি লতা ও পুষ্পস্তবক গৃহের রূপ আমূল বদলাইয়া দিতে পারে। জাপানে,

যত দরিদ্রই হউক না কেন, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই কিছু-না-কিছু ফুলের গাছ দেখা যায়। বিশেষ করিয়া চেরী ফুলের গাছ নাই এমন গৃহ জাপানে বিরল। জাপানীদের পুষ্প-প্রীতি অসাধারণ। প্রতি কক্ষে ফুল, প্রতি প্রবেশ-পথে নিপুণভাবে রক্ষিত লতা, দেখিলেই মনে হয়, উহাই যেন জাপানী জীবনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গৃহস্থের সংসারে ফুলের প্রয়োজনীয়তা এখনও পূজার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে—যদিও আজকাল সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে দৈনন্দিন জীবনে ও বিভিন্ন কাজকর্মে ফুলের অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

***পুষ্প-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা***—পুষ্প-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা যে কেবলমাত্র গৃহের শোভা-বর্ধনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। উহা গৃহস্থের মনকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। ফুলের বিচিত্র রূপ, বর্ণ ও গন্ধ মনের যাবতীয় গ্লানি ও মলিনতা মুছিয়া দেয়; পুষ্পের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই দেখিবে কিছুক্ষণের জন্য হইলেও তোমার মন যেন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়াইয়া বৃহত্তর জগতের দিকে চলিয়া যায়। এই কারণেই গৃহস্থের পক্ষে সংসারে পুষ্প-বিন্যাসের এতই প্রয়োজন। ফুলের রূপ ও সৌরভ কক্ষের আব-হাওয়াকেও মনোরম করিয়া তোলে। দেখিবে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তোমার পরিশ্রান্ত মন পুষ্পের সংস্পর্শে আসিলে, উহা দেখিতে দেখিতেই সতেজ ও কর্মক্ষম হইয়া উঠে। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। **সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ জীবনের সংস্পর্শে আসিলে মানুষের জীবনও কিছু-ক্ষণের জন্য সুন্দর** হইয়া উঠে—উহা যতই স্বল্পকাল-স্থায়ী হউক না কেন।



পুষ্পবিন্যাস

***পুষ্প-বিন্যাসের রীতি***—পর্দা বা কার্পেট ব্যবহার যেমন, তেমনি পুষ্প-বিন্যাসেও কতকগুলি নিয়ম বা রীতি আছে। পুষ্প-বিন্যাস করিতে গেলে প্রথমে চিন্তা করিবে উহা কোন কক্ষের কি প্রয়োজনের জন্য, এবং কি ফুল ব্যবহৃত হইবে।

যেমন রোগী-কক্ষের পুষ্প-নির্বাচন বা উহার বিন্যাস, অন্যান্য কক্ষ হইতে সাধারণতঃ কিছুটা ভিন্ন হইবে। সেইজন্য পুষ্প বিন্যাসে **পুষ্প-নির্বাচনই** প্রথম গুরুত্ব পাইয়া থাকে।

কোনও কক্ষের জন্য পুষ্প-নির্বাচন করিতে প্রথমেই চিন্তা করিবে, সেই কক্ষের রঙের পরিকল্পনার সহিত তোমার ফুলের রূপ ও রঙের সামঞ্জস্য থাকিবে কিনা। লক্ষ্য রাখিবে, ঘরের দেওয়ালের রঙ ও পর্দার রঙ, আসবাবপত্র ইত্যাদির রঙ মিলিয়া ঘরের মধ্যে যে সহজ সুরের সমন্বয় সৃষ্টি হইয়াছে, তোমার নির্বাচিত ফুলে যেন সে সমন্বয় নষ্ট না হয়, বা সুর কাটিয়া না যায়।

পুষ্প-সংগ্রহ করিবার সময় তুমি আরও লক্ষ্য রাখিবে, ঐ পুষ্প তুমি কক্ষের কোন্ স্থানে কিভাবে, কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে বিন্যস্ত করিতে চলিয়াছ।



বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্পের প্রয়োজন

বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্প সংগ্রহ করিতে হয়। যথা, খাবার টেবিলে তুমি যেমন ফুল ব্যবহার করিবে, জানালার কার্নিসের জন্য তুমি সেইরূপ ফুল নির্বাচন না করিয়া নিশ্চয়ই ভিন্ন ফুল নির্বাচন করিবে। কিংবা ধর, একটি উঁচু জায়গায় যে ধরণের ফুল ব্যবহৃত হইবে, একটু নীচু জায়গায় অনুরূপ ফুলের ব্যবহার তদ্রূপ শোভনীয় হইবে না।

অনেক সময় দুই-তিন রঙের ফুল দিয়াও ঘর সাজানো হইয়া থাকে। সেই সকল ক্ষেত্রেও পুষ্প সংগ্রহ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে বিভিন্ন ফুলের রঙ, বৃন্ত ও আকারের মধ্যে যেন **সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য** রক্ষিত হয়। যতই সুন্দর সৌরভযুক্ত ফুল হউক না কেন, অন্যান্য ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবে উহা নিতান্ত বেমানান ও বেখাপ্পা দেখাইতে পারে।

**পুষ্পাধার বা ফুলদান নির্বাচন**—পুষ্পের ন্যায় পুষ্পের আধার নির্বাচনেও যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন। অনেক সময় পুষ্পের আধারের জন্যই পুষ্পের সৌন্দর্য বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পুষ্পের ভাল আধার সংগ্রহ করিতে হইলেই যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা একবারও মনে করিও না। তোমাদের গৃহে নিশ্চয়ই জ্যাম, জেলি ও অন্যান্য আহার্য-দ্রব্যাদি বহু সুদৃশ্য বোতলে ও টিনে করিয়া আমদানী হয়। সামান্য রুচিবোধ থাকিলে এইগুলিকেই তোমরা পুষ্পসজ্জায় বিভিন্ন ফুলদানি ও পুষ্পের আধার হিসাবে ব্যবহার করিতে পার।



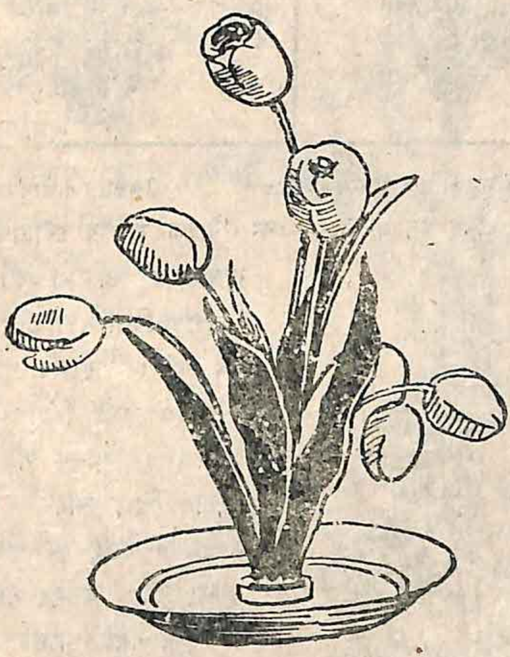
আধারের সৌন্দর্যই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে

বহু কারুকার্য-খচিত ফুলদানিতে ফুল সাজাইলে ফুলের সৌন্দর্য অপেক্ষা আধারের সৌন্দর্যই প্রধান হইয়া উঠিবে। এই কারণেই দামী উজ্জ্বল রঙ-বিশিষ্ট কারুকার্য-খচিত ফুলদানি পুষ্প-বিন্যাসের বিশেষ সহায়তা করে না। আধারের জন্য সাধারণতঃ নরম কাঁচা মাটির রঙ, কাঠের রঙ, হাল্‌কা কোন রঙ, নীল সবুজ অথবা একেবারে সাদা কিংবা কালো প্রভৃতি রঙের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুষ্প-বিন্যাসের জন্য পরিষ্কার কাঁচের ফুলদানিও মন্দ নহে।

ফুলগুলি স্বাভাবিক নিয়মে যে-ভাবে প্রকৃতির বুকে ও বৃন্তে ফুটিয়া থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আধার নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। যেমন, যে-সমস্ত ফুলের বোঁটা ছোট, সেই সমস্ত ফুলের জন্য নীচু ফুলদানিই প্রশস্ত; উঁচু ফুলদানিতে এই সকল ফুল সাজাইলে অত্যন্ত বেমানান দেখাইবে। অপরপক্ষে দীর্ঘ-বোঁটাযুক্ত ফুল উঁচু বা নীচু উভয় প্রকার ফুলদানিতেই সুন্দরভাবে সাজানো যায়। পুষ্পগুচ্ছের আকার, আয়তন ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুষ্পের আধার নির্বাচন করিবে।

**পুষ্প-বিন্যাস**—যে ফুলগুলিকে সাজাইবে উহার মধ্যে যে ফুলটি বর্ণ, বৃন্ত, আকার ইত্যাদির তুলনামূলক বিবেচনায় বিশিষ্ট, সেই ফুলটি বাছিয়া লও। সেই ফুলটিকে মাঝখানে রাখিয়া উহার চারিদিকে অন্যান্য ফুলগুলি সাজাইবে। ফুল সাজাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে মাঝখানের ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহত্তম ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্তের দৈর্ঘ্য অনুসারে অন্যান্য ফুলগুলি পর পর ধাপে ধাপে নামিয়া আসে। **পুষ্পসজ্জায় সমতা বা সমঞ্জস্য প্রধান এবং প্রথম**

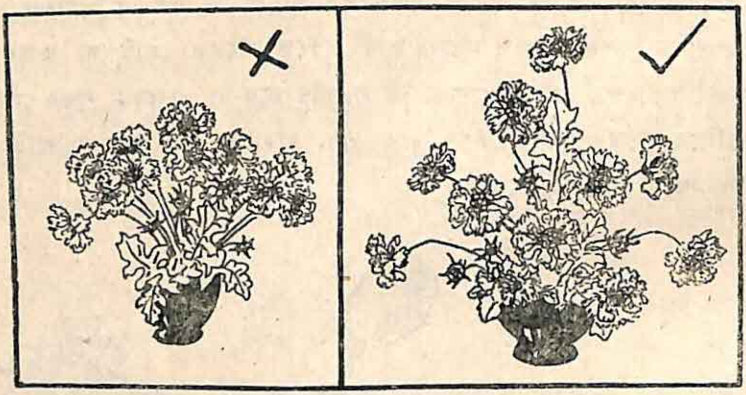
**বিবেচনার বিষয়।** মাঝখানের ফুলটির চারিপাশে অন্যান্য ফুলগুলিকে এমনভাবে সাজাইবে, যাহাতে অন্যান্য ফুলগুলির সহিত ঐ ফুলটির সামঞ্জস্য ও সমতা থাকে। যে ফুলগুলি মাঝের ফুলটি হইতে অনেক ছোট বা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, অর্থাৎ যে ফুলগুলি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না—যতদূর সম্ভব সেই ফুলগুলিকে মাঝের ফুলটি হইতে দূরে রাখ, যাহাতে পরস্পরের অত্যধিক পার্থক্য সহজে চোখে না পড়ে।



পর পর ধাপে নামিয়া আসিয়াছে

ফুল সাজাইবার সময় ফুলগুলি আঁট ছিপির ন্যায় করিয়া ফুলদানির মধ্যে ঠেলিয়া দিবে না। যতদূর সম্ভব ফুলগুলিকে আলগা রাখিবে। যদি দেখ ফুলদানির মধ্যে বোঁটাগুলি পরস্পরের গায়ে ঠাসিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ফুলদানির মধ্যে আঙুল দিয়া বোঁটাগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া আলগা করিয়া দাও। ফুল সাজাইবার সময় সমস্ত ফুলের বোঁটাগুলি কখনও এক **মাপের করিয়া কাটিবে না।** কোনটি লম্বা, কোনটি ছোট—এইভাবে বিভিন্ন মাপের বোঁটা কাটিলে, ফুলগুলি আর ছিপির মত হইয়া সমস্তই ফুলদানির মুখের কাছে

জড় হইতে পারে না। ফুলগুলি এমনভাবে সংন্যস্ত করিবে, যাহাতে বিভিন্ন



আঁট ছিপির মত ফুলগুলিকে সাজান হইয়াছে সঠিকভাবে সাজান হইয়াছে

ফুলের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং বিভিন্ন মাপের বোঁটাগুলির মধ্যেও সামঞ্জস্যের অভাব না হয়।

পুষ্প-বিন্যাসে **পাতার প্রয়োজনও** কম নহে। ফুলের পাতা নির্বাচন করিতেও যথেষ্ট বিচার ও বিবেচনার প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, পাতাগুলির যথাযথ নির্বাচন ও সংস্থানের জন্যই ফুলের রূপ অধিকতর ফুটিয়া উঠে। যতদূর সম্ভব যে গাছের যে ফুল, সেই গাছের পাতা দিয়াই পুষ্প-বিন্যাস করা উচিত, কারণ উহাতে মনে হইবে পাতার বুকে ফুলটি যেন স্বাভাবিকভাবেই ফুটিয়া রহিয়াছে। একই পাতা পাওয়া যদি দুষ্কর হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব পাতাগুলি যাহাতে উহার কাছাকাছি হয় তাহার চেষ্টা করিবে। অত্যধিক পাতা দিয়া ফুলদানিকে বোঝাই করিবে না, উহাতে ফুলের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়।



ফুলগুল আলগা রাখিবে

তুমি যে স্থানের জন্য যেভাবেই ফুল সাজাও না কেন, লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে উহাদের সহজ সৌন্দর্য নষ্ট না হয়। ফুলগুলি পাতার বুকে গাছে

যেভাবে ফুটিয়া থাকে, তুমি যদি তোমার পুষ্প-বিন্যাসের মধ্যে সেই ভাবটি ফুটাইয়া রাখিতে পার তাহা হইলেই জানিবে তোমার পুষ্প রচনা নিখুঁত হইয়াছে। কারণ **স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কাছে অন্যান্য কৃত্রিম সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়।**

ফুলগুলি সাজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে—ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে নূতন দৃষ্টি লইয়া ফুলগুলিকে দেখিবে। হয়ত তোমার মনে হইবে কোনও একটি বোঁটা লম্বা হইয়াছে বা কোনও একটি ফুল ঢাকিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উহাকে অন্যভাবে বিন্যস্ত করিবে। এই কারণেই প্রথমবার বোঁটা গুলিকে একটু লম্বা করিয়া রাখিয়া দিবে, যাহাতে প্রয়োজন মত উহাকে পরে কাটিয়া ছোট করিয়া লওয়া যায়। প্রথমবারেই কোন্ ফুলটি কোন্



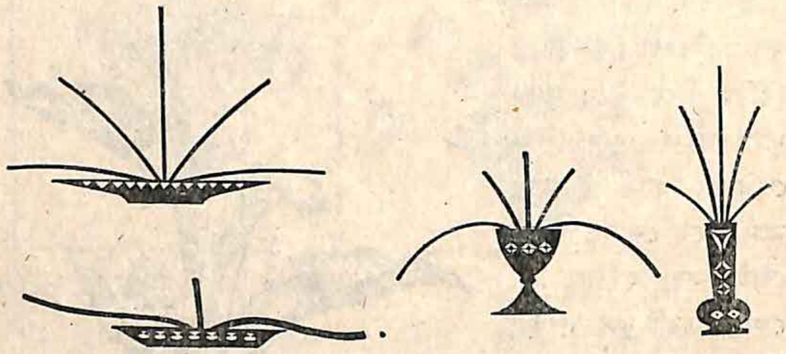
ফুলটি যেন পাতার বুকেই ফুটিয়া আছে



ডালপালা ইত্যাদির সাহায্যে গৃহ সজ্জা

দিক হইতে সুন্দর দেখাইবে তাহা চোখে নাও পড়িতে পারে। প্রথম দৃষ্টিতেই সৌন্দর্য নিরূপণ সব সময়ে সম্ভব হয় না।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পুষ্প-সজ্জার রীতিগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম, কিন্তু সব সময়েই যে অর্থব্যয় করিয়া ফুল কিনিয়া গৃহ-সজ্জা করিতে হইবে এমন নহে। পুষ্প-বিন্যাসের মধ্যে লতাপাতা, ডালপালা ইত্যাদির সজ্জাও একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পুষ্পের যথাযথ ব্যবস্থা করা অনেক সময়েই



আধারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুষ্পবিন্যাসের কয়েকটী নক্সা

দুষ্কর। সেই সকল ক্ষেত্রে ডালপালা, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি দিয়াও অনেক সময় মনোরম করিয়া গৃহ-সজ্জা করা যাইতে পারে। **সামান্য সবুজের ছোঁয়া, গৃহের রূপকে আমূল বদলাইয়া দিতে পারে।** সর্বদাই মনে রাখিবে, **ঋতু অনুযায়ী সহজলভ্য ফুল, লতাপাতা, গাছের ডালপালা ইত্যাদি দিয়া গৃহ-সজ্জা করাই পুষ্প-বিন্যাসের মূল-নীতি।**

## আলপনা

***আলপনার প্রচলন***—অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায়, মানুষ নানা লোকাচার, পূজা, অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে নানাবিধ আলপনা ও চিত্র অঙ্কন করিয়া গৃহখানিকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিত। গৃহ-সজ্জায় আলপনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহা একটি কারুকলা, রূপ-সজ্জাই আলপনার প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশে বহুকাল হইতেই আলপনার প্রচলন রহিয়াছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশে গৃহস্থ-ঘরে লৌকিক ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ায় নানা রকমের আলপনা দিবার প্রথা ছিল। তখনকার দিনে উহা প্রধানতঃ মাঙ্গলিক

হিসাবেই ব্যবহৃত হইতে এবং উহার ভিতর দিয়া তখনকার দিনের পুর-মহিলারা যে সহজ ও স্বাভাবিক শিল্পরুচির পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। সুতরাং ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, এই **আলপনা বাংলাদেশের পুরনারীদেরই দান—বংশানুক্রমে তাহাদেরই সহজাত প্রতিভায় উহা পরিণতি লাভ করিয়াছে।** বাঙালীর পর্ণ-কুটীরে শিল্প-সাধনায় অতি সামান্য উপকরণ হইতে বাংলার কুলমহিলাদের স্বাভাবিক শিল্প-অনুরাগ ও সহজ প্রতিভার মধ্যেই এই আলপনা-শিল্পের জন্ম। তাঁহারা বরাসনের পিঁড়ি, ঘরের সিকা ও ঘরের দেওয়ালে যে-সব সুন্দর আলপনা আঁকিয়া অন্তঃপুরের শোভাবর্ধন করিতেন, পল্লীগ্রামে তাহার ধারা আজিও



লক্ষ্মীপূজার আলপনা—মাঝখানে ধানের ছড়া ও লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

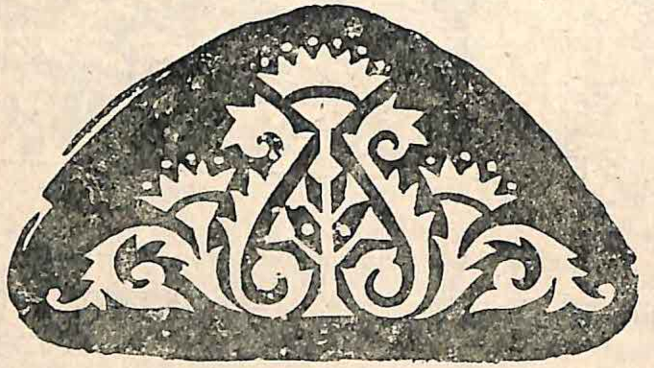
একেবারে লুপ্ত হয় নাই; তখনকার দিনের **মোচালতা, কলাছড়ি, কল্‌মিলতা, শঙ্খলতা** প্রভৃতি আলপনার শিল্প-চাতুর্য সত্যই প্রশংসনীয়।



বরাসনের পিঁড়ি চিত্রণ

আলপনা নানা রকমের হইয়া থাকে। স্থান-বিশেষে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

বিভিন্নরূপ ও আকৃতির আলপনার প্রয়োজন হয়; যেমন, মেঝের কয়েকটি বিশেষ আলপনা ছাড়া বেশির ভাগ আলপনাই দেওয়ালে আঁকিলে বেমানান দেখায়। আলপনা দিবার সময় দেওয়াল বা মেঝের আকার ও অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আলপনাতেও সূক্ষ্ম-সৌন্দর্যানুভূতি ও সহজ-মাত্রাজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। আলপনার দুইটি দিক আছে—**বাহিরের আকৃতি ও ভিতরের শৃঙ্খলা** বা বিভাগ। আলপনা দিবার সময়ে বিশেষ ধৈর্যসহকারে এই দুইটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, মণ্ডন-শিল্পের রচনায় রূপ ও ছন্দের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আলপনা-আঁকার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।



নক্‌শাটি ঠিক করিয়া লইবে

পূজা বা মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্ম ভিন্ন গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনেও আলপনার একটি বিশেষ স্থান আছে। কারণ ইহার দ্বারা গৃহ-সজ্জার অনেকখানি সহায়তা হয়। অনেক বাড়ীতে মনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য শয়ন-ঘরের মেঝেতে আলপনা দিবার রীতি আছে। মানুষ যেখানে বাস করে সেখানকার পরিবেশটি যাহাতে সর্বপ্রকারে মনোরম হয়, সেই দিকে মেয়েদের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। স্বল্প-ব্যয়ে প্রতিদিন গৃহের ভিতরের সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার পক্ষে আলপনা অত্যন্ত উপযোগী।

আলপনা দিবার কতকগুলি রীতি-নীতি আছে পূর্বে বলিয়াছি। যে স্থানটিতে আলপনা দিতে হইবে, প্রথমে সেই স্থানটি ধুইয়া মুছিয়া বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। তাহার পর স্থানটির আকার, পারিপার্শ্বিক এবং

আলপনা দিবার উপলক্ষ কি—এই সমস্ত ভাবিয়া কি ধরনের আলপনা দিলে মানাইবে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিবে। আলপনা সাধারণতঃ সাদা-রঙের হইয়া থাকে, তবে উহাতে বর্ণ-বৈচিত্র্য তেমন ভাবে প্রকাশ পায় না বলিয়া আজকাল রঙিন আলপনার প্রচলন হইয়াছে। আলপনার নক্‌শাটি প্রথমেই ঠিক করিয়া লওয়া দরকার, তাহা না হইলে উহার জ্যামিতিক রেখাগুলি পরস্পর সমান হইবে না এবং সমগ্র আলপনাটিতে রূপ ও ছন্দ বজায় থাকিবে না। অতঃপর সেই নক্‌শা ধরিয়া কেন্দ্র হইতে আলপনা আঁকিতে আরম্ভ করিবে। আগেই বলিয়াছি, অল্প পরিশ্রমের কাজ হইলেও ইহাতে যথেষ্ট ধৈর্য ও অখণ্ড মনোযোগের প্রয়োজন ; নতুবা সামান্য অসাবধানতার কারণে উহার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আলপনা আঁকা শেষ হইবার পর উহার আশপাশ খুব সাবধানে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। আলপনার চারিদিকে যত ফাঁকা জায়গা থাকিবে, উহা দেখিতে তত সুন্দর হইবে।



আঙুল দিয়াই তুলির কাজ করিতে হয়

আজকাল বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই গৃহ-শিল্পটি শিক্ষা দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনে আলপনা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বলিতে গেলে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে এই গৃহ-শিল্পটির পুনরুজ্জীবন করেন এবং সেজন্য আজকাল আলপনা-শিল্পে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ চাউলের গুঁড়া দিয়াই আলপনা দিতে হয়, তবে ময়দা, মিহি

খড়ির-গুড়া বা হোয়াইটিং গুলিয়াও আলপনা দেওয়া যাইতে পারে। একটি বাটিতেকিছু আতপ চাউল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে, শিলে ঐ চাউল খুব মিহি করিয়া বাটিয়া লইবে। ঐ বাটা-চাউলের সহিত সামান্য জল মিশাইবে, খেয়াল রাখিবে, যাহাতে ঐ তরল পদার্থটি বেশ ঘন হয়। এইভাবে আলপনার মণ্ড বা পিটুলি তৈয়ারি করিতে হয়। তারপর এক টুকরা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ( দৈর্ঘ্য ৪।৫ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২।৩ ইঞ্চি হইলেই চলিবে ) ওই পিটুলি গোলায় ডুবাইয়া দক্ষিণ হস্তে রাখিবে। পরে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী এমনভাবে জোড়া করিয়া ধরিবে যেন অনামিকার অগ্রভাগটি ঈষৎ অগ্রে থাকে।



মেঝের আঁকিবার একটি চতুষ্কোন-নক্‌শা

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপে বস্ত্রখণ্ড হইতে ধীরে ধীরে মণ্ড গড়াইয়া ঐ অনামিকা বাহিয়া নামিয়া আসিবে এবং উহার সাহায্যেই আলপনা অঙ্কন করিবে। আলপনায় সাধারণতঃ তুলির পরিবর্তে এইভাবে হাতেরআঙুল দিয়াই কাজ করিতে হয়।

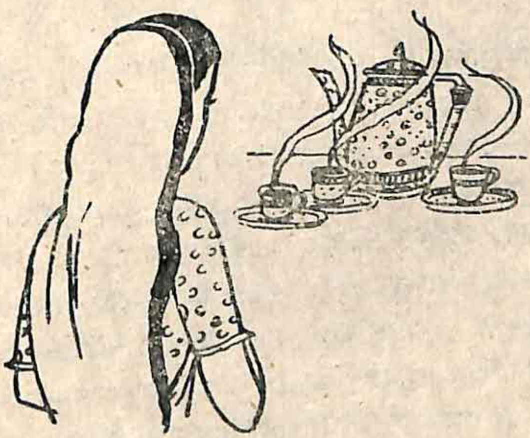
অনেক জায়গায় চাউলের গুঁড়া দিয়া শুক্‌না আলপনা দিবার রীতি দেখা যায়। শুক্‌না আলপনায় চাউলের গুঁড়ার সহিত জল মিশানো হয় না। চাউলের গুঁড়ার সহিত অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রয়োজন মত লাল, হলুদ বা সবুজ রং ইত্যাদি মিশাইয়া লওয়া হয়। এই ধরনের শুক্‌না আলপনা মেঝে বা সমতল স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও দেওয়া চলে না। দেওয়ালের পক্ষে ভিজা আলপনাই প্রশস্ত।

## তৃতীয় অধ্যায়

# গৃহ পরিচালনা

***গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য***—তোমরা ছোট-বড় সকলেই গৃহে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে বাস কর, কিন্তু উহা কিরূপে সম্ভব হয় কখনও ভাবিয়াছ কি? তোমাদের দেহ-মনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যে দুটি মঙ্গল-হস্ত অহরহ নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহার কথা হয়ত কখনও চিন্তা কর নাই। গৃহকর্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়াই সংসার গড়িয়া উঠে; গৃহকর্ত্রীর উপরেই গৃহ-পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

গৃহ-পরিচালনার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য—যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে গৃহের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করিয়া প্রতি গৃহকেই সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার



দুইটি মঙ্গলহস্ত নিয়োজিত রহিয়াছে

নিকেতন করিয়া গড়িয়া তোলা। সুনিপুণ পরিচালনার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ রচনা করা এবং তাহা অব্যাহত রাখাই **গৃহকর্ত্রীর আসল কাজ।**

গৃহের যথাযথ পরিচালনার উপরেই নির্ভর করে গৃহের অধিবাসীদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। কেবল প্রচুর অর্থ থাকিলেই যে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের

ব্যবস্থা করা যায়, তাহা নহে। উহাতে যথেষ্ট রুচি, বিবেচনা ও বিচারের প্রয়োজন হয়। তোমরা জান, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, রন্ধন, ভোজন, স্নান, নিদ্রা, বিশ্রাম, সংসারে আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়, শুশ্রূষা প্রভৃতি যে কাজগুলি প্রতিনিয়তই গৃহাভ্যন্তরে সম্পাদিত হয়, সেইগুলির সু-পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। গৃহাভ্যন্তরে দৈনন্দিন কাজগুলির সুনিয়ন্ত্রণ করাই গৃহ-পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি মানুষ যখন সু-পরিচালনার দ্বারা, উহাদের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই কেবল উহারা সংসারকে বা সমাজকে উহাদের যাহা দেয়, তাহা দিতে পারিবে। গৃহের সু-পরিচালনা এই দিক দিয়াও আমাদের সহায়তা করে।

গৃহবাসীরাই গড়িয়া তোলে সমাজ। সমাজ আর কিছুই নহে—কতিপয় গৃহের অধিবাসীদের একটি সম্মিলিত রূপ মাত্র। সু-পরিচালনার দ্বারা গৃহকর্ত্রী যদি গৃহের সুখ ও সম্পদ ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজও দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সুতরাং গৃহের সম্পদ বাড়াইতে ও সেই সঙ্গে সমাজকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে গৃহ-পরিচালনার গুরুত্ব অনেক।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই নির্ভর করে গৃহের উপর। যে গৃহ সু-পরিচালিত নহে, বা যে গৃহ সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর নহে—সে গৃহে শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে না। শিশুর শরীর ও মনের সু-গঠনের জন্য সুপরিচালিত গৃহের একান্ত প্রয়োজন। গৃহের সু-পরিচালনার উপরেই নির্ভর করে শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। কেবলমাত্র শিশু কেন, প্রত্যেক মানুষেরই সুরুচি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতি মানসিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ, সু-পরিচালিত গৃহ ও গৃহ-পরিবেশ হইতেই আসে। তাই সমাজ-গঠন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলার কাজে গৃহ-পরিচালনা প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

***গৃহ-পরিচালনার কাজ***—তোমরা প্রত্যেকেই কোনও না-কোনও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কখনও চিন্তা করিয়াছ কি—ঐ পরিবারে মধ্যে প্রতিনিয়ত কত রকম কাজ সম্পাদিত হইতেছে? সংসারের কাজগুলিকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করিবার বিষয় কখনও ভাবিয়াছ কি?

পূর্বেই বলিয়াছি, গৃহ-পরিচালনা বলিতে আমরা সাধারণতঃ গৃহাভ্যন্তরে

যে কাজগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে, ঐগুলিরই যথাযথ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়া থাকি। গৃহের কাজগুলিকে প্রধানতঃ গৃহ-রচনা, খাদ্য-ব্যবস্থা, পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা, শিশু-শিক্ষা ও সংসারের অপরাপর সমস্যা সমাধান ইত্যাদি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এখন প্রত্যেকটি ভাগের মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে :—

**গৃহ-রচনা**—গৃহ-রচনা বলিলে আমরা গৃহ-পরিকল্পনা' পরিচ্ছন্নতা বিধান, আবর্জনাদি নিষ্কাশন, গৃহসজ্জা, আসবাবপত্রাদির যথাযথ সংস্থান ও বিন্যাস প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ই বুঝিয়া থাকি। তুমি যে-গৃহের পরিচালনার ভার লইয়াছ, কিভাবে—একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনার দ্বারা উহার বিভিন্ন কক্ষগুলিকে



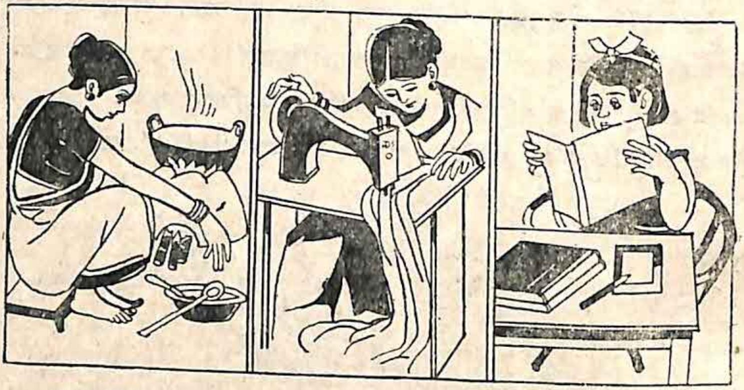
যেভাবে শ্রীমণ্ডিত করিতে হইবে

বিভিন্ন কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া সংসারের সকল প্রয়োজন মিটাইতে পার, সেইদিকেই প্রথমে দৃষ্টি দিবে। তার পরেই তুমি চেষ্টা করিবে, ভিতরে ও বাহিরে উহার পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিয়া, সজ্জার বিভিন্ন উপকরণগুলি দিয়া কিভাবে উহাকে শ্রীমণ্ডিত ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়া তুলিতে পার।

**খাদ্য-ব্যবস্থা**—খাদ্য-পরিকল্পনা ও খাদ্য-ব্যবস্থা গৃহ-পরিচালনার একটি প্রধান ও অপরিহার্য অঙ্গ। খাদ্যের উপরেই আমাদের পুষ্টি ও সুস্থতা নির্ভর করে। সুতরাং খাদ্য-ব্যবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও বিবেচনা থাকা আবশ্যক। খাদ্য-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলে কোন্ বয়সে বা কোন্ অবস্থায় কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, উহার প্রস্তুতি-প্রণালী বা উহার পরিবেশন রীতি কি ইত্যাদি সকল বিষয়েই জানা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে

প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-ভোজন প্রভৃতি দিনের বিভিন্ন সময়ের খাদ্যগুলি কি ভাবে নির্বাচিত করিবে, খাদ্য-তালিকা কিভাবে প্রস্তুত করিবে ইত্যাদি বিষয়গুলি অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

**পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা**—খাদ্যের পরেই আসে পরিচ্ছদের সমস্যা। পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবার সময় পরিবারের কোন্ ব্যক্তির জন্য কি ধরনের



খাদ্য-ব্যবস্থা পোষাক-পরিচ্ছদ শিশু-শিক্ষা

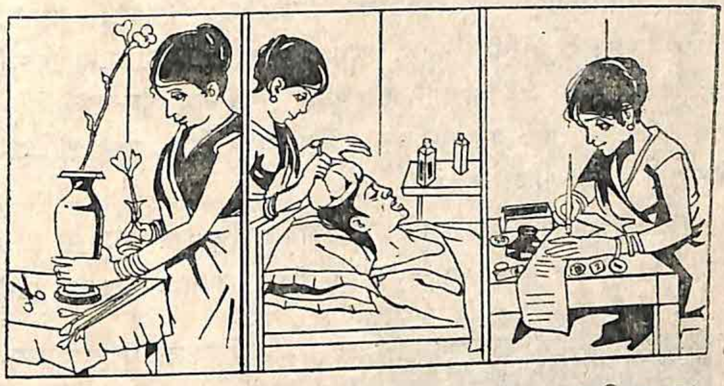
পরিচ্ছদ নির্বাচন করিবে, উহা প্রস্তুত করিবার ধরন কি হইবে ইত্যাদি সকল বিষয়ের সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পুরানো পোষাক সামান্য অদল-বদল্ করিয়া নূতন পোষাকের ন্যায় মজবুত ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়। পরিচ্ছদ নির্বাচন, পরিচ্ছদ তৈয়ারি করা, পুরানো পরিচ্ছদের সংস্কার, পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়ই এই বিভাগে পড়ে।



প্রধান কাজ শিশুর শিক্ষা

**শিশু-শিক্ষা**— গৃহ-পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা কঠিন ও প্রধান কাজ শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা। শিশুর স্নান, ভোজন, নিদ্রা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, সু-অভ্যাস গঠন ও শিক্ষা, বিভিন্ন প্রয়োজন, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই গৃহ-কর্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি ও সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা একান্ত আবশ্যক।

**গৃহের অপরাপর সমস্যা-সমাধান**—পূর্ব-বর্ণিত গৃহ পরিচালনার প্রধান বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক গুরুতর সমস্যা আছে। যেমন, গৃহে রোগ ও উহার পরিচর্যা, সংসারে সঞ্চয় ও আয়-ব্যয় প্রভৃতির ব্যবস্থা, ছোট ছোট আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির আয়োজন দ্বারা অতিথি-অভ্যাগতের মনোরঞ্জন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়গুলি গৃহ-পরিচালনার মধ্যে পড়ে এবং এইগুলির কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না।



গৃহ-সজ্জা রোগ পরিচর্য্যা আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা

কাজেই দেখিতেছ, গৃহাভ্যন্তরের এই বিভিন্ন কাজগুলি সু-পরিকল্পনার দ্বারা সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইয়া যাওয়ারই অপর নাম **গৃহ-পরিচালনা**।

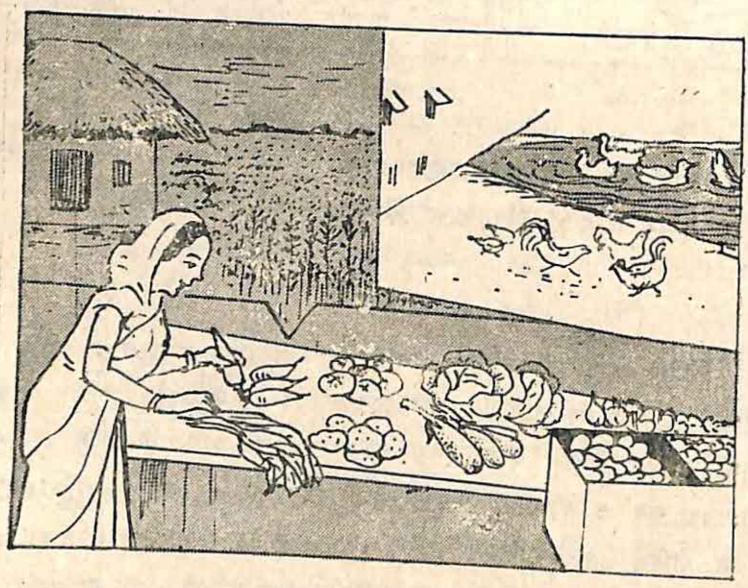
## সু-গৃহিণী

সেই গৃহ-কর্ত্রীকেই সুনিপুণা বলা যায়, যাহার পরিচালনায় সুখ, শান্তি ও সম্পদে গৃহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সংসারের আয়ের ভাগ বাড়াইয়া, অথবা ব্যয়ের ভাগ কমাইয়া যিনি গৃহে শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত, প্রতিটি মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সমর্থ হইয়াছেন—যথার্থ গৃহ-পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে বলিতে হইবে। তাঁহাকেই সু-নিপুণা গৃহকর্ত্রী বলা যায় যাঁহার সু-পরিচালনায় ও মধুর ব্যবহারে অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে একটি সহানুভূতি ও প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সংসারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে। এক কথায়, গৃহের প্রত্যেকটি বিষয় যাঁহার নখদর্পণে এবং গৃহকর্মের প্রত্যেকটি

বিভাগ যাঁহার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, তিনিই **আদর্শ গৃহকর্ত্রীর** আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। তিনিই **সু-গৃহিণী**।

***সু-গৃহিণীর গুণাবলী ও কর্তব্য***—সুনিপুণা গৃহকর্ত্রীর লক্ষণগুলি পড়িলে। গৃহ-কর্ত্রীর গৃহ-পরিচালনায় কোন্ কোন্ কর্তব্য সম্পাদন প্রয়োজন তাহাও মোটামুটি পড়িয়াছ; এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে গৃহ-পরিচালনার কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি—সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিচালনার উপরেই। সংসারের অতিরিক্ত ব্যয়ভার সংকুচিত করিয়া গৃহের আয় বা সঞ্চয় বাড়ানো গৃহকর্ত্রীর একটি প্রধান কাজ; এই কারণেই গৃহ-কর্ত্রীর অপর নাম **গৃহ-লক্ষ্মী**। এই কাজ ভালভাবে পরিচালনা করিতে হইলে গৃহ-কর্ত্রীকে যথেষ্ট **পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী** ও **দূরদর্শী** হইতে হয়।

গৃহকে সুখ-শান্তিময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব একান্তভাবে গৃহকর্ত্রীর; সুতরাং গৃহ-পরিকল্পনা, খাদ্য-ব্যবস্থা, শিশু-পালন, সংসারে আয়-ব্যয়, রোগীর



সংসারের আয় বাড়ানো গৃহকর্ত্রীর একটি প্রধান কাজ

শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহকর্ত্রীর জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক তাঁহার সু-শিক্ষা, মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ; উদার আভ্যন্তরীণ

ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, প্রসাধন ইত্যাদির দ্বারা গৃহকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা গৃহ-কর্ত্রীর কাজ। শ্রীহীন গৃহ ছন্নছাড়া জীবনেরই পরিচয় বহন করে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রভূত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সু-শিক্ষা ও মার্জিত রুচির অভাবে গৃহবাসীর মূল উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সু-শিক্ষা ও সু-রুচি কেবলমাত্র যে গৃহ-প্রসাধনের জন্যই গৃহ-কর্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক, তাহা নহে। ঐ দুইটি জিনিস ব্যতীত গৃহকে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়া তোলা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নহে। কোনও দুইটি মানুষের প্রকৃতি সব সময়ে একরূপ হইতে পারে না। সংসারে ভিন্ন প্রকৃতির বহু মানুষ থাকে। বিভিন্ন প্রকৃতির সকলের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া সকলকে চালাইবার ভার গৃহ-কর্ত্রীর। সুতরাং একদিকে যেমন গৃহকর্ত্রীর সুন্দর ও উদার স্বভাব হওয়া উচিত, অপরদিকে আবার তেমনি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অসহিষ্ণু, কোপন-স্বভাব লোকের পক্ষে সকলকে খুশী করিয়া মানাইয়া চলা কঠিন। মানসিক সংযম, সমতাবোধ প্রভৃতি গুণগুলি না থাকিলে, গৃহের কোনও লোক যদি কখনও রূঢ় ব্যবহার করে কিংবা কথায় মনের তিক্ততা প্রকাশ করে, তাহা হইলে গৃহকর্ত্রীর পক্ষে হাল্‌কা হাসি ও কথায় উহা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন হয়। এই বিরূপ মনোভাবের কারণে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না এবং ক্রমেই মনোমালিন্য বাড়িতে থাকে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় গৃহ-পরিচালনার কাজ নিতান্তই সহজ ও সকলের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু বস্তুতঃ গৃহ-পরিচালনা করিতে হইলে **একটি স্বাভাবিক মমতা**, একটি **সংযত মন, কষ্টসহিষ্ণুতা** ও **ধৈর্য** প্রভৃতি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। তোমরা পড়িয়াছ, গৃহকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আবাস করিয়া গড়িয়া তোলা, নূতন সমাজের জন্য সুস্থ দেহ-মনের নূতন মানুষ তৈরি করাই গৃহ-কর্ত্রীর কাজ। এই দুইটির কোন কাজটিই সহজসাধ্য নহে। উহার জন্য গৃহ-কর্ত্রীর যথেষ্ট শান্ত, সংযত, সুশৃঙ্খল ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। গৃহ-কর্ত্রীকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না হইতে হইবে, যাহাতে তিনি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গৃহের ছোট-বড় আত্মীয়স্বজন, দাস-দাসী—সকলের উপরেই নেতৃত্ব করিতে পারেন ও প্রয়োজন হইলে উহাদের মনের পরিবর্তনও আনিতে পারেন। নেতৃত্ব করিতে হইলে একদিকে যেমন কিছুটা কাঠিন্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার পরের দুঃখ বুঝিবার ও উহা দূর করিবার জন্য, অর্থাৎ পরের মনে প্রবেশ করিবার জন্য, একটি সূক্ষ্ম-অনুভূতি

ও সংবেদনশীল মনেরও একান্ত আবশ্যক। কারণ সুখে-দুঃখে বিপদে আপদে গৃহকর্ত্রীই একমাত্র নির্ভর—এই দৃঢ় বিশ্বাসটি গৃহবাসীর মনে জাগাইবার গুরু দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীর নিজেরই। আরও একটি কথা জানিয়া রাখ—মানুষকে পরিচালনা করিতে হইলে, অর্থাৎ মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতে হইলে **মানুষকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিবে।** উহাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ নিজের বলিয়া মনে করিবে। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সেই গুণটিরই, যাহার দ্বারা তিনি গৃহের সবাইকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই দেখিবে, গৃহস্থিত সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে, উহাদের আনন্দ বর্ধনে গৃহকর্ত্রী আপনা হইতেই সচেষ্ট হইবেন। উহাদের প্রতিদিনকার ছোট-খাট প্রয়োজনগুলি মিটাইতে, উহাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে গৃহকর্ত্রীর যে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি, সময়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলির প্রয়োজন, উহা আপনা হইতেই দেখা দিবে। গৃহের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারার দরুনই যিনি নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাঁহার জীবন সার্থক হয় নাই। গৃহকর্ত্রী কর্তব্যপরায়ণা হইবেন, কর্তব্যপালনে তাঁহার অবশ্যই অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিবে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের মনখানিও কিছু পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হইবে। মনকে বাদ দিয়া কেবল কর্তব্যপালনে কখনো মন তৃপ্ত হয় না জানিবে।

***গৃহবাসীদের সহিত ব্যবহার***—সংসারের অন্যান্য পরিজনদিগের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার সর্বদা স্নেহপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিজের ছেলে-মেয়ে বা স্বামীরই আদর-যত্ন করিব, অন্যদের করিব না ইহা কখনও সু-গৃহিনীর আদর্শ হইতে পারে না। সংসারে থাকিতে হইলে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি সজীব রাখিতে হয়। অন্যের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সর্বদা কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করা উচিত নহে। অনেক সময় অনেক সংসারে দেখা যায় গৃহিণী কেবল নিজের ঘরখানির কথাই চিন্তা করেন। গৃহের অপর কক্ষগুলি যেন অপর কাহারও, যেন সংসারের বহির্ভূত! অপর পরিজনদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহাদের বিপদ-আপদ, তাঁহার জীবনের সমস্যা যেন তাঁহার মনকে স্পর্শই করে না, কেবলমাত্র তাঁহার নিজের ও নিজের স্বামী-পুত্রের চিন্তাতেই মন ভরপুর।

অপরের কথা চিন্তা করিবার অবসরই যেন তাঁহার নাই, দিবারাত্র নিজের স্বার্থ-চিন্তাতে তাঁহার মন এমনই ছোট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ রমণী গৃহিণী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি গৃহকর্ত্রীর পদের অনুপযুক্তা। তাঁহার দ্বারা গৃহ-পরিচালনার কাজ চলিতে পারে না। নিজের মন যাঁহার মরিয়া গিয়াছে, তিনি সংসারের অতগুলি মনের ভার লইবেন কি করিয়া? কেবলমাত্র অর্থের দ্বারাই গৃহ-পরিচালনা করা যায় না, **গৃহ পরিচালনায় প্রাণের সজীবতা ও হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিরও সহজ বিকাশ একান্ত আবশ্যক।**

**পরিজনবর্গের সহিত ব্যবহার**—আমাদের দেশে সাধারণতঃ পরিবার-গুলির পরিজন সংখ্যা অধিক। শ্বশুর-শাশুরী, আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত এক একটি সংসারের ভার গৃহকর্ত্রীকে যথাযথ গ্রহণ করিতে হইলে, পরিবারের প্রত্যেক পরিজনের প্রতি তাঁহার যথোচিত সম্মান বা অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতার মতনই মনে করিতে হইবে। তাঁহাদের ত্রুটি সমূহ সহ্য করিয়া, হাসিমুখে সমস্ত মন দিয়া, তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যতই শাসন করুন না কেন, গৃহকর্ত্রীকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সে শাসনের মধ্যে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাদের সস্নেহ আশীর্বাদ। ঠিক তেমনি করিয়া স্বামীর ছোট ভাই-বোনদের গৃহকর্ত্রীর নিজের ভাই-বোনদের মতনই মনে করিতে হইবে। তাঁহাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার সর্বদা সহৃদয় ও সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই। উহাদের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার একদিকে যেমন স্নেহ মমতা-ব্যঞ্জক হইবে, অপরদিকে তেমনি আবার প্রয়োজন হইলে, উহাদের মঙ্গলের জন্য, উহাদের কঠিন শাসন করিতেও তিনি বিরত হইবেন না। অনেক সময় নিকট-আত্মীয় না হইলেও অর্থাভাব ও নানা অসুবিধার জন্য অনেক দূর সম্পর্কীয় পরিজনদের সংসারে আশ্রয় লইতে দেখা যায়। তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর অধিকতর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রীকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাঁহার কথায় বা আচরণে এমন কিছু যেন প্রকাশ না পায়, যাহাতে ঐ পরিজনেরা মনে করিতে পারেন যে, নানা বিপত্তি ও অভাববশতঃ তাঁহার সংসারে আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়াই গৃহকর্ত্রী তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন।

**সন্তানের প্রতি কর্তব্য**—পূর্বেই বলা হইয়াছে, শিশু-পালন ও শিশু-শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সংসারের যাবতীয় কাজ গৃহকর্ত্রীর উপর ন্যস্ত আছে

ঠিকই, তথাপি তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক হইবে—**স্নেহের, শাসনের ও বন্ধুত্বের।** আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতা-মাতার সম্বন্ধ—হয় অত্যধিক স্নেহের নয়, অত্যধিক শাসনের। ছেলে-মেয়েকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে এখনও খুব কম পিতা-মাতাকেই দেখা যায়, যদিও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেলে-মেয়েদের মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ উহাতে ছেলে-মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সমস্যাগুলির বিষয় পিতামাতার নিকট বলিতে পারে। পিতা-মাতার **অত্যধিক স্নেহ** বা **অত্যধিক শাসন**—কোনটাই ছেলে-মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

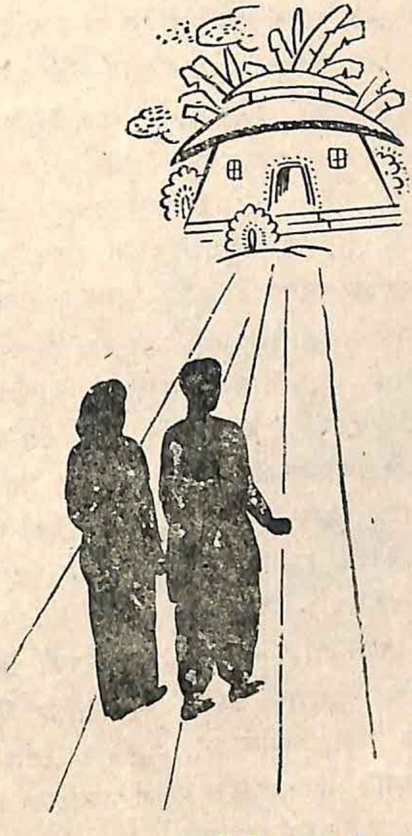


দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না

**স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য**—স্বামীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার সাধারণতঃ কিরূপ হওয়া উচিত উহাও মোটামুটি জানিয়া রাখা আবশ্যক। তোমরা জান, বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন বলিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। কিন্তু স্ত্রীকেও স্বামীর বহু দায়িত্ব ও বহু কাজের ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই গৃহকর্ত্রীই স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী, যিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম-কুশলতা দিয়া সংসারের ভিতরে ও সংসারের বাহিরে স্বামীর প্রতিটি মঙ্গলকার্যে সহায়তা করেন। সেই গৃহকর্ত্রীই উপযুক্ত স্ত্রী, যিনি তাঁহার অসীম ধৈর্য, অপরিসীম মনোবল ও অফুরন্ত উৎসাহ দিয়া অত্যন্ত বিপদের মুখেও স্বামীর কাজে অনবরত প্রেরণা যোগাইয়া যান। স্ত্রীর ধর্ম্মই সেবা। ধরিত্রীর ন্যায় নীরব ও অকৃত্রিম সেবায় অহরহ যিনি স্বামীর সংসারের মন ভরাইয়া রাখিয়াছেন সেই গৃহকর্ত্রীরই যথার্থ স্ত্রীর আসন গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, সেই স্ত্রীই **আদর্শ স্ত্রী**—যাঁহার মন স্বামীর মন হইতে কখনও ভিন্ন নহে। স্বামী-স্ত্রীর, অর্থাৎ গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর **অভিন্ন মতের মিলনেই গড়িয়া উঠে সুন্দর ও সুস্থ সংসার।**

**দাসদাসীদের প্রতি ব্যবহার**—রাজা-মহারাজা হউন আর পথের ভিখারীই হউন, প্রত্যেকেরই মান-অপমান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বর্তমান

প্রত্যেকেরই আছে একটি মন। সংসারে দাসদাসী ও ভৃত্যদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর সর্বদা এই কথাটিই মনে রাখা আবশ্যক যে, **মন আছে বলিয়াই আমরা প্রত্যেকে মানুষ।** সুতরাং গৃহকর্ত্রী সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে তাঁহার আচরণে, কথায়, বা আদেশের ভঙ্গীতে এমন কিছু প্রকাশ না



মতের মিলনেই গড়িয়া উঠে সুন্দর সংসার

পায়, যাহাতে উহাদের ঐ মনে অপমান বা লাঞ্ছনা বোধ জাগিতে পারে। উহাদের সহিত ব্যবহারে গৃহকর্ত্রী সর্বদা উহাদের **মনুষ্যত্বকে সম্মান** দেখাইয়া চলিবেন। গৃহকর্ত্রীর নিকট সেবক বা সেবিকারূপে আসিয়াছে বলিয়াই, তিনি যেন একবারও মনে না করেন যে, সে অধঃপতিত নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হইল। সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে অর্থোপার্জনের কাজ সৎকাজই।

সৎকাজের দ্বারা মানুষ কখনও ছোট হইতে পারে না—সুতরাং গৃহকর্ত্রীই বা উহাদের ছোট করিয়া দেখিবেন কেন? উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বহু অভাবে ও বহু দুঃখে পড়িয়াই আজ উহারা তাঁহার গৃহে ভৃত্যের কাজ করিতে আসিয়াছে। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে এই দুঃখী মানুষরাই গৃহকর্ত্রীর নিকট অধিকতর স্নেহ-মমতার দাবী করিতে পারে। সেই স্নেহ-মমতা হইতে উহাদের বঞ্চিত করার অর্থই উহাদের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর এরূপ আচরণ করিতে হইবে যাহাতে উহারা মনে না করে, উহাদিগকে আত্মীয়-পরিজন-বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। উহাদের সহিত ব্যবহারে গৃহকর্ত্রীকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটি প্রকট না হইয়া উঠে। গৃহকর্ত্রীর সামান্য স্নেহ ও সহানুভূতির বিনিময়ে উহারা সময়ে প্রাণ দান করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। **মনের বিনিময়েই মন পাওয়া যায়**—গৃহে দাসদাসীর সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীকে এই কথাটাই স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। **পরিবারবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তিনি যেমন সর্বদা সতর্ক, তেমনিই দাস-দাসীর বেলাতেও উহাদের খাওয়া-দাওয়া, আরাম, বিশ্রাম, প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারে গৃহকর্ত্রীকে সজাগ ও সযত্ন** হইতে হইবে, তবেই গৃহকর্ত্রী উহাদের নিকট হইতেও অধিকতর সহৃদয় ও সযত্ন ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন। গৃহের দাস-দাসীদের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার একদিকে যেমন আন্তরিক ও স্নেহসূচক হইবে—একদিকে যেমন রোগে-শোকে বিপদে-আপদে গৃহকর্ত্রী উহাদের আগলাইয়া রাখিবেন—অপরদিকে আবার তেমনি কর্তব্যপালনে উহাদের স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির কঠোর সমালোচনা, শাসন ও শোধন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। মানুষকে আপন করিতে হইলে বা মানুষের আপন হইতে হইলে **স্নেহ ও শাসন** উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

# অতিথিসেবা

ধর্ম বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা হইলে জানিবে, মানুষের **সেবার মত বড় ধর্ম আর নাই।** মানুষের জন্ম বা জীবনের উদ্দেশ্যই জীবের সেবা করা। সুতরাং তোমরা এখন হইতে নিজেদের সেবাধর্মে দীক্ষিত কর। যদি কখনও কাহারও সামান্য কিছু উপকার করিবার সুযোগ পাও, তাহা হইলে প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া, সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া উহার ঐ কাজটুকু করিয়া দিবে।

অতিথিসেবা বা আতিথেয়তা গৃহস্থের একটি পরম ধর্ম। আমাদের দেশে পূর্বে অতিথি-অভ্যাগতদের পরিচর্যা করা সংসারের অন্যতম কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। অতিথি আসিলেই যেন গৃহে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত, তালপাতার পাখা হাতে ব্যজন করিতে করিতে নানা কথায় ও কুশল প্রশ্নে অতিথির পথশ্রম দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। অন্য দিকে গৃহস্বামী ছুটিতেন—ক্ষেতের নূতন ফসলটি, পুকুরের ভাল মাছটি অতিথির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে। অতিথিসেবায় গৃহের কল্যাণ হয়, গৃহস্থের মনে ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে গৃহস্থ উঁহার সাধ্যমত অতিথিসেবা হইতে বিরত হইত না। তখনকার মানুষ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিত—যে গৃহস্থের দ্বার হইতে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়, যে গৃহে অতিথি আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আশ্রয় পায় না, সেই গৃহে বা গৃহস্থের কোনদিনই মঙ্গল হয় না,—মহাভারতের এই নীতিবাক্যটি তখনকার দিনে কেবলমাত্র যে কথাচ্ছলে বলা হইত তাহা নহে, উহার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের বিশেষ ধর্ম বা আদর্শ **সেবাব্রতের** কথাটিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সকল ধর্মগ্রন্থের উপদেশ "অতিথিদেবো ভবঃ", অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিও।



আতিথেয়তা গৃহস্থের পরম ধর্ম

**অতিথিসেবা সমাজসেবারই নামান্তর**—সেবাধর্মের মধ্যে দয়া, দাক্ষিণ্য, দান ইত্যাদি সমস্তই নিহিত রহিয়াছে। দানের অর্থ কেবল অর্থদান নহে—নিজেকে দান করা—নিজের মন, নিজের দেহ, কায়িক শ্রম ইত্যাদি মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা।

লক্ষ্য করিলে দেখিবে—যে গৃহে সদাসর্বদা অতিথিসেবা লাগিয়া রহিয়াছে, সে গৃহের ছোট-বড় সকলেরই মন অতিথিসেবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অতিথিসেবার মধ্য দিয়া



সকলেরই মন অতিথিসেবার জন্য উন্মুখ

মানুষের মন আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরের দিকে প্রসারিত হয়—অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শেখে। অতিথিসেবার মধ্য দিয়া মানুষ 'মন দিবার শিক্ষা' গ্রহণ করে; বস্তুতঃ 'দিবার শিক্ষাই' আসল শিক্ষা, কেবল হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা, শিক্ষাই নহে।

আজকাল সংসারের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক কারণেই যে অতিথি-পরিচর্যা বা আতিথেয়তা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে। আজকাল মানুষের মনও

অনেকখানি সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই অনেকে অতিথিবিমুখ। তবে অবশ্য একথাও ঠিক যে, দান করার ক্ষমতার অভাবে আশ্রয়-দান করা আজকাল অনেকের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু তবু প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দিয়া —যার যতখানি ক্ষমতা ও সাধ্য সেই অনুযায়ী অতিথির সেবা ও সংকার করিতে পারে। নিতান্ত কিছুই সম্ভব না হইলে মিষ্টি কথা ও সু-ব্যবহার দিয়া, দুইটি সান্তনার কথা বলিয়া অতিথিকে বিদায় করা যায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় আজকাল তাহাও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। সংসার-খরচের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় অতিথি অভ্যাগতদের সেবা ও পরিচর্যার জন্য যদি সামান্য কিছু অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আর অসময়ে অতিথি আসিলে গৃহকর্ত্রীকে বিব্রত বা বিপদগ্রস্ত বোধ করিতে হয় না।



মানুষের মনও সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে

***অতিথি সেবায় গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য***—আমাদের গৃহ হইতে অতিথি-অভ্যাগত চলিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা অনেক সময় উহাদের সমালোচনা করিয়া থাকি—কাহার কি দোষ ছিল, কাহার কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না অতিথিসেবক হিসাবে আমাদেরই বা কি কি কর্তব্য বা করণীয় ছিল। অতিথির গুণাগুণ বিচার করা হয়ত সহজ, কিন্তু অতিথিসেবকের কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। অতিথিসেবার প্রথম ও প্রধান নিয়ম হইল সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া গৃহে **অতিথিকে গ্রহণ করা**। তাহা হইলেই জানিবে, তোমার

অতিথিসেবা প্রায় সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তুমি কি ভাবে অতিথিকে গ্রহণ কর—তাহার উপরেই নির্ভর করে তোমার আতিথেয়তার সার্থকতা। অতিথিসেবার প্রত্যেক ধাপেই অতিথির সুবিধা, অসুবিধা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়গুলি চিন্তা করিবে।



গৃহে অতিথিকে গ্রহণ করার পদ্ধতি

অতিথি বলিতে আমরা সাধারণতঃ গৃহে আগন্তুক, অভ্যাগতজনদেরই বুঝিয়া থাকি। যে অভ্যাগতজনদের তোমার গৃহে স্থিতি নাই, অর্থাৎ স্থায়িভাবে বসবাস করিবার কথা নাই, তাঁহারাই অতিথি। এইভাবে দেখিতে গেলে আমরা অতিথিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ফেলিতে পারি—

(১) যাঁহারা তোমার গৃহে **দিন কয়েকের অতিথি** হইয়াছেন।

(২) যাঁহারা তোমার দ্বারা **আমন্ত্রিত** হইয়া তোমার গৃহে আহার গ্রহণের জন্য আসিয়াছেন।

(৩) যাঁহারা **অনাহূত,** অর্থাৎ বিনা আহ্বানে অকস্মাৎ তোমার দ্বারে আসিয়া আহার বা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

—ইহারা প্রত্যেকেই অতিথি। তুমি যদি গৃহকর্ত্রী বা গৃহস্বামী হও, ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই তোমার যথাযথ কর্তব্য রহিয়াছে।



অতিথির রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহ-সজ্জা

**দিন কয়েকের অতিথি—** তোমার গৃহে যদি অতিথি রাত্রি-যাপন করিতে ইচ্ছুক হন ও দিন কয়েক বসবাস করেন—তাহা হইলে তুমি প্রথমেই তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানিকে তাঁহার প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী গুছাইয়া রাখিবে। তাঁহার স্নান, খাওয়া, পড়াশুনা ও অন্যান্য

কাজগুলির যথাযথ ব্যবস্থা যথাসময়ে তাঁহার অগোচরেই করিয়া রাখিবে। অগোচরে করিবার কারণ এই—অতিথির কাজগুলি লইয়া তুমি যদি তাঁহার সামনেই অস্থির হইয়া উঠ, তাহা হইলে অতিথির বিব্রত বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র আহার গ্রহণের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে অতিথির ফল-মূল ইত্যাদি কিছু খাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। সুতরাং অর্থানুকূল্য থাকিলে তুমি সর্বদাই ফল-মূল ইত্যাদি কিছু-না-কিছু খাদ্যদ্রব্য অতিথির ঘরে রাখিয়া দিবে।



কিছু ক্রয় করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন

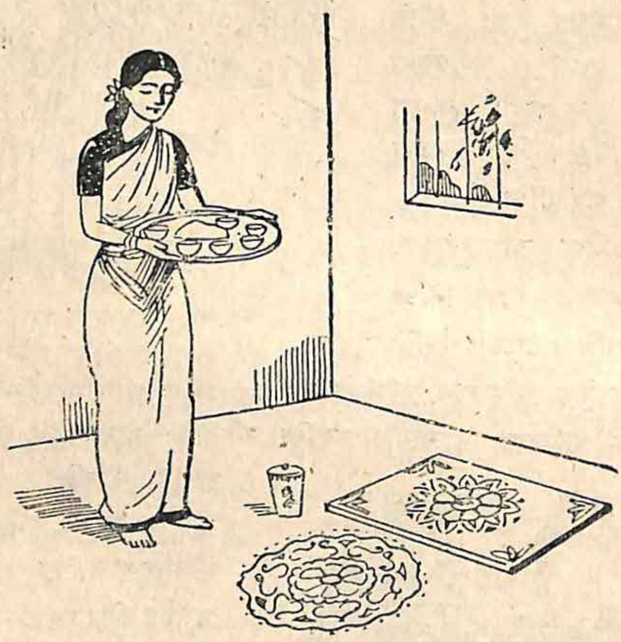
গৃহকর্ত্রীর খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি গৃহের বিভিন্ন কর্মধারাগুলি ও উহাদের নির্দিষ্ট সময়ের সহিত অতিথিকে পরিচিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ঐগুলি সঠিক জানা না থাকিলে, 'গৃহস্বামীর অসুবিধা করিলাম'—মনে করিয়া, অতিথিকে সর্বদাই সংকুচিত ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। অনেক সময় অতিথিকে তাঁহার শয্যাখানি দেখাইয়া দিয়া গৃহস্থকে বলিতে শোনা যায়—'আপনি যখন ইচ্ছা শয্যাত্যাগ করিবেন। ইহা শুনিতে আরামজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু উহাতে অতিথি নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি গৃহকর্ত্রী হও, তোমার উচিত হইবে, যতদূর সম্ভব অতিথির মনকে এই অস্বচ্ছ ধারণা ও অহেতুক চিন্তা বা ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া, উহার জন্য নিশ্চিন্ত নিদ্রার ব্যবস্থা করা।



মন দিয়াই মনকে মুগ্ধ করিতে হয়

লক্ষ্য করিয়া থাকিবে নিশ্চয়ই, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের গৃহে দিন কয়েকের

জন্য যদি কোনও অতিথি আশ্রয় গ্রহণ করেন, তোমাদের জন্য কিছু ক্রয় করিতে বা তোমাদের কোনও-না-কোনও কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিতে তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তোমাদের সুন্দর ব্যবহারে তাঁহার মন এতই অভিভূত হইয়াছে যে, তিনিও নিজেকে তোমাদের কাজে লাগাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই আদর্শ গৃহকর্ত্রী অথবা অতিথিসেবক হিসাবে তাঁহাকে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করা তোমাদের উচিত হইবে না।



মনের ঐশ্বর্য প্রদর্শন

যথার্থ গৃহকর্ত্রী ও অতিথিসেবক হইতে যদি চাও, তাহা হইলে অতিথির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি যাবতীয় আচরণ যাহাতে সহজ, স্বাভাবিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তোমার কাজে বা আচরণে কোথাও যদি সামান্য আতিশয্য বা অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তোমার অতিথি অশ্বস্তি বোধ করিবেন। **তোমাদের জীবনযাত্রায় যে আড়ম্বর বা বাহুল্য নাই, কেবলমাত্র অতিথি আসিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সামনে অনর্থক সেরূপ আয়োজন করিতে গিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইবে না**—আড়ম্বর দেখাইয়া কখনও অতিথিকে সন্তুষ্ট করা যায় না। **মন দিয়াই মনকে মুগ্ধ করিতে হয়।** সুতরাং তোমার

সংসারে যদি কোথাও দীনতার ছাপ থাকে, তুমি সেই দীনবেশেই অতিথিকে তোমার মনের ঐশ্বর্য দেখাইয়া দাও। বস্তুতঃ অতিথিসেবায় যে যথেষ্ট অর্থ, প্রচুর বিলাস-সামগ্রী ও অনেক কায়দা-কানুনের প্রয়োজন হয়, তাহা নহে। যথাযথ অতিথি-সেবায় **চরিত্র মাধুর্য ও অন্তরের সৌন্দর্যই** একমাত্র প্রয়োজন।

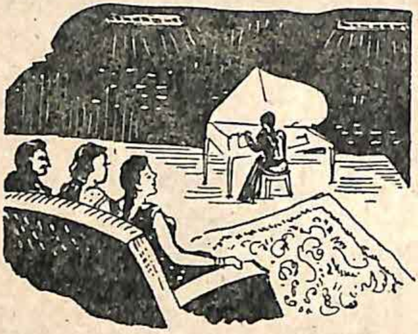
**আহারে নিমন্ত্রিত অতিথি**—উল্লিখিত নীতিগুলি সকল রকম অতিথির পক্ষেই প্রযোজ্য। তোমার দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া যদি এক বা ততোধিক অতিথি তোমার গৃহে উপস্থিত হন, তাঁহাদের নিকটও তোমার আড়ম্বর প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার সাধ্য অনুসারে—তোমার যে ক্ষমতা আছে



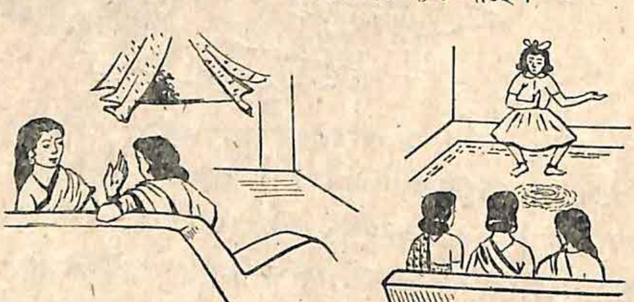
বিশদভাবে জানাইয়া দিবে

উহার মধ্যেই অভ্যাগতদের জন্য আহার্য প্রস্তুত কর। আহার্য নির্বাচন করিবার সময় সেই খাদ্যদ্রব্যগুলিই বিশেষভাবে নির্বাচিত করিবে যাহা সাধারণতঃ সকলেই পছন্দ করে, যে-আহার্য পছন্দ করিতে বিশেষ কোনও রুচির প্রয়োজন হয় না। তবে এই ক্ষেত্রেও, অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য আগত আমন্ত্রিত অতিথিদের বেলায়ও তোমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের সহিত পরিচয় না থাকার দরুণ, কিংবা কি উপলক্ষে আমন্ত্রণ উহা জানা না থাকায়, অথবা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে না পারার দরুণ, কেহ কোথাও কোন রকম অসুবিধা বা বিব্রত বোধ

করিতেছেন কিনা। অতিথির শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তোমাকে সর্বদাই সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিমন্ত্রণ পাঠাইবার সময়েই অনুষ্ঠানের প্রকৃতি, নির্ধারিত সময় ইত্যাদি বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব বিশদভাবে জানাইয়া দিবে। অতিথি গৃহে পদার্পণ করিলেই তাহাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া উপস্থিত অন্যান্যদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে। আহারের জায়গায় অনেক রকম আলোচনা ইত্যাদি হইয়া থাকে। লক্ষ্য রাখিবে, সকলেই সেই আলোচনায় যোগদান করিতে পারিতেছেন কিনা, নতুবা কৌশলে আলোচনার বিষয়টির মোড় ফিরাইয়া দিবে। কিংবা যদি দেখ, এমন আলোচনার অবতারণা করা হইতেছে—যাহা অন্যের বিরক্তির কারণ হইবে বা অন্যকে অসুখী করিয়া তুলিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কৌশলে সে আলোচনা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। আহারের সময়কার আলোচনায় যাহাতে তর্ক-বিতর্ক বা রাগারাগির সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঐ সময়কার আলোচনাকে হালকা ও মনোরম করিয়া তোলার দায়িত্ব তাঁহারই, যাঁহার উপরে আতিথ্যেরর ভার ন্যস্ত আছে।



কিছু আনন্দের আয়োজন



অতিথির উপস্থিতিতে পরস্পর আনন্দের আদান-প্রদান

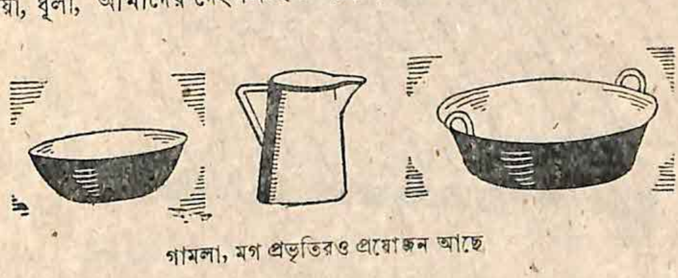
আহারের নিমন্ত্রণে গৃহে অতিথি আসিলে মনে করিও না যে, উহারা কেবল আহার করিতেই আসিয়াছেন। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, মেলা-মেশা ইত্যাদির প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দের আদান-প্রদান, একটানা একসুরে চলা দৈনন্দিন জীবনে

কিছুটা বৈচিত্র লইয়া আসা। কাজেই তোমরা যদি গৃহকর্ত্রী হও এবং তোমাদের গৃহে তোমরা যদি অতিথিসেবার ভার লইয়া থাক, তাহা হইলে আহারের পর অতিথিদের জন্য কিছু আনন্দের আয়োজন করাও তোমাদের কর্তব্য। হাসি, গান ও গল্পের মধ্যে দিয়া অন্ততঃ সেদিনকার সন্ধ্যায় অতিথিদের মনকে প্রফুল্ল করিয়া তোলা তোমাদেরই কাজ।

**অনাহূত অতিথি**—গৃহস্থের নিকট অনাহূত অতিথির দাবীই সর্বাপেক্ষা অধিক। আশ্রয় নাই বলিয়াই তিনি আজ তোমার দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী, আহার্যের অভাব বলিয়াই তিনি তোমার দুয়ারে দুইমুষ্টি অন্ন যাচ্ঞা করিতেছেন। এই অতিথিকে তুমি ফিরাইবে কি বলিয়া? বস্তুতঃ এই অতিথির প্রতিই তোমার কর্তব্য সর্বাপেক্ষা বড়। মানুষের দাবি লইয়া, মানুষের মনুষ্যত্বের কথা ভাবিয়া তিনি মানুষের কাছে আসিয়াছেন। সুতরাং মানুষ হিসাবে তোমার সর্বপ্রথম কর্তব্য সমাজের অপর একটি মানুষকে গ্রহণ করা। তোমার আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি উহার শ্রম দূর করিতে পার। তোমার আহার্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি উহাকে পানীয় প্রদান করিতে পার। আগেকার দিনে কিছু না থাকিলেও গৃহস্থ এক ঘটি জল ও দুইটি বাতাসা দিয়া অতিথিকে আপ্যায়িত করিতেন। তোমাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে পূর্বেকার সেই মধুর দিনগুলি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে।

## কাপড় কাচার সাজ-সরঞ্জাম

কাপড়-চোপড় কাচা গৃহের একটি প্রাত্যহিক কাজ। শহরের তৈলাক্ত ধোঁয়া, ধুলা, আমাদের দেহ-নিঃসৃত ঘাম ইত্যাদি নানা দূষিত পদার্থে আমাদের

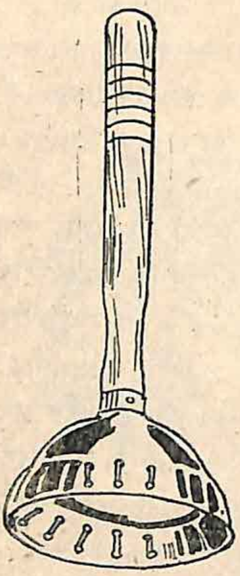


গামলা, মগ প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে

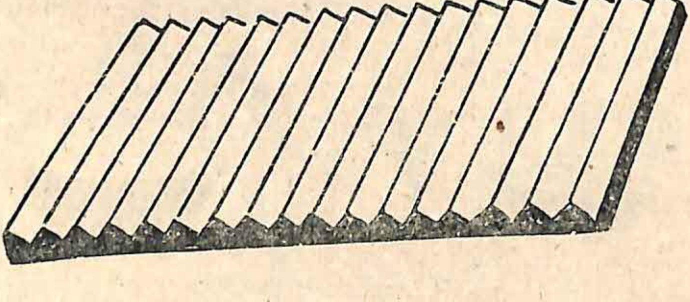
পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় সর্বদা ময়লা হইতেছে। সূতার জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড়, বালিশের ওয়াড় ও অন্যান্য

শয্যাদ্রব্যাদি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, কাপড়-চোপড় কাচিতে হইলে উহার জন্য কি কি সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয়।

আজকাল প্রায় প্রতি গৃহেই কাপড় কাচিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ঠিক ঠিক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা না করিয়া যাঁহারা কাপড় কাচেন, তাঁহাদের অত্যধিক পরিশ্রম হয় এবং কাপড়ও যথাযথভাবে কাচা হয় না। কাপড় কাচিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় **টব** বা **গামলার**। বালতি, মগ প্রভৃতির প্রয়োজন তো আছেই। অনেক জায়গাতে যদিও কাঠের টবের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু উহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া অনেকেই আজকাল এনামেল-করা অথবা দস্তার লেপ দেওয়া পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। তোমরা হয়ত জান না, অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিয়া দস্তা গলিয়া যায়। সুতরাং দস্তার পাত্রে কখনও কোনরূপ অ্যাসিড ইত্যাদি ঢালিবে না। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রও কাপড়-কাচার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। কারণ অত্যধিক গরমে বা সোডার জলে উহাও নষ্ট হইতে পারে। তোমরা কাপড়-কাচার জন্য **পিতল** বা **তামার পাত্র** ব্যবহার করিতে পারে, যদিও উহার মূল্য কিছু অধিক।



ভ্যাকুয়াম কোণ



সমকুঞ্চিত তক্তা

গরম সাবান বা সোডার জলের মধ্যে যাহাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত ডুবাইয়া রাখিতে না হয়, সেইজন্য অনেক বাড়ীতে তামার বা কাঠের বড় লাঠি

ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ধোপাখানা ইত্যাদি অনেক বড় বড় কাপড়-কাচার জায়গাগুলিতে আবার অনেক সময় একরকম **বায়ুশূন্য চোঙের** ব্যবহার দেখা যায়, ইহাকে ভ্যাকুয়াম কোণ ( Vacuum cone ) বলা হয়। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিখানিতে দেখ, এই যন্ত্রের নীচের দিকে পেয়ালার মত অংশটিতে যে কতকগুলি গোঁজের মত দেখিতেছ, উহাতে কাপড় একবার টানিয়া লয় ও পরে আবার ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে টানা ও ছাড়ার দরুণ ময়লা কাপড়খানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাবানজল প্রবেশ করে এবং ইহাতে কাপড়খানির ময়লা ছাড়ানোও সহজ হয়।

তোমরা পড়িয়াছে, সাবান-জল সহ কাপড়খানি থুপিয়া থুপিয়া কাচিতে হয়। এইভাবে কাপড় কাচিবার জন্য ছবিতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, সেইরূপ কয়েকখানি **সমকুঞ্চিত** ( corrugated ) **কাঠের তক্তার** প্রয়োজন।

কাপড় কেবল ধুইলেই চলিবে না। গৃহস্থের বাড়ীতে কাপড় শুকাইবারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। **মসৃণ দড়ি** অথবা র‍্যাকের ব্যবস্থা থাকিলে উহাতেও কাপড় শুকানো যায়। সেই সঙ্গে অবশ্য কাপড় আটকাইয়া দিবার জন্য কিছু



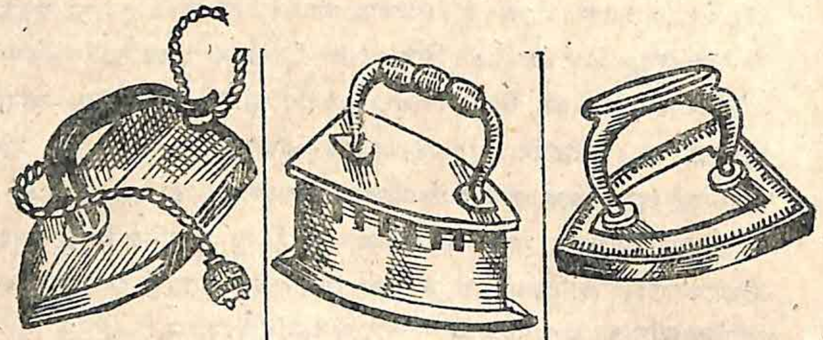
মসৃণ দড়ি ও কাঠের ক্লিপ

কিছু **ক্লিপের** প্রয়োজন। যদি ঘাসে ঢাকা জমি থাকে তাহা হইলে উহার উপর কাপড় মেলিয়া দেওয়া যায়। বস্তুতঃ উহাই কাপড় শুকাইবার উৎকৃষ্ট উপায়।

**ইস্ত্রি**—আজকাল প্রত্যেক গৃহেই **ইস্ত্রির** প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। ইস্ত্রির সাহায্যে সকল রকম জামা-কাপড় গৃহেই সুবিন্যস্ত করা যায়। ইস্ত্রি প্রধানতঃ তিন রকমের।

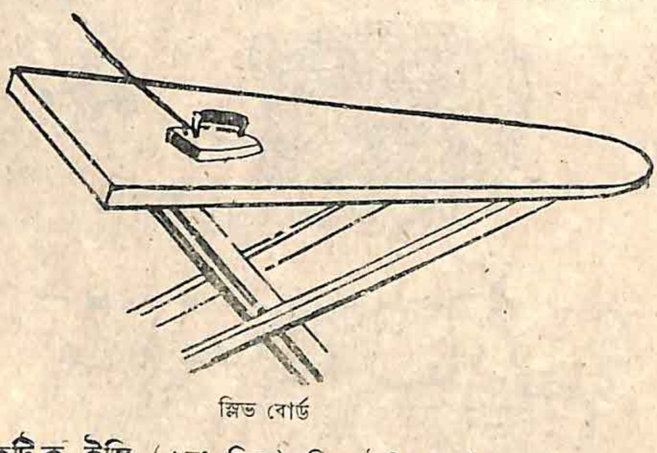
অনেক জায়গায় দেখিবে মোটা চওড়া একখানি ভারী **লোহার পাত**

( ৩নং চিত্র ) উনানের আঁচে গরম করিয়া ইস্ত্রি করা হইতেছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ধোপারা **কয়লার ইস্ত্রিই** ( ২নং চিত্র ) ব্যবহার করিয়া থাকে।



১ ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ২ কয়লার ইস্ত্রি ৩ লোহার পাত

এই ইস্ত্রিগুলি বাক্সের মতন হওয়াতে উহার মধ্যে জ্বলন্ত কয়লা ভরিয়া দিয়া উহাকে গরম করা হয় এবং ঐ ভাবে কাপড় ইস্ত্রি হইয়া থাকে।



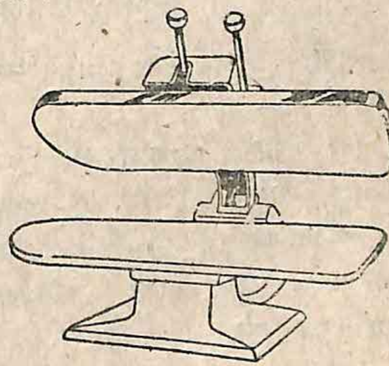
স্লিভ বোর্ড

**ইলেকট্রিক ইস্ত্রি** ( ১নং চিত্র ) দিয়া ইস্ত্রি করাই সর্বাপেক্ষা সহজ, এই কারণেই ইলেকট্রিক ইস্ত্রির চল সর্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা শহরে প্রায় প্রতিঘরেই আজকাল ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দেখিতে পাইবে।

ইস্ত্রি করিবার জন্য একখানি **টেবিল,** একটি **পুরু কম্বল** ও উহার উপর পাতিবার জন্য একখানি সাদা ভারী **চাদর** প্রয়োজন। টেবিলখানির **উচ্চতা** যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী হয় উহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পাশে আরও একখানি ছোট টেবিল থাকিলে উহার উপর ইস্ত্রি-করা কাপড়গুলি কিছুক্ষণ

রাখিয়া দিয়া পরে উঠাইয়া রাখা যায়। টেবিলে, চওড়া কাপড়গুলিই সাধারণতঃ ইস্ত্রি হয়। কিন্তু জামার হাতা ইত্যাদি টেবিলে ইস্ত্রি করা কঠিন। উহার জন্য বিশেষ বোর্ডের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া প্রয়োজন—ঐগুলিকে **স্লিভ** বোর্ড (Sleeve Boad) বলা হয়। বিছানার চাদর প্রভৃতি বড় ও মোটা জিনিসগুলি ইস্ত্রি করার তেমন প্রয়োজন হয় না। ঐ কাপড়গুলি ভাঁজ করিয়া একটা ভারী কিছু দিয়া চাপিয়া দিলেই উহা ইস্ত্রি করা কাপড়ের মতনই হইবে। চাপ দিবার এইরূপ একটি যন্ত্রের ছবি নীচে দেওয়া গেল। ইহার নাম **ম্যাঙ্গলার** (mangler)। এই যন্ত্রটির সহিত ইলেকট্রিক তার সংযুক্ত আছে, এই কারণেই স্যুইচ টিপিয়া দিলেই ইহার উপরের ধাতুনির্মিত ঢাকনিটি সহজে গরম হইয়া যায়। নীচের অংশটি ধাতুনির্মিত ও উহাতে প্যাড আঁটা আছে। চাপ দিবার সময় অংশ দুইটি পরস্পর লাগিয়া যায়।

**যন্ত্রপাতির যত্ন**- তোমাদের দেহযন্ত্রটিকে চালু ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে যেমন উহার যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যা আবশ্যক, তেমনি যে কোন কাজের যে-কোনও যন্ত্রপাতিই হউক না কেন, প্রয়োজনমত কাজ পাইতে হইলে উহাদের যত্ন ও পরিচর্যাও অবশ্য কর্তব্য।



ম্যাঙ্গলার

কাপড় কাচিবার পর প্রত্যেকটি বালতি ও মগ, প্রত্যেকটি কাঠের টব ধুইয়া উপুড় করিয়া রাখিবে যাহাতে জল ঝরিয়া যায়। কাঠের টব যদি জলসুদ্ধ রাখিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে কাঠ পচিয়া যাইবে। লেপ-দেওয়া গামলাগুলি কাপড় কাচিবার পর মুছিয়া শুকাইয়া রাখিবে। কারণ ঐ পাত্র যদি জলসুদ্ধ ভিজা অবস্থাতেই রাখিয়া দাও, তাহা হইলে জায়গায় জায়গায় লেপ উঠিয়া যাইতে পারে।

তোমাদের গৃহে যদি **বায়ুশূন্য** চোঙ থাকে, তাহা হইলে কাপড় কাচিবার পরে যন্ত্রটি সাবানজলে ধুইয়া উহা উত্তমরূপে মুছিয়া তুলিয়া রাখিবে। চোঙের মধ্যে জল থাকিয়া গেলে সহজেই উহাতে মরিচা পড়িতে পারে এবং তাহা হইলে পরে আর উহা প্রয়োজনমত কাজ করিবে না। কাপড় কাচিবার তক্তাগুলিও জল হইতে তুলিয়া মুছিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া সোজা করিয়া রাখিবে, যাহাতে

জল শুকাইয়া যায়। কাপড় শুকাইতে দিবার দড়ি বা র‍্যাকগুলির যদি প্রত্যহ ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে উহাতে বাহিরের ধূলা-বালি ইত্যাদি জড় হইতে পারে এবং পরে কাপড় শুকাইতে দিলে উহাতে দাগ ধরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রত্যহ প্রয়োজন না থাকিলে দড়িগুলি তুলিয়া রাখিবে এবং কাপড় শুকাইতে দিবার র‍্যাকটিকেও উঠাইয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া রাখিবে।

ইস্ত্রিগুলিকেও সর্বদাই পরিষ্কার করিয়া রাখিবে, যাহাতে ইস্ত্রির গায়ে কোনও প্রকার মরিচা ইত্যাদি না পড়ে। ইস্ত্রি করিতে হইলে ইস্ত্রির মসৃণতার দিকেই সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইস্ত্রি হইয়া গেলে ইস্ত্রির টেবিল হইতে কম্বল ও চাদরখানি তুলিয়া ভাজ করিয়া রাখিয়া দিবে; সর্বদা পাতা থাকিলে উহাতে বাহিরের ধূলা-বালি ইত্যাদি পড়িয়া দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া যাইবে। জামার হাতা ইত্যাদি ইস্ত্রি করার যে বিশেষ বোর্ডগুলি আছে, ইস্ত্রির পরে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া ওয়াড় পড়াইয়া রাখিবে। কারণ ঐ প্যাডগুলি যদি একবার ময়লা হইয়া যায়, পরে আবার উহা পরিষ্কার করা কঠিন হইবে।

## কাপড় কাচিবার জল

কাপড় কাচিবার প্রথম ও প্রধান উপকরণ জল। এই জল দুই রকমের হইয়া থাকে:—

(১) **কঠিন** বা **খর জল** ( Hard water )।

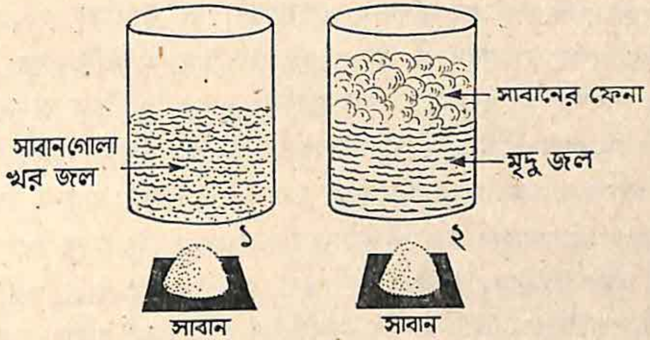
(২) **নরম** বা **মৃদু জল** ( Soft water )।

**কঠিন জল**—যে জলে গলিত ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে তাহাকে 'কঠিন জল' বলা হয়। কঠিন বা খর জল দুই প্রকার—যথা **অস্থায়ী খর** বা **স্থায়ী খর**।

কঠিন বলার অর্থ এই যে, উহাতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, ফলে কাপড় কাচা প্রভৃতি কষ্টকর হইয়া উঠে এবং অধিক পরিমাণে সাবানের প্রয়োজন হয়। এই জলে সাবান গায়ে মাখিলে গায়ের ময়লা কাটা দূরের কথা, বরঞ্চ গায়ে ময়লার একটি পর্দা পড়িয়া যায়। অতিরিক্ত মাটি ও গলিত ধাতব-পদার্থের সংমিশ্রণে ইহা বিস্বাদ হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

**নরম জল**—অপরপক্ষে নরম জলে গলিত ধাতব-পদার্থ কম থাকে, এই কারণে কঠিন জলের দোষগুলি নরম জলে দেখা যায় না। নরম জল **সুস্বাদু**

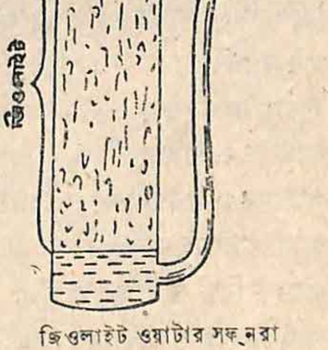
এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। নরম জলে কার্বন ডায়ক্সাইড ও আরও নানাবিধ অম্ল বর্তমান থাকে। এই কারণে নরম জল, বিশেষতঃ পানীয় জল,




১—সাবানগোলা খর জল. ২—সাবানগোলা মৃদু জল

তামা, সীসা বা দস্তার পাত্রে রাখা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ঐ জল আংশিকভাবে এই সকল পাত্রের ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে পারে।

**কঠিন জলকে নরম করিবার উপায়**—কঠিন জল ফুটাইলে উহার কঠিনতা কিছু পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। কঠিন জল ফুটাইবার পরে কেট্‌লির ঢাকনির গায়ে বা কেট্‌লির চারিদিকে অনেক সময় একটি শুষ্ক সাদা কঠিন বস্তুর পর্দা পড়িতে দেখা যায়। এই সাদা পদার্থটি কি? তোমরা জান, বৃষ্টির জল বায়ু হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস গ্রহণ করে। মাটির মধ্য দিয়া যাইবার কালে কার্বনিক অ্যাসিড-গ্যাস-মিশ্রিত জল মাটির মধ্যে যে 'ক্যালসিয়াম কার্বনেট (কার্বনেট অব্ লাইম) বা ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট থাকে উহাকে দ্রবীভূত করে। সুতরাং কেট্‌লির জল যখন ফুটিতে থাকে, কেটলির জলের কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস উড়িয়া যায় এবং এই গ্যাসের অভাবে জলেরও মাটি হইতে আহৃত ক্যালসিয়াম




জিওলাইট ওয়াটার সফ্‌নরা

বা ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেটকে দ্রবীভূত করিয়া ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাটি চলিয়া যায় ও ইহার ফলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট (খড়ি) কেটলির

তলায় বা গায়ে লাগিয়া থাকে। সুতরাং কেট্‌লির গায়ের শ্বেত পদার্থ আর কিছুই নহে—জলের পরিত্যক্ত ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট।

কাজেই দেখিতেছ, **ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট** হইতে সৃষ্ট জলের যে কাঠিন্য উহা **অস্থায়ী**, কারণ জল ফুটাইলে ঐ কাঠিন্য দূর হয়। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, জল ফুটাইলে এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট নীচে পড়িয়া থাকিলেও জলের কাঠিন্য দূর হয় না। ইহার কারণ, অনেক সময় জলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগ্নেসিয়াম ব্যতীত আরও ধাতব লবণ থাকে, যাহার প্রভাব এইভাবে কেবলমাত্র ফুটাইয়াই দূর করা সম্ভব নহে। এই কাঠিন্যকে **স্থায়ী** কাঠিন্য বলা হয়। জলের স্থায়ী কাঠিন্যের উৎপত্তি সাধারণতঃ **ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট** হইতে। জলের সহিত যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাপড়-কাচা সোডা মিসাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্থায়ী কাঠিন্য দূরীভূত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত জিওলাইট ওয়াটার সফনার ( Geolite Water Softener ) নামক যন্ত্রের সাহায্যেও স্থায়ী কঠিন-জলকে নরম করা যাইতে পারে। **জিওলাইট** কতকগুলি খনিজ পদার্থের সমবায়। উক্ত যন্ত্রের মধ্যে এই জিওলাইট পদার্থ থাকে এবং কঠিন-জলকে উহার মধ্য দিয়াই চালিত করা হয়। জিওলাইট কঠিন-জলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম টানিয়া লইয়া উহার শূন্য স্থান সোডিয়াম সল্ট দ্বারা পূরণ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সোডার সংমিশ্রণে জলের স্থায়ী-কাঠিন্য কতক পরিমাণে দূর হয়।

***সিল্ক বা রেশম ধুইবার প্রণালী***—রেশম 'গুটিপোকা' অথবা 'রেশমকীট' নামক একপ্রকার কীটের দেহ নিঃসৃত রস হইতে প্রস্তুত একরকম সূক্ষ্ম তন্তু-বিশেষ। ইহা সভাবতঃ মসৃণ ও উজ্জ্বল। কাজেই অত্যধিক উত্তাপে ইহার ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতা নষ্ট হইয়া যায়। অত্যধিক রগড়ানো বা ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগও রেশমবস্ত্রে নিষিদ্ধ। রেশমবস্ত্র ধুইতে হইলে বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন। রেশমী কাপড় কাচিতে অল্প-গরম জলই প্রশস্ত। সূতী ও লিনেন কাপড়-চোপড়ে ময়লা যেমন গভীরভাবে বসিয়া যায় রেশম-বস্ত্রে ময়লা সেইরূপ ভাবে বসিয়া যাইতে পারে না। কাজেই উহা বেশীক্ষণ সাবানগোলা গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। রেশমবস্ত্র ধুইতে হইলে সমস্ত জলটুকুই ঈষদুষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিছুটা ঈষদুষ্ণ জল লইয়া উহার সহিত লাক্স সাবানের কুচি ( Lux flakes ), নতুবা কোনও উৎকৃষ্ট কাপড়-

কাচা সাবানের গুঁড়া মিশাইয়া লও। পূর্বেই বলিয়াছি, রেশম-বস্ত্র রগড়াইতে নাই। ঐ জলের মধ্যে রেশমী কাপড়খানি ডুবাইয়া উহা কচলাইয়া পরে সামান্য জলের ছিটা দিয়া কাঠের উপর থুপিয়া থুপিয়া কাচিবে, যাহাতে উহার আঁশগুলির উপর অত্যধিক জোর না পড়ে কিংবা আঁশগুলি সরিয়া না যায়। রেশমের আঁশগুলি কুঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে, এই কারণে রেশমী কাপড় জোরে মোচড় দিয়া নিংড়ানো নিষিদ্ধ। তলায় দুই হাত দিয়া রেশম-বস্ত্রখানি সাবান-জল হইতে উঠাইয়া লইবে। অতঃপর পরিষ্কার জল দিয়া রেশমের কাপড়খানি বার বার ধুইয়া লও; যেন সাবানের জল একটুও না থাকে। শেষবারে ধুইবার সময় রেশমের কাপড়টি ঠাণ্ডা জলেও ডুবাইতে পার, কারণ তাপের সামান্য তারতম্য রেশমবস্ত্রের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না। ধুইবার পর হাতে চাপিয়াই রেশমবস্ত্র হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া দাও।

রেশমের কাপড়ে সাধারণতঃ কলপের প্রয়োজন হয় না। তবে অত্যন্ত পাতলা সিল্ক ইত্যাদিতে যদি নিতান্তই কলপ দিতে হয়, তাহা হইলে গঁদের কলপ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এক লিটার জলে (প্রায় ২ পাইণ্ট) ১০০ গ্রাম গঁদের প্রয়োজন। এই হিসাবেই গঁদ ব্যবহার করিবে। গঁদের টুকরাগুলি ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জলটি ছাঁকিয়া লইবে ও বোতলে ভরিয়া রাখিয়া দিবে। বোতলে ভরিবার সময় উহাতে কয়েক ফোঁটা ফরম্যালিন মিশাইয়া দিতে পার, তাহাতে চিতি-পড়া বন্ধ হইবে। তোমার কাপড়কে তুমি যেরূপ কঠিন করিতে চাও, সেই অনুযায়ী জলের সহিত বড় চামচের এক চামচ বা দুই চামচ গঁদের জল মিশাইয়া উহার মধ্যে কাপড়খানি ডুবাইয়া লইবে।



ক্ষিপ্রহস্তে ইস্ত্রি চালাইয়া যাও

অত্যন্ত ভারী ও পুরু রেশম না হইলে উহা কখনও ঝুলাইয়া শুকাইতে দিবে না। পাতলা রেশমের কাপড় শুকাইতে হইলে উহা একটি বড় তোয়ালের উপর পাতিয়া একটি রোলারে জড়াইয়া লও, তোয়ালেখানি তোমার কাপড় হইতে জল শুষিয়া লইবে। রেশমবস্ত্র ইস্ত্রি করিবার সময় উহাতে কখনও জলের ছিটা দিবে না, কারণ

দাগ পড়িয়া যাইবে। অল্প গরম ইস্ত্রির উপরে যথেষ্ট চাপ দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ইস্ত্রি চালাইয়া যাও। তোমার রেশমের কাপড়খানি যদি রঙিন হয় ও উহার এক পিঠ সোজা ও অন্য পিঠ উল্টা থাকে তাহা হইলে ইস্ত্রি করিবার সময় উল্টা পিঠেই করিবে। ক্রেপ প্রভৃতি কৃত্রিম সিল্কের সাড়ী বা জামা ইত্যাদি ধুইবার সময় যদিও একই প্রণালী প্রয়োগ করিবে, কিন্তু উহাতে অধিকতর সাবধানতা প্রয়োজন, কারণ উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। **অত্যধিক গরম জল, অত্যধিক তাপ, ধুইবার সময় রগড়ানো, নিংড়ানো ইত্যাদি কৃত্রিম রেশমের বেলায় একেবারেই বর্জন করিবে।**

***সূতী ও লিনেন ধুইবার প্রণালী***—সূতি ও লিনেন ( linen ) দুইই আসে উদ্ভিদ জগৎ হইতে। সূতি-বস্ত্রের আঁশ বা তন্তু তৈয়ারী হয় তুলাগাছের ফল হইতে, আর লিনেন তন্তু তৈয়ারী হয় তিসি বা মসিনা গাছের কাণ্ড হইতে। সূতি ও লিনেনের মধ্যে তফাৎ এই, লিনেন কাপড়ের জমিনে একটা চকচকে ভাব আছে। এই দুই রকম তন্তু কাচিবার পদ্ধতি প্রায় একই রকম। প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ যাহাতে তন্তুগুলি নরম হয়। এইবার কাপড়গুলি তুলিয়া অল্প সোডামিশ্রিত গরম সাবানের জলের গামলায় চুবাইয়া দাও এবং একটি কাঠের হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক, যাহাতে সাবান জল কাপড়ের সর্বাঙ্গে লাগে। সাদা জামা-কাপড়গুলি আগে পরিষ্কার করিয়া পরে রঙিন কাপড়গুলি ডুবাইবে ; কারণ রঙিন কাপড়ের রং উঠিলেও সাদা কাপড়গুলি নষ্ট হইবে না। কিছুক্ষণ পরে কাপড়গুলি উঠাইয়া কাঠের পাটার উপর থুপিয়া থুপিয়া কাচিয়া লও, যাহাতে সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া যায়। এইবার ঠাণ্ডা জলে খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল যেন সাবান জল একটুও না থাকে। যে সমস্ত কাপড়-জামায় কলপ দিতে হইবে, সেইগুলিকে নীল মিশ্রিত কলপে ডুবাইয়া সামান্য নিংড়াইয়া শুকাইতে দাও। রঙিন জামা-কাপড় কড়া রৌদ্রে শুকাইতে না দেওয়া উচিত, উহাতে রং জলিয়া যাইবার ভয় থাকে। শুকাইয়া যাইবার পর জামা কাপড়গুলি সুন্দর ভাবে টান করিয়া পাট করিয়া লও এবং ইস্ত্রি করিয়া ফেল।

***পশম বস্ত্র ধুইবার প্রণালী***—রেশমের ন্যায় পশমও প্রাণিজ। ভেড়ার লোম হইতেই সাধারণতঃ পশম তৈয়ারী হয় ; কিন্তু উট, ছাগল, খরগোশ প্রভৃতির লোম হইতেও বিভিন্ন জমিন তৈয়ারী হইয়া থাকে।

পশম বস্ত্রে গভীর ভাবে ময়লা বসে না, সেইজন্য বেশীক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখার প্রয়োজন নাই। প্রথমে ৬ লিটার ঈষদুষ্ণ গরম জলে ২৫ গ্রাম ভালো গুড়া সাবান দিয়া ফেনাইয়া লও। এইবার পশমের জামাটি ওই সাবান জলে দিয়া আস্তে আস্তে কচ্‌লাইতে থাক এবং সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া গেলে পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেল, যেন একটুও সাবানজল জামায় না থাকে। দুই হাত দিয়া চাপিয়া সমস্ত জল বাহির করিয়া দাও এবং ছায়ায় র‍্যাকের উপর পাতিয়া শুকাইতে দাও।

মনে রাখিও, পশম বস্ত্রে **অত্যধিক গরম জল, ক্ষার দ্রব, নিংড়ানো** ও অত্যন্ত **গরম ইস্ত্রি** ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

## রন্ধন

গৃহ-পরিকল্পনার বহুবিধ কাজের মধ্যে রন্ধনও একটি। ইহাকে একটি কলাবিদ্যা বলা যাইতে পারে।

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার প্রধান উপকরণ—উপযুক্ত খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য তৈয়ারি করিতে হইলে উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তু নির্বাচন, উহার ভাল-মন্দ-বিচার, খাদ্য-প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সকলের আগে দরকার। সুঘ্রাণযুক্ত, সহজপাচ্য, সুস্বাদু এবং সুষম ভোজ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে যথেষ্ট শিক্ষা, ধৈর্য ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

খাদ্যকে পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও সুস্বাদু করিয়া তৈয়ারি করিতে হইলে যেমন খাদ্য-উৎপাদন ও প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জানিতে হয়, তেমনি খাদ্যের বিভিন্ন বস্তু ও উহা তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাল-মসলাগুলির মাপ ও মাত্রা সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্যই খাদ্যের স্বাদ ও সুঘ্রাণ বাড়াইয়া খাদ্যকে **রুচিকর সুস্বাদু** করিয়া তোলা। তোমরা জান, খাদ্যের ঘ্রাণ ও স্বাদ প্রধানতঃ নির্ভর করে খাদ্যবস্তু ও রন্ধনের মাল-মসলাগুলির যথাযথ মাপ ও পরিমাণের উপর।

জাতিকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, মানুষের জীবনযাত্রায় খাদ্যকে প্রধান স্থান দিতে হয়। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে খাদ্য-নির্বাচন, খাদ্য-প্রস্তুতি, খাদ্য-গ্রহণ করিবার রীতি ইত্যাদি প্রত্যেকটির পিছনেই রহিয়াছে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। খাদ্যকে সুস্বাদু বা সুঘ্রাণবিশিষ্ট করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন খাদ্যের পুষ্টি, সহজ-পাচ্যতা ইত্যাদি গুণগুলি সংরক্ষণ করা। এই কারণেই পাশ্চাত্ত্য দেশে যে-কোনও খাদ্যের প্রস্তুতি-প্রণালীতে রন্ধনের বিভিন্ন উপকরণ ও মাল-মসলাদির যথাযথ পরিমাণ, মাত্রা ও অন্যান্য নির্দেশ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কোন্ বস্তু কত সময় সিদ্ধ করিতে হইবে, কোন্ বস্তুতে কি পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তৈয়ারি হইয়া গেলে উহা কিভাবে পরিবেশন করিবে ইত্যাদি বিষয়গুলিও বিশদভাবে লিখিত থাকে।

***বিভিন্ন মাপ ও ওজন***—আমাদের দেশে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতিতে ব্যবহার্য উপকরণগুলির যথাযথ মাপ ও মাত্রা নির্ধারণের যে প্রয়োজন হয় না এমন নহে। তবে সেই মাপ ও মাত্রা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরূপিত হয় মানুষের উক্ত বিষয়ে পরিণত দৃষ্টি ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রতিদিনের রন্ধনে নুন, তেল, জল, মসলা ইত্যাদি আমরা কদাচিৎ মাপিয়া দিয়া থাকি। আমরা চোখের দৃষ্টির সাহায্যে আন্দাজ করিয়া উহাদের পরিমাণ ঠিক করিয়া লই। তবে বড় বড় অনুষ্ঠানাদিতে চিনি, ময়দা, আটা ইত্যাদি দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে অনেক সময়ে মাপিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

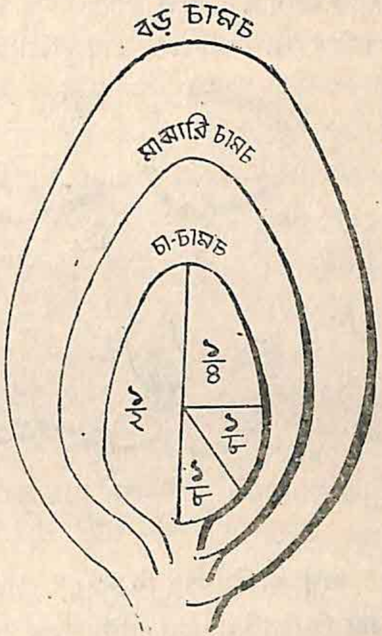
অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে আবার—বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে—দাঁড়িপাল্লার পরিবর্তে গৃহিণীরা বেতের তৈয়ারি **"কুন্‌কে'** ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা একটা মাপের ও মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। বিভিন্ন সংসারে লোক হিসাব করিয়া প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল, ডাল ইত্যাদি মাপিবার সময়ে তাঁহারা এই কুন্‌কেগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তরিতরকারীর ক্ষেত্রে 'কুনকে' ব্যবহার চলে না।

আবার তেল, ঘি প্রভৃতির বেলায় সাধারণতঃ বড় চামচ বা **পলার মাপই** প্রচলিত। প্রতিদিন একটি ছোট গৃহস্থের সংসারে রাঁধিবার জন্য গড়ে এক পোয়া (প্রায় ২৫০ গ্রাম) সরিষার তৈলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের ঘরে সেইজন্য এক পোয়া মাপের বাটিই থাকে। রন্ধন করিবার পূর্বে ঐ বাটিতে ঢালিয়া পরে বিভিন্ন ব্যঞ্জন অনুসারে পলা বা চামচ করিয়া তাঁহারা তেল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

***মাত্রা নির্ধারণ***—আজকাল শহরে বহু আধুনিক পরিবারে **চামচ,**

মাপের গেলাস, পেয়ালা ইত্যাদি দ্বারা মাপ ঠিক করা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মাপগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাক আবশ্যক। এক চামচ, দুই চামচ

৬০ ফোঁটা = ১ চা-চামচ
২ চা-চামচ = ১ মাঝারি চামচ
৩ চা-চামচ = ১ বড় চামচ




বিভিন্ন চামচের প্রকৃত আয়তন

প্রভৃতি মাপে অর্থাৎ চামচ প্রভৃতি ওজনে আসলে মোটামুটি কতখানি জিনিস হয়, নীচে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

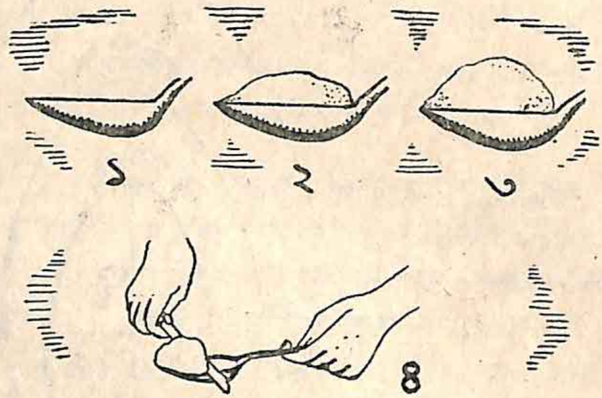
## শুষ্ক ময়দা-জাতীয় জিনিস

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সমান করিয়া মাপা বড় চামচের | (table spoon) | এক চামচ | = ১/২ | আউন্স |
| ,, ,, মাঝারি ,, | (dessert spoon) | ,, | = ১/৪ | ,, |
| ,, ,, চায়ের ,, | (tea spoon) | ,, | = ১/৬ | ,, |

১ আউন্স = প্রায় ৩০ গ্রাম

যে-কোনও শুষ্ক জিনিস চামচ দিয়া মাপিবার সময় প্রথমে জিনিসটি নাড়িয়-চাড়িয়া লইবে—কারণ ময়দা-জাতীয় জিনিস কিছুদিন একভাবে থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া যায়। চামচ দিয়া মাত্রা ঠিক করিবার সময় প্রথমেই চামচখানি দিয়া স্তূপীকৃত এক চামচ জিনিস উঠাইবে। পরে ছুরির ফলা বা ঐরকম পাতলা ও চওড়া অন্য কোনও জিনিসের সাহায্যে ঐ স্তূপীকৃত

ময়দার উদ্‌বৃত্ত উপরের অংশটি ছাঁটিয়া ফেলিবে—যে অবশিষ্ট অংশটি চামচে রহিল, উহাই তোমার **এক চামচের মাপ** (৪নং চিত্র দেখ)। আধ চামচ লইতে হইলে উপরি-উক্ত উপায়ে এক চামচ মাপিয়া পরে লম্বালম্বিভাবে চামচের মধ্যস্থিত বস্তুকে সমানভাবে ভাগ করিয়া অর্ধেক অংশ বাদ দিবে (৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)।




(১) সমান চামচ (২) পূর্ণ চামচ (৩) স্তূপীকৃত চামচ
(৪) সমান চামচ মাপিবার নিয়ম

ময়দা জাতীয় শুষ্ক জিনিসগুলি স্বল্প পরিমাণ হইলে আমরা সাধারণতঃ চামচ দিয়া মাপিয়া লইয়া থাকি—কিন্তু সম্ভব হইলে সেই সকল জিনিসও ওজন করিয়া লওয়াই শ্রেয় জানিবে। মাখন প্রভৃতি জমানো চর্বিজাতীয় জিনিসগুলি চামচ দিয়া মাপা অপেক্ষা ওজন করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। যে সকল ক্ষেত্রে মাপিয়া লওয়া সম্ভব হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে মোটামুটি নীচের হিসাবে মাপ নির্ধারণ করিতে পারা যায়—

২ পেয়ালা = ১ পাউণ্ড = ৩২ বড় চামচ = প্রায় ৪৫০ গ্রাম
½ „ = ¼ „ = ৮ বড় চামচ = প্রায় ১১২ গ্রাম

এই সঙ্গে ইহা জানিয়া রাখিবে— বড় চামচের (table spoon) আট চামচ জিনিসে একটি পেয়ালার অর্ধেকটা পূর্ণ হয়। তরল পদার্থ ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করিতে অনেক সময়—বিশেষ করিয়া পশ্চিমের দেশগুলিতে, **পাইণ্ট** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। **এক পাইণ্ট ২০ আউন্সের সমান** বা **আধ লিটারের** সামান্য বেশী জানিয়া রাখিবে।

***উপকরণ-তালিকা*** (Recipe)—উপরি বর্ণিত উপায়ে খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণ, উহাদের মাত্রা এবং পরিমাণ প্রথমেই ঠিক করিয়া

লওয়া আবশ্যক। ইহাই হইবে তোমাদের কোনও একটি বিশেষ খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিবার উপকরণের তালিকা। রন্ধনে এই উপকরণের তালিকার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহার দ্বারাই তুমি তোমার ঐ বিশেষ খাদ্যবস্তু প্রস্তুতিতে কত খরচ পড়িবে, উহা ব্যয় সাপেক্ষ হইবে কি না, ঐ খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের উপাদান ও উপকরণগুলি ব্যবহার করার দরুণ উহার গুণাগুণই বা কিরূপ হইবে তাহা ছাড়া, ঐ বিশেষ বস্তুটি তৈয়ারি করিতে কি কি তোমার প্রয়োজন হইবে, সেই সম্বন্ধে তোমার সঠিক ধারণা থাকার দরুণ তুমি জিনিসগুলি পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পার, যাহাতে রন্ধনের কাজ আরম্ভ করিয়া তোমাকে বারে বারে বিভিন্ন জিনিসের জন্য ছুটাছুটি করিতে না হয়; উহাতো মানসিক একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায় এবং রন্ধনও আশানুরূপ হয় না। রন্ধনের কাজে প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস হাতের কাজে গুছানো থাকা প্রয়োজন।

***মাপ ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা***—প্রায় প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন উপকরণগুলিকে একটি বিশেষ মাপ ও মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়। বিভিন্ন রন্ধনাদিতে কতটা লবণ বা কি পরিমাণ তেল-ঘি দিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়গুলি জানিয়া লইতে পার। কিংবা কতখানি মসলার প্রয়োজন হইবে, জানা চাই। এইগুলি ঠিক মাত্রানু- যায়ী ব্যবহার করিতে পারার উপরেই **রন্ধনের স্বাদ, বর্ণ** ও **ঘ্রাণ** নির্ভর করে। অধিকন্তু রন্ধন-করা জিনিসগুলির নিখুঁত রং ও দীপ্তি, পরিপাটী সৌন্দর্য ও রমণীয়তা ইত্যাদি পরিমিত মাপ ও মাত্রার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতি-প্রণালী ও উপকরণগুলির মাপ ও মাত্রা যদি আমাদের জানা থাকে, তাহা হইলে প্রস্তুতির দোষে ঐ খাদ্যদ্রব্য সহজে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইতে পারে না; এবং পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে পরিণত-বয়স্কদের প্রায় সকলেই বিনা-দ্বিধায় রন্ধনকার্যে অগ্রসর হইতে পারে। অতএব রন্ধনকার্যে মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

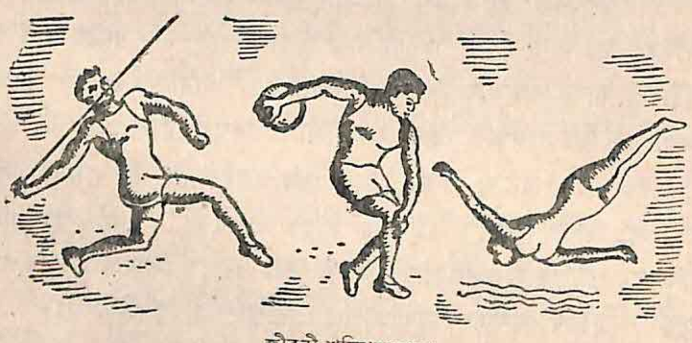
———

# চতুর্থ অধ্যায়

## খাদ্য

**খাদ্য কাহাকে বলে**—রুটি, কেক, ভাত, পোলাও, আইসক্রিম, আপেল, মাংস প্রভৃতি যত প্রকার খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়, সেইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোট **ছয় প্রকার** পুষ্টিকারক রাসায়নিক উপাদান দ্বারা সকল খাদ্যদ্রব্য গঠিত। এই ছয়টি পুষ্টি-উপাদান বা খাদ্য-উপাদানকে **কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ, ধাতব-লবণ, ভাইটামিন** ও জল বলা হয়। খাদ্য বলিতে ঐ ছয়টি পুষ্টি-উপাদানকেই বুঝায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি **দেহ-পরিপোষক** খাদ্যের অন্তর্গত, আর বাকী তিনটি **জীবন-শক্তি-সংরক্ষক** বলিয়া পরিগণিত। প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যই এই এক বা একাধিক খাদ্য উপাদান দ্বারা নির্মিত।

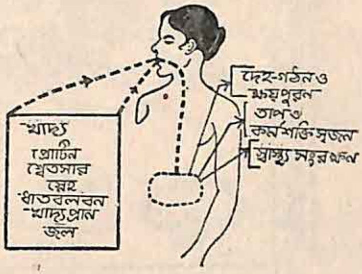
কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন এই তিনটি প্রধান পুষ্টি-উপাদানের যে উপাদানটি যে খাদ্যদ্রব্যে অধিক পরিমাণে থাকে, সেই খাদ্যদ্রব্যকে সেই জাতীয়



জীবনী-শক্তি সংরক্ষণ

খাদ্য বলে। যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ-পদার্থ হইতে অধিক, সেইজন্য ওই খাদ্যদ্রব্য-গুলিকে প্রোটিন-খাদ্য বলা হয়। এই নিয়মানুসারে চাউল, গম, বজরা, ভুট্টা, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতিকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য ; আর ঘি, তৈল, মাখন, চর্বি ইত্যাদিকে স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বলা হয়।

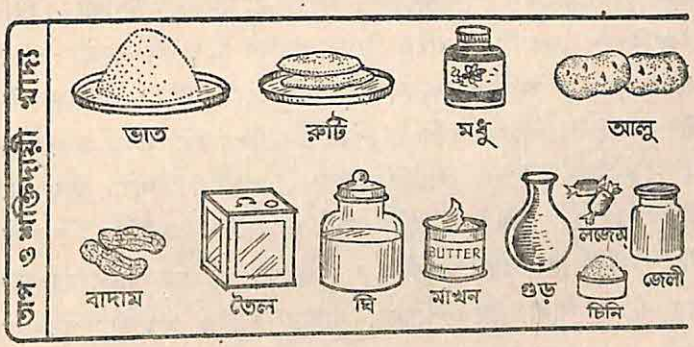
***খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা***—আমাদের দেহে খাদ্যের প্রয়োজন তিনটি। প্রথমতঃ কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ দেহে **তাপ** ও **কর্মশক্তি** যোগায় ; দ্বিতীয়তঃ প্রোটিন ও ধাতব লবণ দেহের দৈনন্দিন **ক্ষয়-ক্ষতি** পূরণ করিয়া **দেহগঠন** ও **পোষণ** কার্যে সহায়তা করে। আর তৃতীয়তঃ, জল ও ভাইটামিন দেহের আভ্যন্তরীণ কার্যগুলির সুশৃঙ্খল পরিচালনার দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল রসনা তৃপ্তি বা ক্ষুধার নিবৃত্তি খাদ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।



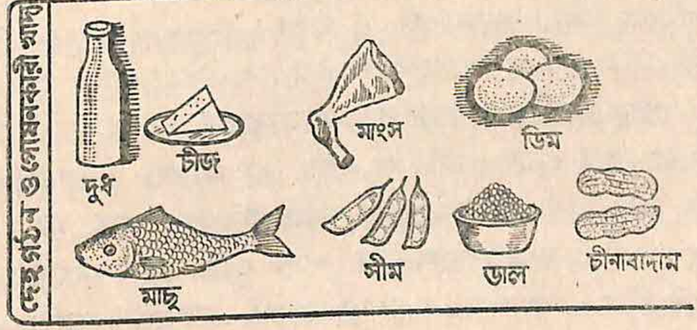

খাদ্য ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

চিত্রের সাহায্যে ত্রিবিধ **ক্রিয়া অনুযায়ী খাদ্য-বিভাগ** দেখানো হইল।

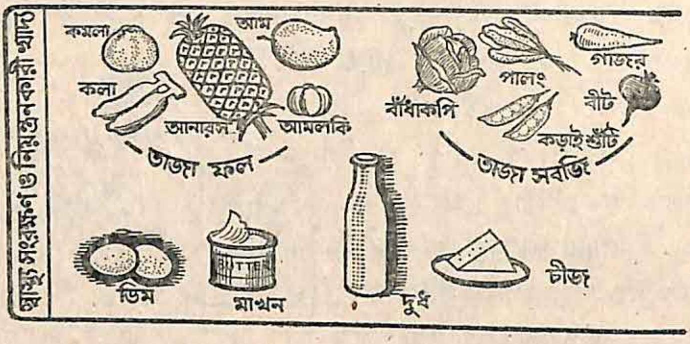
**(১) তাপ ও শক্তিদায়ী খাদ্য—**




**(২) দেহ-গঠন ও পোষণকারী খাদ্য—**



(৩) আভ্যন্তরীণ দেহ-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্য—

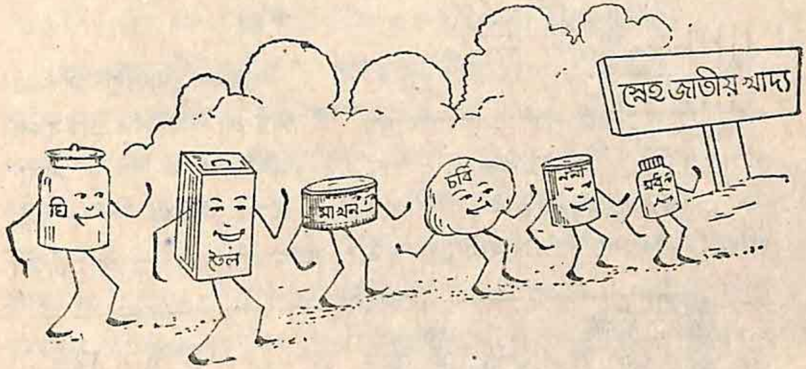



## স্নেহজাতীয় খাদ্য

***স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের উৎপত্তি ও উপাদান***—স্নেহ-পদার্থ **কার্বন, হাইড্রোজেন** ও **অক্সিজেন**—এই তিনটি মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন-রূপ সংমিশ্রণে তৈয়ারি। যদিও উপাদানগুলির মাত্রা সমান নহে ;—যেমন, কার্বনের তুলনায় অক্সিজেনের মাত্রা ইহাতে খুব সামান্য। উদ্ভিজ্জ তৈল, (সরিষা, নারিকেল, বাদাম, তিল, জলপাই প্রভৃতির তৈল) সকল প্রকার জান্তব ঘৃত ও চর্বি স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। ইহা ছাড়া মাংস, মাছ, মাছের তৈল, ডিম, দুধ, মাখন, মালাই, পনীর, শুক্‌না ফল ইত্যাদিতেও স্নেহ-পদার্থ যথেষ্ট থাকে। সব রকম স্নেহ-জাতীয় খাদ্যেই যে স্নেহ-উপাদানের পরিমাণ সমান থাকে, তাহা নহে ;—যেমন, মাখনে শতকরা ৮১ ভাগ স্নেহ-জাতীয় উপাদান ও ১৫ ভাগ জল থাকে ; অপরপক্ষে আবার শূকরের চর্বি কিম্বা আগুনে ঝলসানো অন্যান্য মাংস হইতে যে গলিত মেদ পাওয়া যায়, উহার মধ্যে স্নেহ-উপাদানের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে বিভিন্ন স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের স্নেহ-উপাদানের পরিমাণ জানিয়া লও।

***স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা***—তোমরা জান, পেট্রোল পুড়িবার ফলে মোটর গাড়ী চলে, আর সেই কারণেই ঐ গাড়ীও গরম হইয়া উঠে। অর্থাৎ পেট্রোল পুড়িয়া গাড়িতে গতিশক্তি ও তাপ সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি খাদ্য পরিপাকের ফলে আমরা দেহে তাপ ও কর্মশক্তি পাই। তাপই জীবন। যাহার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য যত বেশী, কর্মচাঞ্চল্যও তাহার ততই

অধিক। **স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের তাপ উৎপাদন শক্তি কার্বহাইড্রেট বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের দ্বিগুণেরও কিছু বেশী।** এইজন্যই শীতপ্রধান দেশে স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া প্রাণিজ স্নেহ-জাতীয় খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে বলিয়া উহা আমাদের স্নায়ু-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এইজন্যই ছাত্র, ছাত্রী ও শিশুদের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ অত্যধিক হইলে



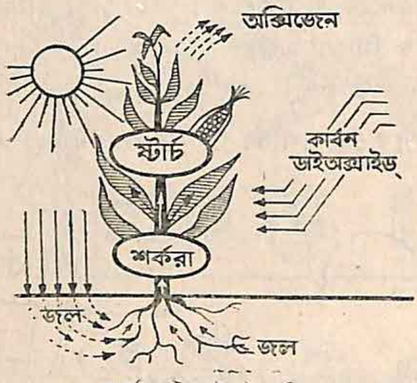

কর্ম্মশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়

একদিকে যেমন শরীরে মেদবৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা থাকে, অপরদিকে তেমনি আবার ইহার অভাব ঘটিলে ওজন হ্রাস; শ্বাসরোগ, চর্মরোগ প্রভৃতি উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে। অবশ্য কেবলমাত্র স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের উপরেই জীবনধারণ করা চলে না। স্নেহ-পদার্থ যতটা খাইবে শ্বেতসারের পরিমাণ তাহার প্রায় দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

## কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য

***কার্বোহাইড্রেটের উৎপত্তি ও উপাদান***—সকল প্রকার শর্করা, স্টার্চ ও সেলুলোজ কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্গত। কার্বোহাইড্রেট নাম হইতেই তোমরা সহজে অনুমান করিতে পারো যে, ইহাও স্নেহ-পদার্থের ন্যায় **কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন** এই তিনটি মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন মাত্রার সমবায়ে তৈয়ারী। গাছের সবুজ পাতার রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল, দিনের বেলায় বায়ু ও জল হইতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া শর্করা রসের সৃষ্টি করে এবং তাহাই স্টার্চ বা শ্বেতসার রূপে শস্যে, ফলে বা

বীজে সঞ্চিত রাখে। কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য মাত্রেই উদ্ভিদ উদ্ভূত। শ্বেতসার ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের কোনটিতেই নাইট্রোজেন নাই। সেইজন্যই এই উভয় প্রকার খাদ্য দৈহিক **পরিপোষণ** অপেক্ষা দৈহিক **তাপ** সংরক্ষণে বা **কর্মশক্তি** যোগাইতে অধিকতর সহায়তা করে।



কার্বোহাইড্রেটের উৎপত্তি

তোমরা মোটামুটি জানিয়া রাখ যে, উদ্ভিজ্জাত প্রায় সকল প্রকার খাদ্য অর্থাৎ নানা-প্রকার উদ্ভিজ্জ শস্য ও শর্করাদি মিষ্টবস্তু সবই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। সুতরাং চাউল



কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য

( এবং চাউল হইতে তৈয়ারি খই, মুড়ি, চিড়া ), গম ( এবং গম হইতে তৈয়ারি আটা, ময়দা, সুজি ), যব ( বার্লি ), সাগু, এরারুট, ভুট্টা, বাজরা প্রায় সমস্ত রকম টাটকা ফল, মূল-জাতীয় উদ্ভিদ ( যেমন-ওল, কচু, গাজর, রাঙ্গাআলু, আলু বিট, মূলা ইত্যাদি ) এবং আখ, চিনি, গুড় ( খেজুর, আখ, তাল ) প্রভৃতি সকল মিষ্ট দ্রব্যই কার্বোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্য।

***সেলুলোজ***—'সেলুলোজ' বা উদ্ভিদতন্তু ( vegetable fibre ) বস্তুটি কি, তাহা তোমাদের জানা দরকার। তোমরা পড়িয়াছ, গাছের সবুজ পাতার

ক্লোরোফিল ( chlorophyl ), সূর্যকিরণের সহায়তায় গাছে একরকম দানাদার পদার্থের সৃষ্টি করে। খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকেই **স্টার্চ** বা **শ্বেতসার** বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক দানার একটি ত্বক্ থাকে। এই ত্বক্‌টিকে 'সেলুলোজ' ( cellulose ) বলা হয়। পাতা, ডাটা, শিকড়, বীচি বা ফলের ছিব্‌ড়ে-জাতীয় আবরণ এই 'সেলুলোজ' শ্রেণীর অন্তর্গত। সিদ্ধ করিলে এই ত্বকটি কাটিয়া যায় ও ভিতরের স্টার্চ সহজপাচ্য হয়। 'সেলুলোজ'-এর খাদ্যমূল্য কিছুই নাই, তবে মানুষের পক্ষে ইহা হজম করা কঠিন বলিয়া ইহা দ্বারা সহজে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

*কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা*—কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যে দেহে **কর্মশক্তি** বাড়ে ও **তাপ সঞ্চার** হয়। তাহা ছাড়া উহার আরও একটি কাজ আছে—**রক্তের ক্ষারত্ব** বজায় রাখা। মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে সাধারণতঃ অম্লরোগ হয়। এই অম্ল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহা নষ্ট করিবার জন্যই শ্বেতসার খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্য তাই উপকারী। যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার খাইলে অপেক্ষাকৃত কম প্রোটিন খাইয়াও মানুষ সুস্থ শরীরে অধিক দিন বাঁচিতে পারে। এই কারণে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যকে **'প্রোটিন বাঁচোয়া'** খাদ্য বলা হয়। তোমরা জান যে, পরিপাক-ক্রিয়ার ফলে শ্বেতসার-খাদ্য বিশুদ্ধ শর্করায় (glucose) রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে রক্তের সহিত মিশিয়া কিছুটা মাংসপেশীতে ও কিছুটা যকৃতে গ্লাইকোজেনরূপে ( প্রাণীদেহে সঞ্চিত শর্করা) জমা হয়। পরিশ্রমের সময় আমরা দেহের এই জমানো শর্করাই ( গ্লাইকোজেন ) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া কর্মশক্তি বাহির করিয়া লই। শ্বেতসার দ্বারা গঠিত এই গ্লাইকোজেনই দেহে কর্মশক্তির প্রথম ভাণ্ডার। ইহা নিঃশেষিত হইয়া গেলে চর্বি দ্বারা নির্মিত দ্বিতীয় ভাণ্ডারে টান পড়ে। এই কারণেই তোমরা দেখিতে পাও, শ্রমশীল ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের বিভিন্ন খাদ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় একটি তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

## প্রোটিন খাদ্য

*প্রোটিনের উৎপত্তি ও উপাদান*—একমাত্র প্রোটিন খাদ্যেই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া বহুল পরিমাণে **নাইট্রোজেন** পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহার আর এক নাম **নাইট্রোজেন-বহুল খাদ্য**। আমাদের

দেহকোষসমূহ প্রোটিন দিয়া গঠিত এবং জীবদেহের সর্বত্রই প্রোটিন বিদ্যমান। এ কারণে দেহের যথাযথ পোষণ এবং নূতন কোষ গঠন করিয়া দেহের দৈনন্দিন ক্ষয়-ক্ষতি পরিপূরণ করা প্রোটিন খাদ্য ব্যতীত কার্বোহাইড্রেট বা স্নেহজাতীয় খাদ্য দ্বারা সম্ভব নয়।

প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এগুলিকে **এ্যামিনো এসিড** বলে। এইগুলিই প্রোটিনের সহজতম অবস্থা। দেহের পোষণ ও পুষ্টির দিক হইতে প্রোটিন খাদ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

১। **সম্পূর্ণ** ( complete ) বা প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন।

২। **অসম্পূর্ণ** ( incomplete ) বা নিম্ন শ্রেণীর প্রোটিন।

**সম্পূর্ণ** প্রোটিন সেই সব প্রোটিন খাদ্যকেই বলে, যাহার মধ্যে মানুষের দেহগঠন ও পোষণকারী প্রধান এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির অধিকাংশই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। জীব-দেহ হইতে উদ্ভুত প্রায় সকল প্রোটিন খাদ্য এই শ্রেণীতে পড়ে, যথা—মাংস, মাছ, ডিম, ছানা, পনীর ইত্যাদি।

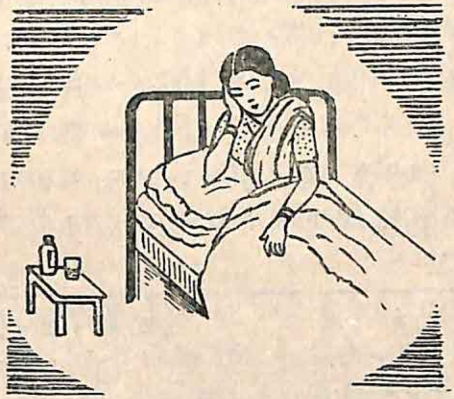
**অসম্পূর্ণ** প্রোটিন খাদ্যে দেহগঠন ও পোষণকারী অত্যাবশ্যক এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির কয়েকটি মাত্র পাওয়া যায়। উদ্ভিদ উদ্ভূত প্রায় সকল প্রোটিন খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত, যথা—ডাল, সিম, মটরশুঁটি, শুষ্ক ফল ইত্যাদি।




প্রাণিজ প্রোটিন—সম্পূর্ণ প্রোটিন। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন—অসম্পূর্ণ প্রোটিন

*প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা* – দেহের দৈনন্দিন ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে স্বাভাবিক গঠন ও পোষণে এবং শরীরে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা

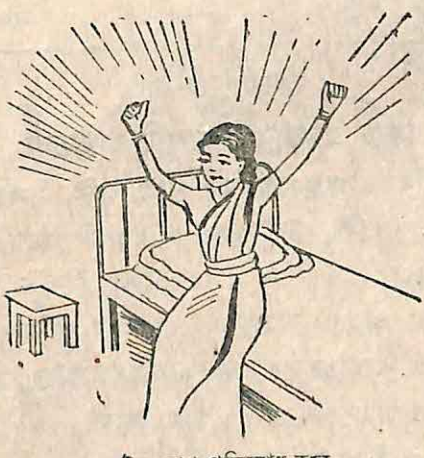
গড়িয়া তুলিতে প্রোটিন খাদ্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এইজন্য ইহাকে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান খাদ্য বলে। 'প্রোটিন' কথাটির অর্থ **প্রথম** বা **প্রধান**। শিশুর খাদ্যে



প্রোটিন দৈহিক ক্ষয়-পূরণ করে

ইহার অভাব ঘটিলে শিশুর ওজন হ্রাস পাইতে থাকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পেট ও লিভারের পীড়া দেখা দেয় এবং শিশু সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। বড়দের মধ্যে ইহার অভাবে রক্তহীনতা, হাত পা ফুলা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা যায়।

**বিভিন্ন বয়সে প্রোটিনের প্রয়োজনীয় মাত্রা**—বিভিন্ন বয়সের



প্রোটিন রোগ প্রতিরোধ করে

লোকের জন্য বিভিন্ন মাত্রায় প্রোটিন-খাদ্যের প্রয়োজন। ১৬।১৭ বৎসর পর্যন্ত

বর্ধিষ্ণু ছেলেমেয়েদের খাদ্যে **মাছ, মাংস, ডিম, দুধ** প্রভৃতি সম্পূর্ণ **প্রোটিন** যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক। একজন পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে **৭০ গ্রাম** প্রোটিনের প্রয়োজন। সেইরূপ একজন পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের কমপক্ষে **৬০ গ্রাম** প্রোটিন আবশ্যক। ২৫ বৎসরের পর হইতে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয় ও সেই অনুসারে শ্বেতসার ও ফল ইত্যাদির পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে দুধ ও মাছ ব্যতীত অন্য প্রোটিনের তেমন প্রয়োজন হয় না

বিভিন্ন বয়সে প্রতিদিন কি পরিমাণ প্রোটিন প্রায়োজন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

| বয়স | | প্রোটিন (গ্রাম হিসাবে) |
|---|---|---|
| ১—৩ বৎসর | ... | ৪০ |
| ৪—৬ " | ... | ৫০ |
| ৭—৯ " | ... | ৬০ |
| ১০—২১ " | ... | ৭০ |
| মেয়ে ১৩—১৫ " | ... | ৭৫ |
| " ১৬—২০ " | ... | ৮০ |
| ছেলে ১৩—১৫ " | ... | ৮০ |
| " ১৬-২০ " | ... | ৮৫ |

১ ছটাক=৫৮ গ্রাম

## নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য

আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে মাছ, দুধ, ডিম, মাংস, সব্‌জি, বাদাম ও ডাল ইত্যাদি প্রধান। এই খাদ্যগুলির মধ্যে কোন্‌টির কি গুণ বা দোষ এবং কোন্‌টিতে কি কি উপাদান আছে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। খাদ্যের গুণাগুণ জানা থাকিলে খাদ্য নির্বাচনে সুবিধা হয়। প্রথমে আমরা দুধের কথা আলোচনা করিব, কারণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় দুধের স্থান সকলের উপরে।

**দুধ** :—ইহা একটি আদর্শ ও প্রোটিন-বহুল সম্পূর্ণ খাদ্য। দুধের মত উপকারী এবং পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই। দুধের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক

পুষ্টিকর পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। শিশুর শরীর বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত শুধু দুধের দ্বারাই পরিপুষ্ট, বর্ধিত ও সুগঠিত হইয়া থাকে; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে, দেহ-গঠন, পরিপোষণ ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার প্রায় সবগুলিই আমরা দুধের মধ্যে পাই। দুধ তাই একটি **পূর্ণাঙ্গ** বা **সম্পূর্ণ খাদ্য**।

দুধ অনেক প্রকারের হইয়া থাকে—যেমন মানুষের দুধ, গরুর দুধ, ছাগলের দুধ মহিষের দুধ ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন দুধের উপাদানও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ।

মানুষের দুধে গরুর দুধ অপেক্ষা শর্করা ও জলের পরিমাণ অধিক কিন্তু গরুর দুধে মাখন ও ছানার পরিমাণ বেশী। সেইজন্য গো-দুগ্ধের সহিত কিছু জল ও চিনি মিশাইয়া লইলে উহা মানুষের দুধের সমান হইয়া যায়।

মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য উহা সহজে হজম হয় না কিন্তু হজম করিতে পারিলে উহা গরুর দুধ অপেক্ষা অনেক বেশী পুষ্টিকর জানিবে। ছাগলের দুধ ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে উপকারী। দুধের মধ্যে যে প্রোটিন আছে, উহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং মাছ মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা ঐ প্রোটিন অনেক সহজে ও কম সময়ে হজম হয়। ইহা ছাড়া, খাদ্যের ক্যাল-সিয়াম প্রধানতঃ দুধের উপর নির্ভর করে। এই কারণেই আহার্যের মধ্যে ফলমূল ইত্যাদি যতই খাও না কেন, কোনও খাদ্যেই দুধের অভাব মেটানো সম্ভব নয়; দুধে প্রায় সকল রকম ধাতব লবণ দেখা যায়। দুধে ভিটামিন এ, বি-১, ও বি-২ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কাজেই দেখিতেছ, আমাদের দেহের যথাযথ পুষ্টি, গঠন, পোষণ ও সংরক্ষণে দুধের অভাব পরিপূরণ করা সম্ভব নয়। শিশুর পক্ষে দুধ সব সময়েই একটি **সম্পূর্ণ** ও **আদর্শ** খাদ্য। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। শিশুকে গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইবার সময় উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ ফুটন্ত জল মিশাইয়া লইবে, নতুবা শিশুর পক্ষে উহা হজম করা কঠিন হইবে। একই দুধ মাঠাতোলা দুধ, ঘন দুধ, টিনের দুধ, প্রভৃতি বিভিন্নরূপে গৃহস্থের সংসারে প্রতিদিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রাদির সাহায্যে দুধ হইতে মাখন উঠাইয়া লইলে যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে, উহাই **মাঠাতোলা দুধ**। মাখন তুলিয়া লওয়ার দরুণ এই দুধে চর্বির পরিমাণ আর কিছুই থাকে না বলিয়া ইহা শিশুদের পুষ্টি ও গঠনে বিশেষ সহায়তা করে না। দুধ অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিলে উহার জলীয় অংশ উড়িয়া যায় ও দুধ

ঘন হয়। **ঘন দুধ** খাইতে সুস্বাদু হয়, কিন্তু উহা হজম করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং অল্প আঁচে অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিবার ফলে ইহার কতকগুলি ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

**টিনের দুধের** আজকাল যথেষ্ট চল। টিনের দুধে, দুধের প্রায় সমস্ত উপাদানগুলিই থাকে—একমাত্র জল ও ভাইটামিন 'সি' ছাড়া। জল মিশাইয়া লইলেই উহা দুধের সমান হয়। কিন্তু টাটকা দুধ পাওয়া গেলে টিনের দুধ ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

এতদ্ব্যতীত **দই, ঘোল, ছানা** প্রভৃতি সমস্তই দুধ হইতে তৈয়ারী। দুধ ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে আগের জমানো সামান্য দই ফেলিয়া ঘাঁটিয়া, কয়েক ঘণ্টা সামান্য গরম জায়গায় রাখিয়া দিলে উহা জমিয়া দই-এ পরিণত হয়। দুধ অপেক্ষা দই অধিকতর সহজপাচ্য। দধির মধ্যে যে জীবাণু থাকে সেগুলি পেটে গিয়া অনেক অনিষ্টকারী জীবাণুকে খাইয়া ফেলে ও স্বাস্থ্য ভাল রাখে। দই হইতে মাখন তুলিয়া লইলে উহা **ঘোলে** পরিণত হয়। দই অপেক্ষা ঘোল আরো সহজপাচ্য এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ইহা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি উত্তম পানীয়। ফুটানো দুধে লেবুর রস বা পূর্বের তৈয়ারি কিছু ছানার জল দিলে দুধ কাটিয়া যায় এবং দুধের প্রোটিন, উহার ক্যালসিয়াম ও সামান্য কিছু স্নেহ-পদার্থ **ছানার** আকারে নীচে পড়িয়া থাকে—জলের অংশ আলাদা হইয়া যায়। ছানার মধ্যে দুধের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ থাকে এবং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। এই ছানা হইতেই নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারি হয়। আবার ছানাতে অল্প লবণ দিয়া কিছুকাল জাঁক দিয়া রাখিলে উহা জমিয়া **চীজে** (পনীর) পরিণত হয়। চীজে প্রোটিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। **১০০ গ্রাম** চীজের প্রোটিন **২০০ গ্রাম** মাংসের সমান, ছানার যে জলটুকু পড়িয়া থাকে, তাহাতে দুধের শ্বেতসার ও ধাতবলবণাদি থাকে; উহাকে পুষ্টিকর, লঘুপাক ও সুস্বাদু পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ইহা ছাড়া **সর, মাখন, ঘি** ইত্যাদিও আমরা দুধ হইতে পাইয়া থাকি। মাখন জ্বাল দিলে ঘি তৈয়ারি হয়। ঘি অত্যন্ত বলকারক।

একটি কথা মনে রাখিবে—দুধ জ্বাল না দিয়া কাঁচা অবস্থায় কখনই গ্রহণ করিবে না, কারণ দোহন হইতে আরম্ভ করিয়া দুধ পান করার সময়ের মধ্যে দুধ বহুভাবেই দূষিত হইতে পারে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ

গোয়ালারা অত্যন্ত আবর্জনাযুক্ত ও নোংরা জায়গায় থাকে। এই সকল জায়গায় নানারকম দূষিত পদার্থ দুধকে দূষিত করিতে পারে। পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে অনেক সময় গরুর বাঁটে ঘা হইতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া অজ্ঞতা ও আশঙ্কার দরুণ গোয়ালাদের ময়লা হাত ইত্যাদি দুধে ডুবানো ও যে-কোনও স্থান হইতে জল লইয়া মিশাইয়া দুধ বিক্রয় করার অভ্যাস তো আছেই। দুধ যাহাতে আনা-নেওয়ার সময় চল্‌কাইয়া না পড়ে, সেইজন্য গোয়ালারা অনেক সময় দুধের মধ্যে নানা রকম পাতা ইত্যাদিও ডুবাইয়া রাখে। ইহার ফলেও দুধে নানারকম দূষিত পদার্থ প্রবেশ করিয়া থাকে।

**ডিম ঃ**—ডিম একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গৃহস্থের সংসারের দৈনিক খাদ্য তালিকায় **দুধের পরেই ডিমের স্থান**। ডিমে প্রোটিন, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। একটি ডিম হাতে লইয়া দেখিবে, উহার বাহিরে একটি শক্ত সাদা আবরণ রহিয়াছে, ইহাকে আমরা ডিমের খোলস বলি। এই আবরণের ভিতরে দুইটি অংশ—একটি সাদা, অপরটি হলুদ রঙের। হলুদ রঙের অংশটিকে ঘিরিয়াই থাকে ঐ সাদা অংশটি। হলদে রঙের অংশটিকে সাধারণতঃ **ডিমের কুসুম** বলা হয়, এই কুসুমের চারিপাশের শ্বেতাংশটিকে বলা হয় **অ্যালবুমিন** বা ডিমের লালা। উহা খাঁটি প্রোটিন। একটি ডিমের ওজনের প্রায় শতকরা ৫২ ভাগ শ্বেতাংশ ও ৩০ ভাগ কুসুম। বাকী ১২ ভাগ ওজন থাকে ডিমের খোলসে। ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ-জাতীয় উপাদান, লোহ, ফসফরাস, লবণ, ভিটেলিন ( vitellin-phospho-protein ), লেসিথিন ( lecithin ) থাকে। স্নায়ুর ক্ষয়-পূরণে ও গঠনে ফসফরাস ও লেসিথিন দুয়েরই অত্যন্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত ডিমে ভিটামিন এ, বি-১, বি-২ ও ডি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধনে ও পরিপোষণে ডিমও একটি মূল্যবান খাদ্য। ডিমের আর একটি সুবিধা আছে। ইহার উপরে একটি কঠিন আবরণ থাকায় ডিমের ভিতরের খাদ্যাংশ সব সময়েই সুরক্ষিত নির্দোষ থাকে। ডিমে লোহ-লবণ আছে বলিয়া রক্তশূন্যতা বা রক্তাল্পতায় ইহা বিশেষ উপকারী। ডিম ও দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্যে এত সহজে গ্রহণীয় ক্যালসিয়াম লবণ পাওয়া যায় না। ডিমের মধ্যে মুরগীর ডিমে চর্বির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকার জন্য, উহা হাঁসের ডিম হইতে সহজে হজম হয়।

ডিম হজম হওয়া না-হওয়া সাধারণতঃ ডিমের রন্ধন প্রণালীর উপরেই নির্ভর করে। **কাঁচা, অল্প-সিদ্ধ** বা **অর্ধ-সিদ্ধ ডিম** সহজে হজম হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা ডিম বা ভাজা ডিম হজম করা সময়সাপেক্ষ ও কঠিন।

**পচা ডিম বাছিবার উপায় :**—ডিমটিকে আলোর সামনে তুলিয়া ধরিলে উহার মধ্যভাগটি যদি **স্বচ্ছ দেখা যায়**, তাহা হইলে জানিবে ডিমটি পচা নহে। মধ্যভাগটি যদি ঘোলাটে দেখায় ও দুইটি প্রান্ত যদি স্বচ্ছ হয়, তাহা হইলে জানিবে ডিমটি নিশ্চয় পচিয়া গিয়াছে। লবণজলে ( আধসের জলে সিকি চা-চামচ লবণ ) ডিমটিকে ফেলিয়াও পরীক্ষা করিতে পার। যদি দেখ ডিমটি ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে জানিবে উহা পচা। পচা ডিম জল হইতে অপেক্ষাকৃত হালকা।

**মাংস :**—মাংস একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন খাদ্য ; ইহা যেমন বলকারক তেমনি পুষ্টিকর। জন্তুর মাংসবিশেষের বিভিন্নতায় চর্বির পরিমাণেরও তারতম্য হয়। রাঁধিবার সময় মাংস হইতে একপ্রকার সুগন্ধি নির্যাস নির্গত হয়, ইহাই মাংসকে সুগন্ধ ও সুস্বাদু করে। ইহা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। লৌহ, ফসফেট, পটাসিয়াম প্রভৃতি লবণও মাংসের মধ্যে পাওয়া যায়। টাটকা মাংসে ভাইটামিন**এ, ডি** ও **ই** থাকে। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের জন্যই মাংস এত পুষ্টিকর ও বলকারক।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ছাগ-মাংসই বেশী প্রচলিত। চতুষ্পদ জন্তুর মাংসের মধ্যে ছাগ-মাংসেই প্রোটিনের পরিমাণ অধিক। ইহা সহজে হজম হয়, খাইতে সুস্বাদু ও নরম। ভেড়ার মাংস প্রায় ছাগ-মাংসেরই সমান ; তবে ইহাতে চর্বির পরিমাণ বেশী থাকায় সহজে হজম হয় না।

প্রোটিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে পাখীর মাংসে ; চর্বি কম থাকার কারণে ইহা সহজে হজম হয়, সেইজন্য রোগীর পক্ষেও উপযোগী। সাধারণতঃ মুরগী, পায়রা, তিতির প্রভৃতি পাখীর মাংস সুপাচ্য ও পুষ্টিকর। হাঁস, সারস প্রভৃতি পাখীর মাংসও সুখাদ্য, কিন্তু উহাতে চর্বির ভাগ কিছু থাকায় উহা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

**টাটকা মাংস চিনিবার উপায় :**—শরীরের পক্ষে অধিকাংশ মাংসই পুষ্টিকর। কিন্তু মাংস টাটকা হওয়া দরকার। বাসী ও পচা মাংস সর্বদাই বর্জন করিবে। টাটকা মাংস চিনিবার কতকগুলি উপায় আছে টাটকা মাংসে কোন দুর্গন্ধ থাকিবে না। দেখিতে জমাট-কঠিন এবং কিঞ্চিৎ

লাল আভাযুক্ত হইবে। যদিও দেখিতে উহা কঠিন মনে হয়, কিন্তু টানিয়া ছিঁড়িতে গেলে মনে হয় উহা যথেষ্ট নমনীয়। বাসী বা পচা মাংসে এই কঠিন ও স্বচ্ছভাব থাকে না এবং উহা দেখিতে অপরিষ্কার, ভিজা ও ক্যাকাসে হয়। বাসী মাংসের চর্বিগুলি যেন জেলির মত হইয়া বিন্দু বিন্দু উহার গায়ে লাগিয়া থাকে। টাট্‌কা মাংসের উপরি-অংশ দেখিতে সম্পূর্ণ জলশূন্য মনে হয়। বাসী মাংস টানিলে সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। আরও একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবে—বাসী ও পচা মাংসে অনেক সময় একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়; এইরূপ মাংস খাইলে জীবনও বিপন্ন হইতে পারে।

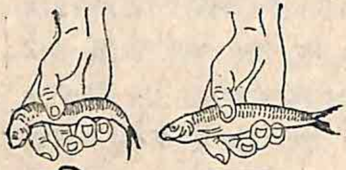
**মাছ**ঃ—গৃহস্থের সংসারে আমিষ খাদ্যের মধ্যে **মাছ-ই প্রধান**। ইহা একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য, অত্যন্ত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহার পরিপোষণ ক্ষমতাও অধিক। মাছে চর্বির অংশ কম থাকে বলিয়া ইহা মাংস অপেক্ষা সহজে হজম করা যায়। একমাত্র 'সি'-ভাইটামিন ছাড়া মাছে আর সকল ভাইটামিনেরই উপস্থিতি দেখা যায়। মাছে আয়োডিনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের মাছগুলিতে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ও দুর্বল সকল লোকের পক্ষে মাছ বিশেষ উপকারী খাদ্য। চক্ষু ও মস্তিষ্কের পুষ্টির পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

মাছ দুই রকমের হইয়া থাকে। যে সমস্ত মাছে চর্বি কম থাকে সেই সমস্ত মাছকে **স্বল্পমেদযুক্ত মাছ** ( lean fish ) বলা হয়। কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ এই পর্যায়ে পড়ে। শিঙ্গি মাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিন থাকে। তারপরে কই, মাগুর ইত্যাদি। যে-সমস্ত মাছে বেশী চর্বি আছে, সেই সমস্ত মাছকে **মেদযুক্ত মাছ** ( fat fish ) বলা হয়। ইলিশ, রুই, কাতলা, চিতল, পারুসে প্রভৃতি মাছ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মাছ যদিও হজম করা কিছু কঠিন, কিন্তু জীবনীশক্তিবর্ধক বলিয়া উহা প্রায় অনেক ক্ষেত্রে মাংসের সমতুল্য। ইলিশ মাছে তেলের ভাগ বেশী থাকায় ইহা কিছু গুরুপাক। স্বল্প মেদযুক্ত মাছ সহজে হজম হয় এবং শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য অতি উপযুক্ত খাদ্য।

চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি যদিও দেখিতে অন্যজাতীয়, কিন্তু উহা অনেক সময়ে মাছের পর্যায়েই পড়ে। বাহিরের একটি কঠিন আবরণ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 'শেল ফিশ' ( shell fish ) বলা হয়। এইগুলিতে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর, যদিও হজম করা কঠিন। ইহা ছাড়া লোনা বা শুট্‌কি মাছও আছে, যাহা মোটেই সুপাচ্য নহে। **মাছের ডিম** খুবই পুষ্টিকর এবং সকলের

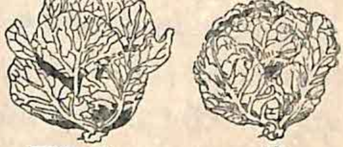
প্রিয় খাদ্য হইলেও, গুরুপাক। **মাছের তেলে** প্রচুর ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইহা খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু গুরুপাক।

**টাট্‌কা মাছ চিনিবায় উপায়**ঃ—মাংসের ন্যায় মাছও টাট্‌কা ব্যবহার করা উচিত। বাসী পচা মাছে কলেরা, উদরাময় ও অন্যান্য পেটের পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে। টাট্‌কা মাছ চিনিবার কতকগুলি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। টাট্‌কা মাছে কোন দুর্গন্ধ বাহির হইবে না; চোখ দুটি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকিবে; কান্‌কোগুলিও লালচে ও রক্তের স্বাভাবিক রং-বিশিষ্ট হইবে। উহার আঁশগুলিও বেশ চকচকে ও চামড়ার সহিত শক্তভাবে সন্নিবদ্ধ থাকে। একটি টাটকা মাছ যদি সোজা করিয়া হাতের উপর রাখ, দেখিবে উহার লেজ কখনও ঝুলিয়া পড়িবে না। টাট্‌কা মাছ স্পর্শে শক্ত অনুভব হইবে, টিপ দিলে উহার দেহ টোল খাইবে না, কিম্বা কাটিবার সময় কাঁটা হইতে মাছ সরিয়া যাইবে না। পচা মাছের চোখ ঘোলাটে, কান্‌কোগুলি ফ্যাকাসে ও উহার আঁশ টানিবামাত্র উঠিয়া আসে।




বাসি ও তাজা মাছ

**টাট্‌কা সবজি চিনিবার উপায়**ঃ—তাজা শাক-সবজি দেখিতে সতেজ হইবে এবং দেহ কুঞ্চিত হইবে না। বাসী হইলে শাক-সবজির আকৃতি ও ওজন দুইই হ্রাস পায়। চিত্রে তাজা বাঁধাকপিটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, পাতাগুলি কেমন খাড়া ও বাহিরের দিকে ছড়ানো আছে, কিন্তু বাসী বাঁধাকপির পাতার ডগাগুলি কুকড়াইয়া ভিতরের দিকে গুটাইয়া গিয়াছে।




তাজা ও বাসী বাঁধাকপি

বাদাম ঃ—বাদাম, চীনাবাদাম, আখরোট, কাজুবাদাম প্রভৃতিকে **কঠিন** আবরণযুক্ত **শুষ্ক ফল** বলা হইয়া থাকে। সাধারণ ফল অপেক্ষা এই কঠিন ফলগুলি অধিকতর পুষ্টিকর এবং ইহাদের দেহ-পরিপোষণের ক্ষমতাও বেশী। খাদ্য-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বাদামের পুষ্টিবর্ধক ও দেহ-পরিপোষণ-ক্ষমতা প্রায়

মাংসের সমান। বাদামে প্রোটিন ও স্নেহ-জাতীয় উপাদানের পরিমাণও প্রচুর। চীনাবাদামে প্রোটিন ও স্নেহের পরিমাণ খুবই বেশী।

**ডাল**ঃ—প্রায় প্রতি গৃহেই ভাতের সহিত ডাল খাইবার নিয়ম। সাধারণতঃ মুগ, মুসুর, অড়হর, মাষকলাই, ছোলা প্রভৃতি ডালই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নেহ পদার্থ সামান্য মাত্র থাকে বলিয়া **ডালের সঙ্গে ঘি মিশাইয়া লওয়া উচিত**, ইহাতে প্রোটিন হজমের সুবিধা হয়। ডালে উদ্ভিদ্-জাত, অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের পরিমাণ বেশী সুতরাং গরীবের ঘরে যাহাদের প্রত্যহ মাছ-মাংস খাইবার মতো অর্থসংস্থান নাই—ডাল তাহাদের নিকট মাংসের সমান। ডালে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাস, লৌহ ও লবণ থাকে। ডালের উপরের অংশে, অর্থাৎ খোসার নীচে সঞ্চিত 'এ' ও 'বি' ভাইটামিনের পরিমাণও কম নহে। ডালকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বিন ( bean ), মসুর ( lentile ) ও মটরশুঁটি ( peas )। বিভিন্ন প্রকার ডালে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকেঃ ডালের মধ্যে মসুর, মুগ এবং ছোলাতেই প্রোটিন অপেক্ষাকৃত বেশী, আর ছোলা ও কলাই ডালে চর্বি অপেক্ষাকৃত বেশী। ডালের শস্য নানাপ্রকার আছে, যথা—মুগ, মসুর, ছোলা, কলাই, বরবটি, মটর, সিম ইত্যাদি। এই শস্য পাকিলে আমরা রাঁধিয়া ডাল বানাই; বাটিয়া বড়া, বড়ি, ধোঁকা, পাঁপড়, পুরি তৈয়ারি করি, কিম্বা গুঁড়া করিয়া ছাতু করিয়া খাই। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে **সয়াবিন** একটি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন। শতকরা ৪৩ ভাগ প্রোটিন ইহাতে থাকে, মাংসের মধ্যেও এতটা প্রোটিন পাওয়া যায় না। সয়াবিনের দুধ, ছানা ইত্যাদি খুবই পুষ্টিকর। আমরা প্রত্যহ যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ খাদ্যই রন্ধন করিয়া লইতে হয়। রন্ধনের পূর্বে তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কাটিয়া লওয়া প্রয়োজন, যেন কোনো দূষিত পদার্থ থাকিতে না পারে।

খাদ্য সম্বন্ধে পড়িলে। এখন তোমাদের কর্তব্য, সংসারের বিভিন্ন ব্যক্তির বয়স ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাদ্যবস্তুগুলির যথাযথ নির্বাচন ও রচনা করিয়া, উহাকে সুষম ও পুষ্টিকর করিয়া তোলা। সংসারকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে তোমাদের উপরেই, খাদ্য-রচনাকারী হইবে তোমরাই; সুতরাং কোন্ খাদ্যের কি কাজ, দেহের পুষ্টি ও পরিপোষণে উহার প্রয়োজনীয়তাই বা কতখানি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই তোমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

খাদ্য রচনা করিবার পূর্বে ও পরে সমালোচকের কঠিন দৃষ্টি লইয়া নিজের তৈয়ারি আহার্যের সূক্ষ্ম বিচার করিবে—ভাবিয়া দেখিবে, তোমার তৈয়ারি আহার্য দিয়া সংসারের বিভিন্ন মানুষের রুচি, পরিশ্রম ও দেহের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তুমি কতখানি মিটাইতে পারিয়াছ।

খাদ্য-রচনা ও উহার যথাযথ ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য ও জীবন। তোমরা জান ব্যক্তির সমষ্টিতেই হয় সমাজ। সুতরাং জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া—সমাজকে সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ করিয়া তোলার দায়িত্ব তোমাদেরই। **স্বাস্থ্যের উপরেই নির্ভর করে জীবনের সার্থকতা, আনন্দ ও সৌন্দর্য।** স্বাস্থ্য অর্জন করা অসম্ভব কিছু নহে। শ্রম ও বিশ্রাম প্রভৃতি জীবনের প্রাত্যহিক কাজগুলিকে সুনিয়মিত করিয়া দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পানীয় ও আহার্যের যথাযথ ব্যবস্থা করা ও উহা গ্রহণ করার নীতি মানিয়া চলিলে দেখিবে আপনা হইতেই দেহ সুন্দর, সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়া উঠিতেছে। **স্বাস্থ্যের দীপ্তিই মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য।** সুতরাং তোমার সংসারকে তুমি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোল। নূতন মানুষ ও নূতন সমাজ গড়িতে হইলে নূতন মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। নূতন মন লইয়া তুমি অগ্রসর হও। বহুদিনের সঞ্চিত সংস্কারকে মন হইতে দূর করিয়া খাদ্য-ব্যবস্থায় ও রচনায় তুমি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন আনিবার জন্য প্রয়াসী হও। পশ্চিমের দেশগুলির মানুষ অধিকতর সুস্থ এবং উহাদের জীবনের মেয়াদও দীর্ঘতর। ইহার কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন আহার্য ও আহার্যের বিভিন্ন উপাদানের মান উন্নত করিবার জন্য উহারা অবিরাম পরিশ্রম করিতেছে। খাদ্য-ব্যবস্থায় ও রচনায় উহারা লইয়া আসিয়াছে একটি **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।** এইভাবে খাদ্য-পরিকল্পনায় ও রচনায় আমূল পরিবর্তন আনিয়া উহারা রোগকে প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ করিতেছে ও অস্বাস্থ্যকে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। তোমরাও তোমাদের খাদ্য রচনার কৌশলকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কর। **সুস্বাদুতা** অপেক্ষাও উহার **সুসমতা** ও **পুষ্টির** প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ কর। খাদ্য-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিয়া তোমরা দেশের মানুষের জীবনকেও দীর্ঘতর ও সুন্দরতর করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াসী হও। সেই জীবনই সার্থক ও সফল—যে জীবন সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকিয়া সমাজের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে পারে।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে প্রধান খাদ্য-উপাদানগুলির পরিমাণ ঃ—

| ভক্ষণীয় অংশ<br>১০০ গ্রাম | জল<br>গ্রাম | প্রোটিন<br>গ্রাম | স্নেহ<br>গ্রাম | শ্বেতসার<br>গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| সিদ্ধ চাউল, ঢেঁকিছাঁটা | ১২·৬ | ৮·৫ | ·৬ | ৭৭·৪ |
| আতপ, ঢেঁকিছাঁটা | ১৩·৩ | ৭·৫ | ·৪ | ৭৮·৭ |
| আটা | ১২ | ১২ | ১·৭ | ৭২ |
| ময়দা | ১৩·৩ | ১১ | ·৯ | ৭৪ |
| সয়াবীন | ৮ | ৪৩ | ১৯·৫ | ২১ |
| মসুর ডাল | ১২·৫ | ২৫ | ·৭ | ৬০ |
| চিনি | ০·৫ | — | — | ৯৯·৫ |
| মধু | ২০ | ০·৫ | — | ৭৯·৫ |
| আলু | ৭৪·৭ | ১·৬ | — | ২৩ |
| বাঁধাকপি | ৯০ | ১·৮ | + | ৬·৩ |
| পটল | ৯২ | ২ | ০·৩ | ২ |
| টম্যাটো | ৯৩ | ২ | — | ৪·৫ |
| বীট | ৮৩·৮ | ১·৭ | + | ১৩·৫ |
| ফুলকপি | ৮৯ | ৩·৫ | + | ৫·৩ |
| কলা | ৬১ | ১·৩ | + | ৩৬·৫ |
| আম | ৮৫ | ১·৫ | + | ১৩ |
| পেয়ারা | ৭৬ | ১·৩ | + | ১৪·৫ |
| পেঁপে (পাকা) | ৮৯·৬ | ০·৫ | + | ৯·৫ |
| কমলা | ৮৭ | ১ | — | ১·৬ |
| আঙ্গুর | ৮৫·৫ | ০·৮ | ০·৫ | ১০·৫ |
| বেদানা | ৮০ | ১ | — | ১৩ |
| আপেল | ৮৬ | ০·৩ | + | ১৩·৫ |
| খেজুর | ২৬ | ০·৩ | + | ৬৭·৫ |
| আখরোট | ৪ | ১৬·৫ | ৬৫·৫ | ১৩·৫ |

| ভক্ষণীয় অংশ ১০০ গ্রাম | জল গ্রাম | প্রোটিন গ্রাম | স্নেহ গ্রাম | শ্বেতসার গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| পেস্তা | ৫·৬ | ১৯·৮ | ৫৩·৫ | ১৬·২ |
| বাদাম | ৫ | ২০·৮ | ৫৮·৯ | ১০·৫ |
| চীনাবাদাম ভাজা | ৪ | ৩১·৫ | ৪০ | ১৯·৫ |
| কাজু বাদাম " | ৬ | ২১ | ৪৭ | ২২ |
| ঘি | ০·৫ | — | ৯৯ | — |
| বনস্পতি | ০·৫ | — | ৯৯ | — |
| সরিষার তৈল | — | — | ১০০ | — |
| মাখন | ১৫·৫ | ০·৫ | ৮১ | ·৫ |
| নারকেল | ৩৬ | ৪·৫ | ৪১·৫ | ১৩ |
| ডিম ( মুরগী ) | ৭৩·৭ | ১৩·৩ | ১৩·৩ | — |
| মাংস ( ভেড়ার ) | ৬৬ | ১৮·৫ | ১৩ | — |
| মুরগী | ৬৬ | ২০ | ১২·৫ | — |
| শিঙ্গি মাছ | ৭০ | ২৪·৫ | ৪ | — |
| মাগুর মাছ | ৭৪ | ১৯·৫ | ৪·৫ | — |
| রুই | ৭৬ | ১৭ | ৫ | — |
| কাতলা | ৭৫ | ১৮ | ৪·৫ | — |
| ইলিশ | ৬৯ | ২০·৫ | ৯ | — |
| স্তন-দুগ্ধ | ৮৮ | ১ | ৩·৯ | ৭ |
| গো-দুগ্ধ | ৮৭·৫ | ৩·৩ | ৩·৬ | ৪·৮ |
| ছাগী-দুগ্ধ | ৮৫ | ৩·৭ | ৫·৬ | ৪·৭ |
| মহিষ-দুগ্ধ | ৮১ | ৪·৩ | ৮·৮ | ৫ |

\+ সামান্য পরিমাণ আছে। —প্রায় নাই

(এই তালিকাটি ভারত সরকারের ২৩নং হেল্‌থ বুলেটিনের সাহায্যে প্রস্তুত )

সুতরাং তোমরা প্রতি ঘরে প্রতি মানুষের স্বাস্থ্যকে ফুটাইয়া তোল। দীর্ঘ-জীবন লাভের প্রয়োজনই বা কি, যদি সুস্থ থাকিয়া সেই জীবনকে সমাজের কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিতে না পারিলে।

আমাদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে তিনটি প্রধান পুষ্টি-উপাদানের পরিমাণের একটি তালিকা ১০৫ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। এই তালিকায় **প্রতি খাদ্যের ১০০ গ্রাম** ( প্রায় ½ পোয়া ) **ভক্ষণীয় অংশে** ( edible portion ) কত গ্রাম করিয়া প্রধান খাদ্য উপাদানগুলি আছে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

## *শ্রেণীর কাজ*

১। পুষ্প ও পুষ্পের যথাযথ আধার নির্বাচন করিয়া স্কুলের শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন স্থলে পুষ্প বিন্যাস কিরূপ করিবে লিখ।

২। তোমাদের আসবাবপত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া উহাতে পালিশ লাগাও।

৩। তোমাদের সূতা ও রেশমের বিভিন্ন পরিচ্ছদাদি যথাযথ ধৌত করিয়া সুবিন্যস্ত কর।

৪। তোমাদের শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী আলপনা অঙ্কিত করিয়া উহাকে সজ্জিত কর।

৫। লুচি, গাজরের হালুয়া, পটেটো চিপ্‌স, ফিস্ ফ্রাই, ডিমের দম ইত্যাদি প্রস্তুত কর। লঙ্কা, কুল ইত্যাদির চাট্‌নি তৈয়ারি কর।

### অনুশীলনী

## গৃহ

১। গুহাবাসী মানুষ ধীরে ধীরে কেমন করিয়া গৃহবাসী মানুষে পরিণত হইল, উহা বর্ণনা কর।

২। 'বিভিন্ন অংশের সমষ্টি লইয়াই একটি বাসগৃহ'—ইহার অর্থ কি? গৃহের বিভিন্ন অংশগুলির নাম কর।

৩। গৃহ উদ্যান ও গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা কি?

৪। গৃহ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি? গৃহ পরিকল্পনা করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ও কেন রাখিবে উহা বর্ণনা কর।

৫। 'বায়ু সঞ্চালন' কাহাকে বলে? নৈসর্গিক ও কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন করাইবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা কর।

৬। আমাদের জীবনধারণে জলের প্রয়োজন কতখানি লিখ। জল দূষিত হইবার প্রধান কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

### গৃহ-সজ্জা

১। ঘরের মেঝে সাজাইবার বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা কর। মেঝের আচ্ছাদন কত রকমের হইতে পারে সংক্ষেপে লিখ।

২। গৃহ সজ্জায় কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা কতখানি বুঝাইয়া দাও।

৩। পর্দার প্রয়োজনীয়তা ও উহার বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। গৃহে পুষ্প বিন্যাস করিবার জন্য পুষ্প ও আধার নির্বাচনের প্রধান নিয়মগুলি কি? পুষ্প-বিন্যাস করিতে গেলে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে?

৫। বাংলাদেশের আলপনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। গৃহ-সজ্জায় আলপনার স্থান কি নির্ণয় কর।

## গৃহ-পরিচালনা

১। গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য কি? গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। সু-গৃহিণীর লক্ষণ কি? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে সুগৃহিণী হওয়া যায়, সংক্ষেপে লিখ।

৩। দাসদাসী ও পরিজনবর্গের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 'মনের বিনিময়েই মন পাওয়া যায়' ইহার অর্থ কি? "অতিথিদেবো ভব" ইহার অর্থ কি?

৪। অতিথি কত রকমের হইতে পারে? অতিথির প্রতি গৃহকর্ত্রীর কি কি কর্তব্য উহা সংক্ষেপে লিখ। 'অতিথি-সেবা সমাজ-সেবারই নামান্তর', ইহার অর্থ কি?

৫। গৃহে যথাযথ নিয়মে কাপড়-চোপড় কাচিতে হইলে তোমার কি কি সাজ-সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হইবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৬। 'কঠিন' ও 'নরম' জল কাহাকে বলে? কাপড় কাচার জন্য কোন্ জল প্রশস্ত ও কেন লিখ।

৭। রেশমের কাপড় ধৌত ও ইস্ত্রি করিবার প্রণালী বর্ণনা কর।

## খাদ্য

১। আমাদের খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ও কেন—এই সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। স্নেহপ্রধান কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

২। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ

৩। আমাদের খাদ্যে প্রোটিন প্রধান স্থান গ্রহণ করে কেন? তোমাদের বয়সের একটি বালক বা বালিকার আহার্যে দৈনিক প্রোটিনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত ও কেন উহা সংক্ষেপে লিখ

৪। নিম্নলিখিত খাদ্যগুলির উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—

(১) মাংস, (২) মাছ (৩) ডিম

৫। দুধকে 'পূর্ণাঙ্গ খাদ্য' কেন বলা হয়? একটি শিশুর পক্ষে দুধ কেন এত প্রয়োজনীয়?

# গৃহ-বিজ্ঞানের কথা

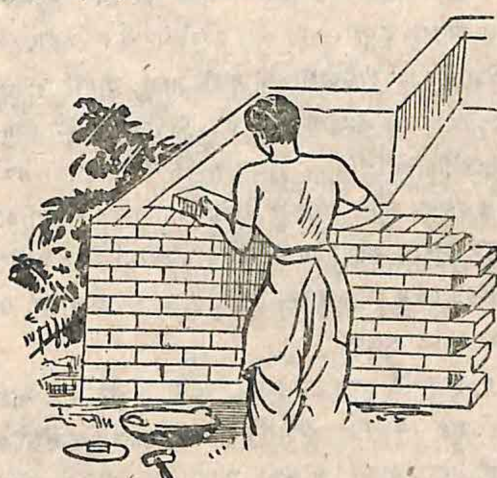
অষ্টম শ্রেণী

জ্যোতিপ্রভাদাশগুপ্তা

# প্রথম অধ্যায়

## গৃহ

***গৃহ-নির্মাণ***—মানুষের জীবনে গৃহের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা তোমরা জান। গৃহ-পরিকল্পনা করিতে গেলে গৃহের অবস্থান ও গৃহাভ্যন্তরের কাজগুলির বিষয় চিন্তা করিতে হয়। এক্ষণে গৃহ-নির্মাণের বিষয়ই আলোচনা করা যাইতেছে। গৃহ-নির্মাণ করিবার সময়ে গৃহের জমি কিরূপ, উহা উঁচু কি নীচু, উহাতে আরও মাটি ঢালিয়া উঁচু করা প্রয়োজন কি না, জমির নিম্নাংশ ফাঁপা কি নিরেট ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জমির



গৃহ-নির্মাণে ইটের চলই অধিক

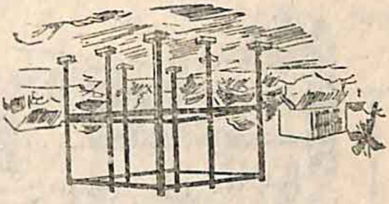
উপরে গৃহখানি কোন্‌দিকে মুখ করিয়া নির্মিত হইবে—দক্ষিণমুখী হইবে কিংবা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হইবে ইত্যাদি বিষয়গুলিও গৃহনির্মাণকালে যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে, গৃহ-নির্মাণকারীর প্রথমেই সেইজমির অবস্থান, আয়তন, সেই জমি কি প্রকারের উহাতে পানীয় জল পাওয়ার ও উহা হইতে জল নিকাশ করার সম্ভাবনা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঠিক জানা প্রয়োজন।

***গৃহ-নির্মাণের উপাদান***—তৎপরেই কোন্ উপাদান দিয়া গৃহ নির্মিত হইবে—তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়। উপাদানের উপরেও গৃহের পরিকল্পনা অনেকাংশে নির্ভর করে। গৃহ-নির্মাণের পূর্বেই স্থির করিয়া লইবে, তুমি তোমার গৃহের জন্য কি প্রকার উপাদান ব্যবহার করিবে। **মাটি, টিন, বাঁশের বেড়া**, খড় ইত্যাদি দিয়া যে সাধারণতঃ গ্রামদেশে গৃহ-নির্মাণ করা হয়, তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। শহরে অনেকে আজকাল কাঠ দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকেন। কাঠের তৈয়ারি গৃহের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য্য, কি ধরণের কাট দ্বারা ও কিভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার উপরেই নির্ভর করে। যে সকল দেশে বা অঞ্চলে কাঠ অধিক পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে বেশীর ভাগ গৃহই দেখিবে কাঠের তৈয়ারি। শহরে গৃহ-নির্মাণে প্রায়ই **ইট** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইটের বাড়ীর গাঁথনির মধ্যে যেন একটি আলাদা গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য ফুটিয়া উঠে। ইটের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও অনেক বেশী। অনেক সময় ইটের গাঁথনিতে অযথা অত্যধিক কারুকার্য করা হইয়া থাকে। ইহাতে গৃহের আসল সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। ইটের গাঁথনি যতই সহজ, সাদাসিদা ও আড়ম্বরহীন হইবে, গৃহের সৌন্দর্য ততই পরিস্ফুট হইবে। টাইলের (tile) ছাদ-বিশিষ্ট গৃহও তোমরা নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবে। টাইল ও ইট যদিও প্রায় একই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু কেবল ছাদ নির্মানেই টাইলের ব্যবহার দেখা যায়। অনেক সময় ইটের গৃহ নির্মাণ করা স্থির করিলেও গৃহস্বামী উহাকে ইস্পাত বা অন্য কোনও উপাদানের ফ্রেম বা কাঠামো দিয়া কি ভাবে জোরালো ও মজবুত করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন।

গৃহ-নির্মাণে **কংক্রীট**-এরও ব্যবহার দেখা যায়। সিমেণ্ট, বালি, পাথরকুচি ইত্যাদির সংমিশ্রণে যে বাড়ী তৈয়ারি হয় তাহাকে কংক্রীটের বাড়ী বলে। কংক্রীটের বাড়ী ইটের বাড়ী অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ও মজবুত হয় এবং আগুনও সহজে উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। কংক্রীট অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত বলিয়া সাধারণতঃ উহা বাড়ীর একতলার দেওয়াল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। গৃহনির্মাণে **ইস্পাতও** যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, শহরে অনেক বড় বড় গৃহ ইস্পাতের কাঠামোর উপর তৈয়ারি করা হইয়াছে। ঘরের জানালা প্রভৃতিতেও আজকাল অনেক সময় ইস্পাত বা এলুমিনিয়ামের ফ্রেমে কাঁচ ব্যবহৃত হয়। এতদ্‌ব্যতীত গৃহ-নির্মাণে সিমেণ্ট-বালির বা চুন-বালির আস্তরণ প্রভৃতিরও ব্যবহার দেখা যায়।

ঘরের **ছাদ** প্রভৃতি কোন্ উপাদানে তৈয়ারি করিবে, গৃহ-নির্মাণ করিতে গেলে উহাও চিন্তা করিতে হয়।

বিদেশে বহু জায়গায় তোমরা কাঠের টালির ছাদ দেখিতে পাইবে। এইগুলি মেশিনেই তৈয়ারি হইয়া থাকে। অনেক জায়গায় আবার **অ্যাজ্‌বেষ্টস্** (asbestos) এর ছাদও দেখা যায়। রং লাগাইয়া দিলে অ্যাজ্‌বেষ্টস্ ও কাঠের টাইল দুই-ই প্রায় মোটা-মুটি একই রকম দেখিতে হয়। তোমরা পড়িয়াছ, অ্যাস্‌ফাল্টের লেপ দিয়া মেঝে তৈয়ারি হয়—তেমনি ছাদেও অনেক সময়, বিশেষ করিয়া বিদেশে, অ্যাস্‌ফাল্টের ব্যবহার দেখা যায়। স্লেট (slate) এর ছাদও তোমরা নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবে। এই দেশেও কখনও কখনও কোনও গৃহে স্লেটের ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্লেট বেশ মজবুত এবং উহা অনেকদিন পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে।



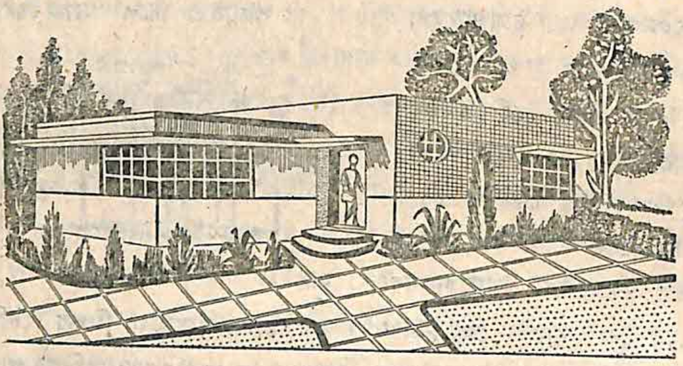
ইস্পাতের কাঠামো

***গৃহের পরিকল্পনা*** —গৃহ নির্মাণের উপাদান বা মাল মসলা ঠিক হইবার পরেই আসে গৃহের পরিকল্পনা। বাড়ীর প্ল্যান বা পরিকল্পনা আর কিছুই নহে—নির্মীয়মাণ গৃহ সম্বন্ধে গৃহস্থের চিন্তা-ধারাটিকে ছবির সাহায্যে রূপায়িত করা মাত্র। ছবির মধ্যে চিন্তাধারার একটি ছাপ পরিষ্কার রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং চিন্তায় কোথাও কিছু অস্বচ্ছ থাকিলে পুনরায় আলোচনার দ্বারা উহাকে স্পষ্ট রূপ দিবার সুযোগ মেলে। গৃহ পরিকল্পনা করিবার চারিটি ধাপ আছে। প্রথমে পেন্সিলের একটি **স্কেচ ড্রইং** করিয়া লওয়া হয়। উহা হইতেই পরে-নির্মাণকার্যে সহায়তা করিবে এইরূপ যথাযথ মাপ জোক ইত্যাদি দিয়া আরও একখানি **নক্‌শা** (working sketch) প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণ লোক কিন্তু এই ড্রইং হইতে বাড়ীটি কিরূপ দেখিতে হইবে তাহা ধারণা করিতে

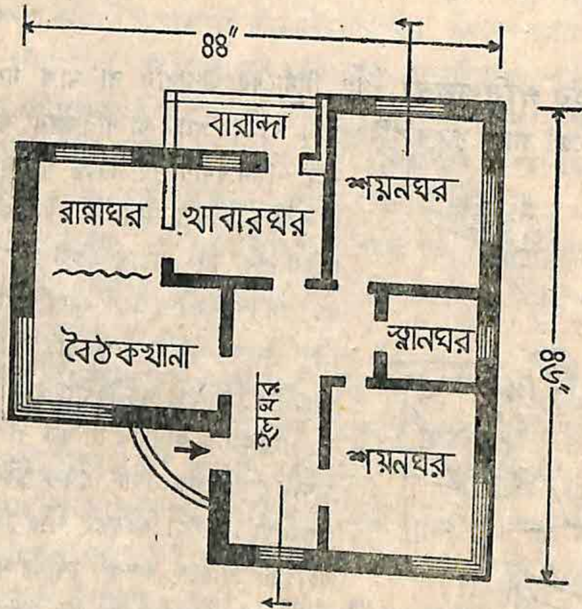


পরিকল্পনা অনুযায়ী নক্সা

পারে না। সুতরাং প্রস্তুত বাড়ীখানির ছবি তুলিলে উহা দেখিতে যেরূপ হইবে, হুবহু সেইরূপ আর একখানি ছবি তৈয়ারি হয়। ইহাই হইল **দর্শনানুপাত ছবি** ( perspective drawing )। তার পরে উহার চারিধারে গাছপালা, বাড়ীর গায়ে আলোছায়ার খেলা ইত্যাদি দেখাইয়া বাড়ীখানি



নীচের নক্শা অনুযায়ী গৃহের দর্শনানুপাত ছবি

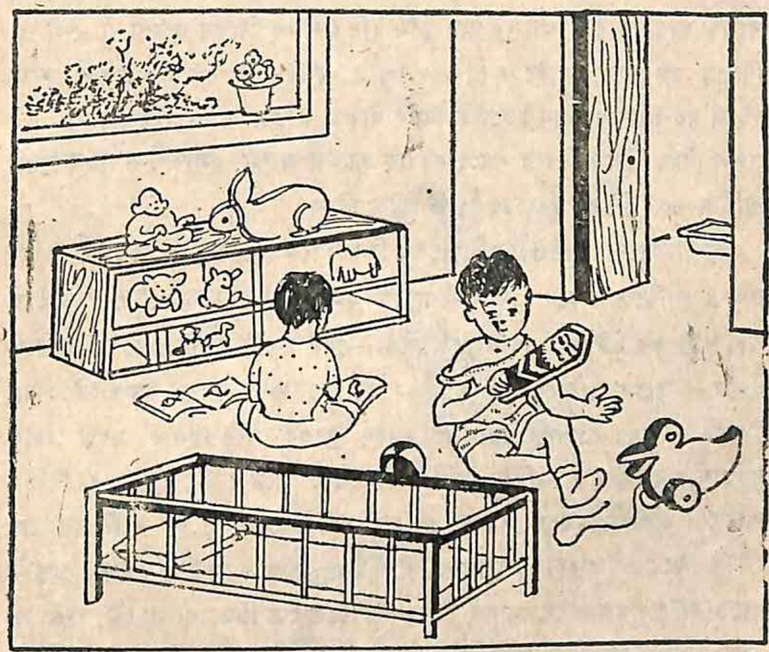



গৃহের নক্শা

তৈয়ারি হইলে, উহা দেখিতে কিরূপ মনোরম হইবে শিল্পী তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না পর পর এই ছবিগুলি তৈয়ারি

হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জানিতে পারিতেছ না তোমার গৃহখানি দেখিতে কিরূপ হইবে। সুতরাং নকশা ব্যতীত গৃহ-নির্মাণের কাজ সম্ভব নহে।

সম্পূর্ণ গৃহখানির নকশা তৈয়ারি হইয়া গেলেই তুমি গৃহের প্রতিটি অংশের বিষয় চিন্তা করিবে। শয়নঘর, বৈঠকখানা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, স্নানের ঘর, খাওয়ার ঘর, সিঁড়ি ও ছাদের প্রবেশপথ, সিঁড়ির রেলিং প্রভৃতি প্রতিটি অংশের সুবিধা-অসুবিধা, সৌন্দর্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে



শিশু-গৃহে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন

আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ ইত্যাদির সাহায্যে তোমার চিন্তাধারাকে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও নির্ভুল করিয়া তুলিবে। সর্বদাই মনে রাখিবে, কোনও অংশ একবার নির্মাণ করা হইয়া গেলে পর কোথাও কোনও পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। গৃহের বিভিন্ন কক্ষ সম্বন্ধে যখন বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে—তখন সেই সেই কক্ষে দেওয়াল, মেঝে, আলো প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থাগুলির বিষয় তুমি প্রথম হইতেই চিন্তা করিবে। যেমন, গৃহে যদি শিশুদের জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই

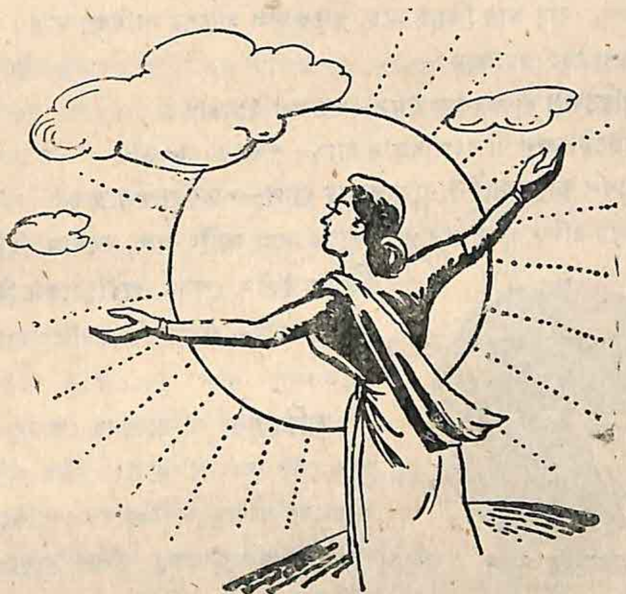
ঘরের মেঝে, দরজা, জানালা, পায়খানা ইত্যাদি যাহাতে শিশুদের বয়স অনুযায়ী, উহাদের উপযোগী করিয়া নির্মিত হয়, তাহার জন্য প্রথম হইতেই পরিকল্পনা করিয়া লইবে। শিশুদের কল, জল, পায়খানা ইত্যাদির ব্যাপারে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সেইগুলির রূপ দিতে হইলে শিশু-ঘরখানিকে সম্পূর্ণ গৃহখানির সঙ্গে একযোগেই চিন্তা করিতে হয়। কোন্ জিনিসের ড্রেন বা পাইপ কোন্ দিকে গেলে গৃহের কোনরূপ সৌন্দর্যহানি হইবে না বা অসুবিধা ঘটিবে না, সেই সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে। তোমার রান্নাঘর, কাপড়-কাচার ঘর বা স্নানের ঘরে তুমি যদি কোনও বিশেষ ব্যবস্থা বা কোনও বিশেষ যন্ত্রপাতি বসাইতে চাও—যেগুলি স্থায়িভাবে বসান আবশ্যক, তাহা হইলে গৃহ-নির্মাণের পূর্ব হইতেই উহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন। এই সকল বিষয় স্থির করিবার সময়ে সর্বদাই **গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও গৃহকার্যের সুবিধা**—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

গৃহ-নির্মাণের আরও একটি বিশেষ দিক আছে। তোমার গৃহখানি বাহির হইতে দেখিতে কিরূপ হইবে—বাহির হইতে গৃহের যে অংশটি দেখা যাইবে উহা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কিনা—সেই কথাটি তোমার চিন্তা করিতে হইবে। গৃহের বাহিরের অংশটিকে অবহেলা করা কখনই সঙ্গত হইবে না, উহাকেও যথেষ্ট প্রাধান্য দিবে। কারণ গৃহের পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই গৃহস্বামীর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। মনে রাখিবে, গৃহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সঙ্গতির উপরেই গৃহের বাহিরের রূপ নির্ভর করে। সুতরাং তোমার গৃহের প্রবেশপথ, সিঁড়ি, প্রাঙ্গন প্রভৃতি প্রত্যেকটির পৃথক ভাবে সৌন্দর্য বিন্যাস করিতে যত চিন্তা ও সময়ই দাও না কেন, তুমি যদি উহাদের প্রত্যেকটিকে প্রত্যেকটির সঙ্গে সমন্বিত করিয়া গৃহের সম্পূর্ণ রূপটি উপলব্ধি করিতে না পার, কিংবা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও অপারগ হও, তাহা হইলে তোমার গৃহ-রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তোমাকে দেখিতে হইবে, তোমার গৃহের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে **সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি** রহিয়াছে কি না—বিভিন্ন অংশগুলি মিলিয়া একই সুর ও ছন্দের সৃষ্টি করিতেছে কি না।

তুমি যদি এই কাজগুলি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে পার, মনে করিবে, গৃহ-নির্মাণে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছ—বাকী অংশ বিশেষজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দিবে।

## বায়ু

***বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা***—আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু বলিতে যথার্থ কি বুঝায় ও উহা কেনই-বা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ কি? খাদ্য গ্রহণ না করিয়া মানুষ হয়ত সপ্তাহ কয়েক বাঁচিতে পারে, জল



বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন

ছাড়াও কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নহে—কিন্তু বায়ুর অভাবে মানুষ কয়েক মিনিটও বাঁচিতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রতি মিনিটে মানুষ প্রায় ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে ও ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় মানুষ বায়ু হইতে **অক্সিজেন** টানিয়া লয় ও নিঃশ্বাস ছাড়িবার সময় দেহ হইতে **কার্বন ডায়কৃসাইড** বাহির করিয়া দেয়। পরিষ্কার মুক্ত বায়ু সেবন করিলে মানুষের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, মন সজীব হয় ও কর্ম-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। আবার অপরপক্ষে, কোনও স্থানের বায়ু যদি দূষিত হয় এবং অনবরত যদি ঐ দূষিত আবহাওয়ায় বসবাস করিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্বাসের সহিত ঐ দূষিত হাওয়া হইতে রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করে এবং মানুষকে ক্রমশঃ

অসুস্থ করিয়া তোলে। ঘনবসতি, মানুষের নিঃশ্বাস-নির্গত কার্বন ডায়ক্সাইড, কলকারখানার ধোঁয়া, ধুলি, নানা রোগ-জীবাণু ও আবর্জনা, হাঁচি, কাশি ইত্যাদি বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে। এই সকল কারণেই কলিকাতার মত বড় বড় শহরে বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া কঠিন এবং ঐ সকল স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে রোগের প্রকোপও পল্লী-অঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশী।

***বায়ুর উপাদান***—বায়ু কি? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে জাগিবে। বায়ু আর কিছুই নহে, কতকগুলি গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। বায়ুর মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায়ঃ—

**অক্সিজেন** বা অম্লজান গ্যাস—শতকরা ২১ ভাগ।

**নাইট্রোজেন** বা যবক্ষারজান গ্যাস—শতকরা ৭৮ ভাগ

**কার্বন ডায়ক্সাইড** বা অঙ্গারাম্ল গ্যাস—শতকরা ·০৪ ভাগ

উপরি-বর্ণিত গ্যাসগুলি ছাড়া বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প, ওজোন, হিলিয়াম, আর্গন, ক্রুপ্টন, জেনন, হাইড্রোজেন (উদ্‌জান গ্যাস), নীয়ন ও মার্স প্রভৃতি গ্যাসগুলি থাকে।



বায়ুর উপাদান

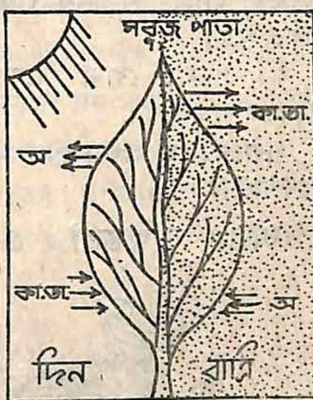
**অক্সিজেন**—অক্সিজেনের কোনও রকম স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নাই। কিন্তু অক্সিজেন আমাদের জীবনে অপরিহার্য। অক্সিজেনের দহনশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন কখনও অবিমিশ্রভাবে থাকে না। অক্সিজেনের সহিত সর্বদাই নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। অক্সিজেনের সহিত যদিও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে, কিন্তু আমাদের ফুসফুস কেবল অক্সিজেনই গ্রহণ করে এবং সেই পরিমাণ কার্বন ডায়ক্সাইড বাহির করিয়া দেয়। নাইট্রোজেন প্রশ্বাসের সহিত যেমন ভিতরে যায়, তেমনি আবার অপরিবর্তিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। নীচের তালিকাটি দেখ:—

| বায়ু | নাইট্রোজেন শতকরা | অক্সিজেন শতকরা | কার্বন ডায়ক্সাইড শতকরা |
|---|---|---|---|
| শ্বাস-গ্রহণকালে | ৭৮ | ২১ | ·০৪ |
| শ্বাস-ত্যাগের সময় | ৭৮ | ১৭ | ৪·০৪ |

অক্সিজেনই রক্তের রক্ত-কণিকাগুলিকে জীবিত রাখে ও রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশে চলাচল করে। এই গ্যাসের সাহায্যেই শরীরের মধ্যে দাহন-ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং এই দাহনক্রিয়ার ফলেই দেহের কিছু দূষিত পদার্থ কার্বন-ডায়ক্সাইড রূপে বাহির হইয়া আসে। এই দাহনকার্য হইতে উদ্ভূত হয় দেহের তাপ। এখন বুঝিতে পারিবে, মৃতের শরীর শীতল হয় কেন। অক্সিজেনের অভাবে দেহের দহনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় বলিয়াই মৃতদেহে তাপ থাকে না।

**নাইট্রোজেন**—নাইট্রোজেন গ্যাসও স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন। অক্সিজেনের দাহন-শক্তির প্রখরতা কমাইবার জন্য উহার সহিত সর্বদাই নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে।

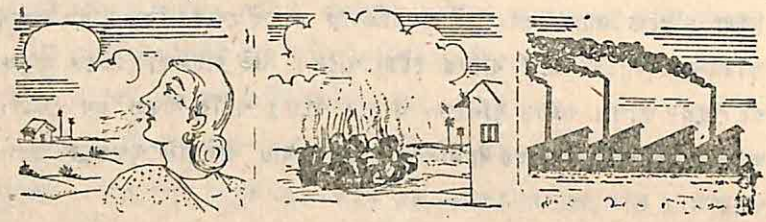
**কার্বন ডায়ক্সাইড**—দেহের মধ্যে দাহনক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কার্বন-ডায়কসাইড নিঃশ্বাসকালে বাহির হইয়া আসে। অধিকমাত্রায় কার্বন-ডায়ক্সাইড প্রাণীদেহের পক্ষে যদিও ক্ষতিকর কিন্তু গাছপালার পক্ষে উহা অপরিহার্য। গাছপালার পাতায় ও ত্বকে যে সবুজ রঞ্জন-পদার্থ আছে, উহার নাম ক্লোরোফিল (chlorophyll)। ঐ ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড টানিয়া লয় এবং কার্বন রাখিয়া অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই কারণেই বায়ুতে কার্বন-ডায়ক্সাইডের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়া যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে গাছপালা প্রাণীদের ন্যায় বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন-ডায়ক্সাইড বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। এইজন্যই রাত্রিকালে গাছ-তলায় শয়ন করা উচিত নহে।



অ-অক্সিজেন, কা. ডা.-কার্বন ডায়ক্সাইড

***বায়ু দূষিত হইবার কারণ***— ১। শ্বাস-ত্যাগের ফলে বায়ুতে কার্বন-ডায়ক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বায়ু দূষিত হয়, সেইজন্য এক ঘরে বা বদ্ধ ঘরে বহুলোক থাকা অনুচিত।

২। নানাপ্রকার জৈব-পদার্থ পচনের ফলে দূষিত গ্যাসের সৃষ্টি করে, তাহা দ্বারাও বায়ু দূষিত হয়।



বায়ু দূষিত হইবার কারণ

৩। কল-কারখানা হইতে ধূম, ধূলিরেণু, নানাপ্রকার গন্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ শহরের গৃহস্থবাড়ীর উনানের ধোঁয়া ইত্যাদির দ্বারা বায়ু দূষিত হয়।

৪। হাঁচি, কাশি ও রাস্তার ধূলার দ্বারা বাহিত রোগ-জীবাণু বায়ু দূষিত করে।

৫। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ হইতে নির্গত তেজস্ক্রিয়-শক্তিদ্বারা বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে একটি লোকের দৈনিক **৩০০০ ঘনফুট** বিশুদ্ধ বায়ুর দরকার।

***ঘরের স্নিগ্ধতা ও স্বাভাবিক উত্তাপ***—ঘরের মধ্যে কার্বন - ডায়ক্সাইডের মাত্রা কখনও এত বাড়ে না, বা অক্সিজেনের মাত্রাও এত কমে না, যাহাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হইয়া মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে। ঘরের মধ্যে কার্বন - ডায়ক্সাইডের মাত্রা যদি কখন শতকরা ৩০ ভাগ হয়, তাহা হইলেই উহা আমাদের অপকার করিতে পারে।



মাথা ধরে, হাই উঠে

কিন্তু দেখা গিয়াছে, কার্বন-ডায়কসাইড ঘরের মধ্যে কখনও ৭%-এর উপরে

উঠিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানমতে কার্বন-ডায়ক্সাইডের মাত্রা যদি শতকরা ৫ ভাগ হয়, তাহা হইলেই বায়ুর ভৌতিক অবস্থার ( physical properties ) পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ুর হাল্কা ভাব ইত্যাদিতে কেঁবল কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বদ্ধ, গরম বা ঘিঞ্জি ঘরের মধ্যে আমাদের মাথা ধরে, হাই উঠে, আমরা ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করি, কখনও কখনও অজ্ঞান হইয়া যাই। কিন্তু ইহার কোনটাই ঘরের মধ্যে অত্যধিক কার্বন-ডায়ক্সাইড অথবা অত্যল্প অক্সিজেনের দরুণ নহে। ঘরের ভিতরকার বায়ুর **অত্যধিক আর্দ্রতা ও উষ্ণতাই** ইহার কারণ। বায়ু-চলাচলের অভাব বশতঃই ঘরের হাওয়া গুমোট ও দূষিত হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও উহা প্রতিকূল হইয়া উঠে। এইজন্য আজকাল ঘরে মুখোমুখী বড় বড় দরজা-জানালা, ভেন্টিলেটার, চিমনি, মেঝেয় ও ছাদে নল ইত্যাদি বসাইয়া নানারকম উপায়ে ঘরে যথাযথ বায়ু-চলাচল ও সঞ্চালনের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। অপরদিকে ঘরের হাওয়াকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য নানারকম রাসায়নিক-দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়। ঘরে বায়ু-সঞ্চালন করাইবার নৈসর্গিক ও কৃত্রিম উপায়গুলির কথা তোমরা পূর্বেই বিশদভাবে পড়িয়াছ। বায়ু-সঞ্চালন করাইবার মূল উদ্দেশ্য বায়ুকে স্নিগ্ধ ও শীতল রাখা। আজকাল বৈদ্যুতিক

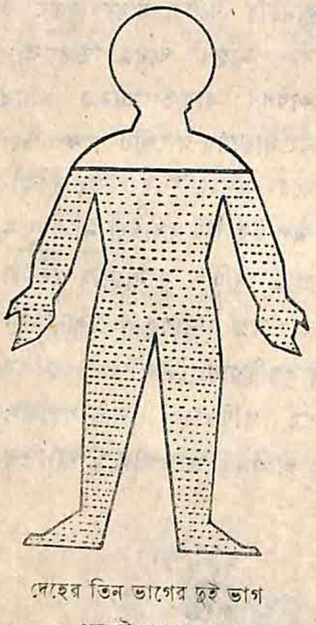


মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ

ক্রিয়ার সাহায্যেও ঘরের ভিতরকার বায়ুর আর্দ্রতা, শৈত্য, উষ্ণতা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকেই বলা হয় **বায়ু-নিয়মন** ( air-conditioning )। বায়ু-নিয়মনের দ্বারা সাধারণতঃ ইহাই বুঝায় যে, ঘরে বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা

৪০—৫০ ভাগ ও উষ্ণতা ৬৮°—৭৯° ফা.-এ থাকিবে। আমাদের কর্ম-ক্ষমতা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে এইরূপ বায়ুই আদর্শ।

কাজেই বুঝিতে পারিলে, বদ্ধ ঘরের অপকারিতা প্রধানতঃ বায়ুর অবিশুদ্ধতায়। এই কারণে খোলা দরজা-জানলা ইত্যাদির সাহায্যে ঘরে মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করানোর উপর স্বাস্থ্যবিদেরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সুতরাং ঘরের দরজা-জানালা ইত্যাদি খোলা রাখিয়াই সর্বদা শয়ন করিবে। বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে ও কর্ম-ক্ষমতা বাড়াইতে বিশেষ সহায়তা করে। মনে রাখিও, **বায়ুই আমাদের প্রাণ**। যে ভাবে যেমন করিয়া পার, সর্বদাই খোলা মাঠ, নদীর তীর, ফুলের বাগান প্রভৃতি স্থান হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু বুক ভরিয়া গ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা করিবে।



দেহের তিন ভাগের দুই ভাগ ওজনই জলের জন্য

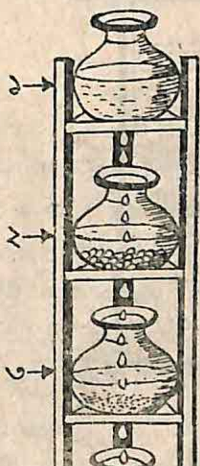
## জল

বায়ুর ন্যায় আমাদের দেহে জলেরও একান্ত প্রয়োজন। ভাবিলে অবাক লাগে যে, ১৫০ পাউণ্ড ওজনের একটি লোকের শরীরে শুধু জলের ওজনই ১০০ পাউণ্ড। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের মোট ওজনের তিন ভাগের দুই ভাগ কেবল জলেরই ওজন।

জল ব্যতীত মানুষের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না; স্নান ইত্যাদির দ্বারা যেমন দেহের বহির্ভাগ ধৌত হয়, তেমনি দেহের মধ্যে স্থিত যন্ত্রগুলিকে জলই পরিষ্কার করে। দেহের এই জলীয়াংশ দ্বারা দেহযন্ত্রের কার্যগুলি সু-নিয়ন্ত্রিত হয়। তোমরা পড়িয়াছ, মল-মূত্র, ঘর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদির সাহায্যে দেহ হইতে দৈনিক প্রায় ২—৩ লিটার জল নিঃসৃত হয় এবং ইহার পরিপূরণের জন্য আমাদের দেহে প্রত্যহই প্রায় ২—৩ লিটার জলের প্রয়োজন। এই পরিমাণ জল প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় হইতে দেহে যাওয়া চাই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা আবশ্যক।

জল কোথা হইতে আসে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কি কি উপায়ে জল পাওয়া যায় এবং মানুষের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অসাবধানতা ইত্যাদির দরুন জল কি ভাবে দূষিত হইয়া পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তোমাদের পূর্বেই বলা হইয়াছে। পানের জল **সচ্ছ, জীবাণু-মুক্ত, সুস্বাদু** ও **ঠাণ্ডা** হওয়া আবশ্যক। নানা উপায়ে জল জীবাণু-মুক্ত করা যায়। শহরের বা গ্রামের যেখানকারই বাসিন্দা হও না কেন, জল নির্বীজন করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির বিষয় তোমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

***জল-বিশোধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া***—**জল ছাঁকা** (filtration): মানুষ অনেক সময়ে একখণ্ড কাপড় দিয়া থিতানো পানীয় জলটুকু ছাঁকিয়া লয়। ইহাতে জলের দৃশ্য-ময়লাগুলি দূর হয় বটে, কিন্তু জল জীবাণুবর্জিত হয় না। এই কারণেই গ্রামদেশে বহু ব্যবহৃত কলস-ফিলটারের জলকেও জীবাণুমুক্ত বলা যায় না এবং পানীয় হিসাবে উহা নিরাপদ নহে।

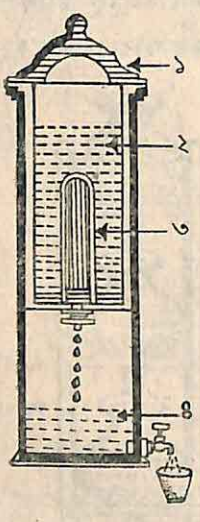



১—দূষিত জল
২—কাঠ-কয়লা
৩—বালি ও কাঁকরের স্তর
৪—পরিস্রুত জল

**কলস-ফিলটার**—কলস-ফিলটারে একখানি কাঠের ফ্রেমে পর পর সচ্ছিদ্র তিনটি কলস বসানো থাকে। সকলের নীচে ঐ ফ্রেমের মধ্যে একটি অছিদ্র কলসও বসানো হয়। এই কলসটিতে ছাঁকা জল সঞ্চিত হয়। সকলের উপরের কলসটিতে অপরিষ্কার আ-ছাঁকা (unfiltered) জল থাকে ও ইহার মুখটি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ময়লা কোনও জিনিস উড়িয়া আসিয়া ভিতরে না পড়িতে পারে। দ্বিতীয় কলসটির তলায় বেশ খানিকটা অংশ কাঠ-কয়লায় ভরা থাকে। উপরের কলস হইতে জল দ্বিতীয় কলসটিতে আসিয়া ঐ কাঠ-কয়লার মধ্য দিয়া চোয়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তৃতীয় কলসটিতে গিয়া পড়ে। তৃতীয় কলসটির তলদেশে একটি কাঁকরের স্তর থাকে, তাহার উপরে আবার একটি বালির স্তর থাকে। এই দুইটি স্তর ভেদ করিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল চতুর্থ কলসটিতে

গিয়া জমে। জলের ময়লা ইত্যাদি প্রথমতঃ কিছু কয়লার স্তরে, দ্বিতীয়তঃ বালির স্তরে এবং তৃতীয়তঃ ঐ কাঁকরের স্তরে ঠেকিয়া যায়। কাজেই দেখিলে কলস-ফিলটারের প্রক্রিয়া একরকম ছাঁকিয়া লওয়ারই নামান্তর। ইহাতে জলের দৃশ্য-দোষগুলি দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু জলের অদৃশ্য-দোষগুলি, অর্থাৎ জীবাণুগুলি যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়। এই কারণেই এই প্রক্রিয়ায় জলশোধন আজকাল অচল।

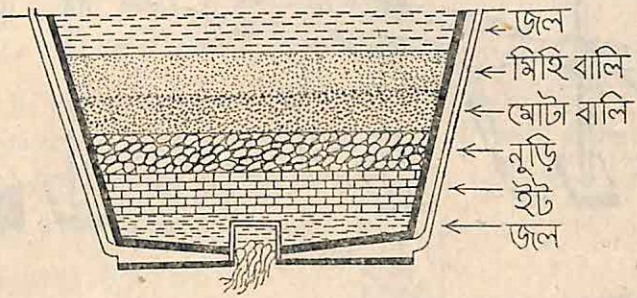
(১) **বার্কফেল্ড ফিলটার**—অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে আজকাল জল ফুটাইয়া পরে 'বার্কফেল্ট ফিলটার বটল'-এর সাহায্যে ছাকিয়া লইতে দেখা যায়। এইভাবে জল ফুটাইয়া আবার বার্কফেল্ট ফিলটারের মধ্যে ছাঁকিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই যন্ত্রটির মধ্যে একটি চীনামাটির (porcelain) নল (Barkfeld candle) থাকে (ছবিতে ৩নং)। এই নলটির গায়ে লোমকূপের ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র সন্নিবেশিত থাকায় উহার মধ্য দিয়া জল অনায়াসে চলিয়া যায়, কিন্তু দূষিত পদার্থগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না বলিয়া আটকাইয়া থাকে। নলের ভিতর দিয়া পরিষ্কার জল নীচে গিয়া জমে। সপ্তাহে দুই একবার চীনামাটির নলটির বাহিরটা একটি নরম ব্রাসের সাহায্যে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করা উচিত। তৈলাক্ত কোন পদার্থ নলটিতে লাগিলে রন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।




১—ঢাকনি
২—অপরিষ্কার জল
৩—চীনামাটির ফিলটার
৪—শোধিত জল

তোমরা জান কলিকাতার মত বড় বড় শহরে সাধারণতঃ ফিলটার করা জলই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কলিকাতার ১৫ মাইল উত্তরে তোমরা 'পলতা'র নাম শুনিয়া থাকিবে। এই পলতা স্টেশনে ভাগীরথীর জল ফিলটার করিবার জন্য সুব্যবস্থিত শোধনাগার আছে। যদি কখনও পলতায় যাও, দেখিবে প্রথমেই নদী হইতে জল পাম্প করিয়া উঠানো হইতেছে। তারপর সেই জলের মধ্যে **ফটকিরি** দিয়া উহাকে দুই তিন দিন ধরিয়া রাখা হয়, ইহাকে বলে **থিতানো** (Sedimentation)। ফটকিরি দেওয়ার দরুন জলের দৃশ্য-ময়লা আস্তে আস্তে

নীচে আসিয়া জমে। এইভাবে থিতানো জলটি খুব সরু ধারায় ফিলটার-বেডের উপরে ফেলা হয়। নীচের ছবিখানিতে দেখ, ফিলটার-বেড কিভাবে তৈয়ার হয় ও উহার বিভিন্ন স্তরে কি কি আছে। প্রথম স্তরে মিহি বালি, তারপরে মাঝারি বালি ও মোটা বালি, উহার নীচে নুড়ি ও তাহার নীচে ফাঁক ফাঁক করিয়া ইট দেওয়া থাকে। থিতানো জল এই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া

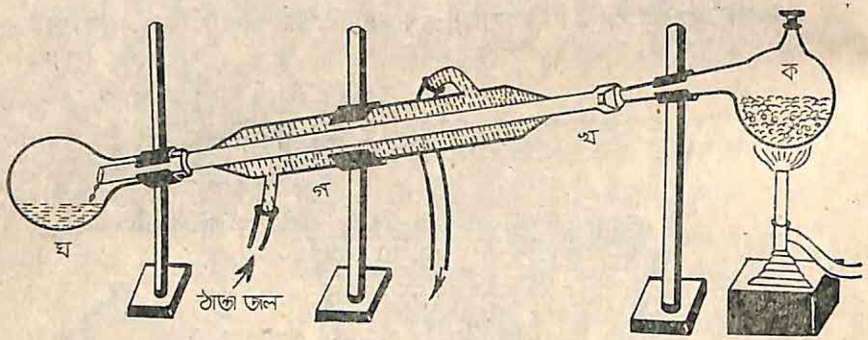



ফিল্টার বেড

নীচে এক বিরাট চৌবাচ্চায় প্রবেশ করে। সেই চৌবাচ্চায় **রাসায়নিক** পদ্ধতিতে ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যে জলকে নির্বীজন করিয়া টালা ট্যাঙ্কে জমা করা হয়। সেখান হইতেই বিভিন্ন নলের সাহায্যে জল শহরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা হয়। পলতা হইতে দৈনিক প্রায় ৮ কোটি গ্যালন জল ফিলটার করিয়া টালা ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়।

এই সঙ্গে এই কথাটিও জানিয়া রাখিবে—জল মিহি বালির উপর দিয়া যাইবার কালে আপনা হইতেই সেখানে একটি মিহি শৈবালস্তরের পর্দা সৃষ্টি করে। এই পর্দাখানিতেই জলের যত দূষিত পদার্থ ও জীবাণু আটকাইয়া থাকে। জলের তলায় উপযুক্ত খাদ্য ও অক্সিজেনের অভাবে জীবাণুগুলি সেখানেই মরিয়া যায়। এই পাতলা শৈবালস্তরটি তৈয়ারি হইতে প্রায় ৪.৫ দিন সময় লাগে, কিন্তু একবার তৈয়ারি হইয়া গেলে উহা প্রায় সাত-আট সপ্তাহ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। এই পাতলা পর্দাটিকে **ফিল্টার বেডের প্রাণ** বলিতে পার। জল থিতানো হয় বলিয়া প্রথম বারেই অনেকটা পরিষ্কৃত হয়, আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, অর্থাৎ 'ক্লোরিন' ইত্যাদি দিয়া ফিল্টার করা জলকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করার ফলে উহা আদর্শ পানীয় হইয়া উঠে।

(২) **চোলাই-করণ** ( Distillation )—কোনও একটি পাত্রের জলকে ফুটাইয়া, উহাকে বাষ্পাকারে পরিবর্তিত করিয়া, পুনরায় বাষ্পকে জলে রূপান্তরিত করিলে উহা জীবাণুশূন্য হয় এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়




চোলাই-করণ

**চোলাইকরণ**। উপরের ছবিটিতে কিভাবে জলকে বাষ্পে পরিবর্তিত করিয়া আবার জলে রূপান্তরিত করা হয় তাহাই দেখানো হইতেছে।

(ক) পাত্রের মধ্যে অপরিষ্কৃত জল ফুটিতেছে,

(খ) ফুটন্ত জলের বাষ্প নলের মধ্য দিয়া যাইতেছে,

(গ) বাক্সটির মধ্যে ঠাণ্ডা জলের ধারা আসিতেছে,

(ঘ) নলস্থিত বাষ্প শৈত্যের সংস্পর্শে আসিয়া জমিয়া যাইতেছে ও জল হইয়া পাত্রে পড়িতেছে।



জল ফুটাইলে জীবাণু মরিয়া যায়

(৩) **নির্বীজন** (Sterilization)—ছাঁকা বা থিতানো জলকে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া জীবাণুমুক্ত করিবার নামই **নির্বীজন** (Sterilization)। অগ্নিতাপে ফুটাইলে জলের প্রায় সকল জীবাণু মরিয়া যায়।

(৪) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**—পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট, আয়োডিন বা চুন প্রভৃতি মিশাইলেও জল জীবাণুমুক্ত হয়

কিন্তু সে জলের স্বাদ ঐ সকল দ্রব্যগুণে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া যায় ও উহা পান করা যায় না।

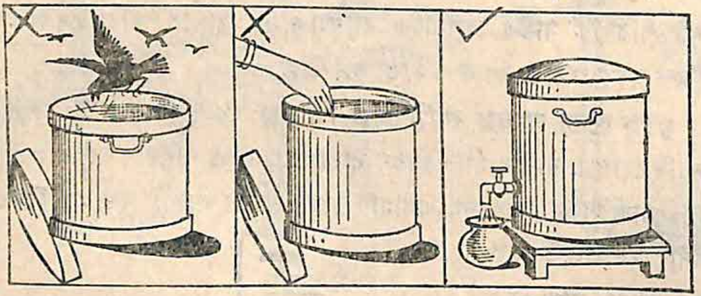
কাজেই তোমরা দেখিতেছ—জল নির্বীজনের যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে জল প্রথমে সামান্য ফটকিরি দিয়া কিছুক্ষণ থিতাইয়া পরে ভাল ভাবে ছাঁকিয়া **১৫—২০ মিনিট ফুটাইয়া লওয়াই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক।** ফুটানোর পর জলে সামান্য পরিমাণ কর্পূর ফেলিয়া দাও এবং একটি পরিষ্কার মাটির কলসীতে রাখিয়া দাও, দেখিবে পরদিন সে জল পান করিতে বড়ই সুস্বাদু, সুগন্ধ ও ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

***গৃহে জল সঞ্চয় করিবার নিয়ম***—গৃহে রান্না, খাওয়া, তরকারি ইত্যাদি ধোওয়া, ঘর মোছা—এইরূপ নানাকাজে যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ চৌবাচ্চা, লোহার ড্রাম, মাটির জালা, বড় বড় পিতলের কলসী ইত্যাদিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। এই সকল জলও যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জলের পাত্রটি আ-ঢাকা অবস্থায় খোলা পড়িয়া থাকে এবং ধূলা-বালি প্রভৃতি ঘরের নানা আবর্জনা ও কীটপতঙ্গাদি উড়িয়া উহার মধ্যে পড়িতেছে। ঢাকা দিবার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকই উদাসীন। আবার অনেক গৃহে দেখা যায়, ঢাকা দিবার তেমন কোনও নিয়মই নাই। গৃহে যে জল সঞ্চয় করিবে, সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে উহা যেন **ঢাকা** থাকে। যে-পাত্রে জল সঞ্চয় করিবে, দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে সেই পাত্র **প্রতিদিন পরিষ্কার** করা হয়—অন্যথায় পাত্রের ময়লায় জলও অপরিষ্কৃত হইতে পারে। যে আধারে জল সঞ্চয় করিবে, সেই আধার নির্বাচন



প্রত্যহ পাত্রটি পরিষ্কার করিবে

সম্বন্ধেও বিশেষ বিবেচনা করিবে। পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ **মাটির কুঁজো** বা **কলসী** ইত্যাদিই শ্রেয়। মাটির পাত্রে জল শীতল থাকে এবং ধাতু ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া উহার দূষিত হইবার কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মাটির পাত্রও কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করা আবশ্যক। যে পাত্রেই জল সঞ্চয় কর না কেন, **বাসী জল** ফেলিয়া প্রত্যহ পাত্রটি পরিষ্কার করিয়া উহাতে নূতন জল ধরিবে। পানীয় জলের পাত্রের মুখ সর্বদাই ঢাকিয়া



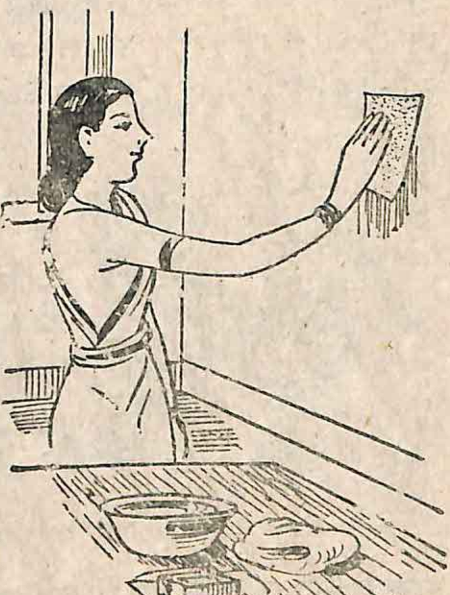
রাখিবে এবং উহাতে কখনই **আ-ধোয়া হাত** বা **অপরিষ্কার বাসন-কোসনাদি** ডুবাইবে না। এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে দেখিবে তোমার গৃহ-সঞ্চিত জল দূষিত হইবে না এবং রোগের আশঙ্কাও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

# *দ্বিতীয় অধ্যায়*

## গৃহ-সজ্জা

***গৃহ-সজ্জার প্রয়োজনীয়তা***—মানুষের জীবনে গৃহ-প্রসাধনের প্রয়োজন কতখানি তোমরা পড়িয়াছ। সুরুচিপূর্ণ সুন্দর গৃহশ্রী মানুষের জীবনের রূপ আমূল বদলাইয়া দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়াছ নিশ্চয়ই, অপরিষ্কার অগোছালো ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো আসবাবপত্রের প্রতি চাহিয়া নিমিষেই যেন মন অস্বস্তি বোধ করে। সুসজ্জিত-গৃহ কেবল যে শারীরিক আরামের কারণ তাহা নহে, উহা মানুষের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গৃহ-সজ্জায় পর্দা সন্নিবেশ, আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থান, কার্পেট ব্যবহার, পুষ্প-বিন্যাস প্রভৃতি প্রতিটি কাজে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির প্রয়োজন। **এই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি মানুষের স্বভাবকে সুশৃঙ্খল ও সুষম করিয়া তোলে।**

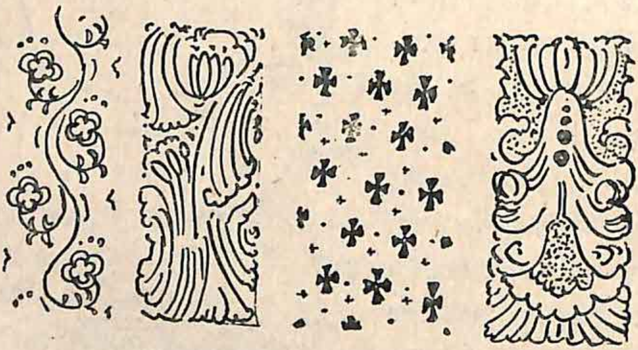
**ঘরের দেওয়াল**—দেওয়াল ঘরের একটি প্রধান অংশ। দেওয়ালকে বাদ দিয়া ঘরের পরিকল্পনা করা যায় না। দেওয়ালকে যদি ঘরের পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ দেওয়ালকে পিছনে রাখিয়া দেওয়ালের বুকে যদি ঘরের আসবাবপত্র, পর্দা ইত্যাদির বিচিত্র বিন্যাসের কল্পনা করা যায়, তবে দেওয়ালের প্রাধান্য অনেক কমিয়া যায় বটে, আবার একদিকে দেওয়ালই সর্বপ্রধান হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ দেওয়ালের যেমন রূপ ও রঙ হইবে, সেই অনুযায়ী ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলির রূপের ঔজ্জ্বল্য কমিবে বা বাড়িবে। সুতরাং দেওয়ালের রূপ ও রঙের পরিবর্তনের উপরেই ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলির ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করিতেছে। অতএব দেওয়াল প্রচ্ছদপট হইলেও উহাকে উপেক্ষা করা যায় না। বরঞ্চ দেওয়ালকে সজ্জিত করিতে হইলেও যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ দেওয়ালের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ঘরের দেওয়াল সাজাইতে হইলে প্রথমেই জানিয়া লইবে—ঘরগুলির আয়তন ছোট কি বড়, ঘরগুলিতে যথেষ্ট আলো আছে কিংবা উহা উহা অন্ধকার, উহাদের মধ্যে ভাঙাচোরা কিছু আছে কি না যাহা তোমার সজ্জা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, ঘরখানির প্রয়োজনই বা কতটুকু, উহা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে কিংবা . অতিথি-অভ্যাগত আসিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইবার পরই উহার প্রয়োজন ফুরাইবে। এই তথ্যগুলির উপরই দেওয়ালের রঙ, নক্সা ইত্যাদির নির্বাচন নির্ভর করিবে। যেমন—খাবার ঘর, প্রবেশপথ ইত্যাদি যে সকল ঘর বা স্থান তুমি অল্পক্ষণের জন্য ব্যবহার করিবে, সেই সকল দেওয়ালের রঙে বা সজ্জায় যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য থাকিতে পারে। কিন্তু বৈঠকখানা, শয়নঘর প্রভৃতি যে সকল ঘরে তুমি অধিক্ষণ থাকিবে



খুঁতগুলি দূর করিবার চেষ্টা

বা তোমার মন কিছুটা বিশ্রাম খুঁজিবে, সেই ঘরের দেওয়াল সজ্জায় তুমি ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তে **শান্তি ও স্নিগ্ধতা** ফুটাইবার চেষ্টা করিবে—যাহাতে দেওয়ালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মানুষের কর্ম-ক্লান্ত মন সহজেই স্বস্তি বোধ করে। কাজেই দেখিতেছ, বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য দ্বারাই সেই কক্ষের দেওয়ালের সজ্জা নির্ণীত হয়।

***দেওয়াল-সজ্জা***—প্রথমেই দেখিয়া লইবে দেওয়ালের কোথাও ফাটল, ভাঙা, ফাঁক, তৈলাক্ত দাগ প্রভৃতি আছে কি না। যতদূর সম্ভব—স্যাণ্ড-পেপার, চুন, প্লাস্টার, সাবানজল ইত্যাদির সাহায্যে ঐ খুঁতগুলি দূর করিয়া সজ্জায় মনোনিবেশ করিবে। প্রথমতঃ দেওয়ালখানি পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে। ইহার পরেই সজ্জা। পশ্চিমের দেশগুলিতে এবং আমাদের দেশের কোনও শীতপ্রধান অঞ্চলে দেওয়ালের উপর নানা নক্‌শা-করা **দেওয়াল কাগজ** ( wall paper ) আঁটিয়া দেওয়া হয়। দেওয়াল কাগজ বিভিন্ন রঙের ও নক্‌শার পাওয়া যায়—কোনটিতে কেবল বিন্দু বিন্দু চিহ্ন, কোনটিতে ফুল আঁকা কোনটিতে বা কেবল জ্যামিতিক নক্‌শা, কোনটিতে আবার বিভিন্ন দৃশ্য ইত্যাদি দেখা যায়। দেওয়াল-

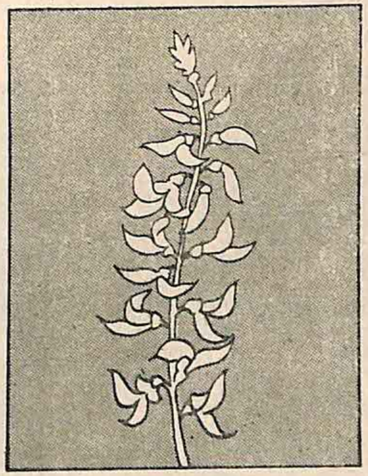


দেওয়াল-কাগজের বিভিন্ন নক্‌শা

কাগজ দেওয়ালে লাগাইবার পূর্বে দেওয়ালে ফেলিয়া দেখিয়া লইবে তোমার রুচি ও ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রাদির সহিত উহা মিলিয়াছে কি না।

দেওয়ালে **তেলের রঙের ছবি** ( fresco) আঁকিয়া অনেক গৃহস্থ তাঁহাদের ঘরগুলিকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রাচীর চিত্রের চলন আমাদের দেশেই অধিক। ঘরের আয়তন, প্রয়োজন ও অন্যান্য সজ্জা প্রভৃতির

সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া দেওয়ালে ছবি আঁকিতে পারিলে কক্ষখানির আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম হইয়া উঠে। দেওয়াল সজ্জায় দেওয়ালের গায়ে একটি সহজ সরল রেখারও মূল্য অনেকখানি। ঠিকমত আঁকিতে পারিলে বা রঙ ইত্যাদি ফুটাইতে পারিলে কয়েকটি রেখার সাহায্যেই ঘরের আয়তন ছোট-বড় করিয়া দেখানো যায় এবং খালি দেওয়ালের কাঠিন্যকেও কিছু পরিমাণে মোলায়েম করা যায়। কেবলমাত্র হাতের সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কন যেমন দেওয়াল সজ্জায় একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে, তেমনি **চিত্র-ফলকের** ( stencil ) সাহায্যে দেওয়ালে চিত্রসন্নিবেশ করাকেও দেওয়াল সজ্জা হইতে বাদ দেওয়া চলে না। চিত্রাঙ্কনের হাত তত নিপুণ না হইলেও এই চিত্র-ফলকের সাহায্যে অনেকে দেওয়ালে অপেক্ষাকৃত সহজ নক্শা ইত্যাদি আঁকিতে পারে। দেওয়ালের গায়ে এই চিত্রাঙ্কনের রীতি আমাদের দেশে বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তখনকার দিনে ধনী গৃহস্বামী দেওয়ালের গায়ে নানারকম ছবি আঁকিয়া গৃহকে মনোরম করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন।



কক্ষের আবহাওয়া মনোরম হইয়া উঠে

দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত চিত্রের সামঞ্জস্য ও সহজ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদন নহে, বিভিন্ন ঘরের **প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করাই চিত্রগুলির প্রধানতম লক্ষ্য।** কাজেই দেওয়ালের গায়ে তুমি খালি হাতে বা চিত্র ফলকের সাহায্যে যে-ভাবেই ছবি আঁক না কেন, মানুষের মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের দ্বারাই তোমার চিত্রের সার্থকতা নিণীত হইবে।

দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, যদি **আলপনার** কথা বাদ যায়। আলপনার সাহায্যে দেওয়াল সাজাইবার রীতিও বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যদি কখনও সাঁওতাল পরগণায়

যাও, দেখিবে সেখানকার অধিবাসীরা আজও আলপনা আঁকিয়া দেওয়াল সাজাইবার প্রয়াস পায়। দেখিবে মাটির বুকে চাউলের গুঁড়ার সাদা আলপনা কতই মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক গৃহ-স্বামী দেওয়ালে বিভিন্ন বিষয়ের **ছবি ঝুলাইয়াও** দেওয়ালকে সজ্জিত করিয়া তোলেন। প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী দেওয়ালের গায়ে যথাযথ চিত্র-সন্নিবেশ করাও গৃহ-সজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ।



মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিই চিত্রের লক্ষ্য

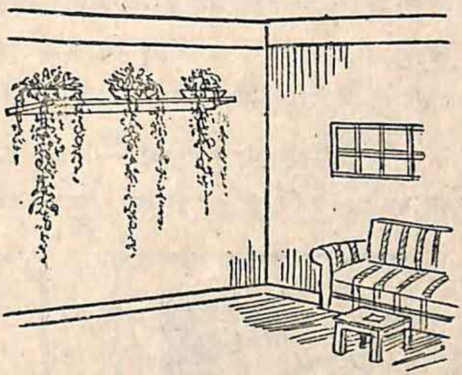
উপরি-বর্ণিত দেওয়াল সজ্জার যদি কোনও উপকরণই নিতান্ত সংগ্রহ করা না যায়, তাহা হইলে **লতা-পাতা** ইত্যাদিও ঘরের দেওয়াল সাজাইবার **উপকরণ হিসাবে** ব্যবহার করা যাইতে পারে। বহু লতা আছে, যাহা কেবল জলের মধ্যেই বাড়িয়া থাকে। যে সকল ঘরের মধ্যে দেওয়ালে কার্ণিস আছে বা তাকের মতন ভেটি লেটারের মধ্যে খাঁজ কাটা আছে—অনেক গৃহস্বামীকে উহার উপর একটি পাত্রে সামান্য জলসহ ঐ লতা ঝুলাইয়া দিতে দেখা যায়। ঈষৎ ফিকে নীল রঙ অথবা সাদা দেওয়ালের



মনে প্রভাব বিস্তারেই চিত্রের সার্থকতা

গায়ে ঝুলিয়া-পড়া সবুজ লতাটি ঘরের পরিবেশে একটি শ্যামল-স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়।

*দেওয়ালের গায়ে চিত্র-সন্নিবেশ*—অনেক স্থানেই দেখা যায়, গৃহস্বামী বহুবিধ চিত্রে দেওয়াল সজ্জিত করেন। চিত্র-সন্নিবেশেও **রুচি** ও **মাত্রাজ্ঞানের** একান্ত প্রয়োজন। চিত্র-নির্বাচনে দেওয়ালের **আকার** ও **আয়তনের** প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ছোট, বড়, লম্বা, চৌকো—নানা আকারের ও বিচিত্র রঙের বিভিন্ন ছবি দিয়া যদি দেওয়াল সজ্জিত কর, তাহা হইলে উহা দেখিতে রুচির দিক হইতে অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে। দেওয়ালের আকার ও রঙের সহিত চিত্রের সংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে, যাহাতে চিত্রের বাহুল্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পরিবর্তে সৌন্দর্য-হানি না ঘটায়। চিত্র-সন্নিবেশ করিবার সময় কোন্ কক্ষের কি **প্রয়োজন** ও **উদ্দেশ্য**, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যেমন, ছোটদের পাঠ-কক্ষের দেওয়ালে যদি চিত্র-সন্নিবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ বিখ্যাত আবিষ্কারক, যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত কবি বা দেশ-প্রেমিকের ছবি থাকাই যুক্তিযুক্ত, যাহাতে ঐ সকল ছবি হইতে ছোটরা উহাদের জীবন গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা পায়। তোমরা ঘরের দেওয়ালের ছবি কিনিবার সময় এমন ছবি কিনিবে—তোমার নিকট যাহার বিশেষ কোনও **অর্থ** আছে। কোন লোক ভাল বলিয়াছে অথচ তোমার কাছে উহার কোনও অর্থ নাই, এইরূপ ছবি



স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়



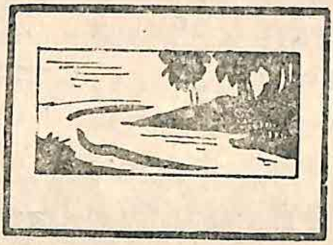
এক পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট করিতে পার

বর্জন করিবে। **বিষয়ে, রঙে** এবং **আকারে** এক—এইরূপ ছোট ছোট ছবিগুলি একসঙ্গে করিয়া দেওয়ালের এক পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট করিতে পার। তবে অবশ্য ছোট ছোট অনেকগুলি ছবি ব্যবহার করা অপেক্ষা একখানি বড় ছবির ব্যবহার অনেক সূক্ষ্ম-সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয়। প্রত্যেক দেওয়ালে দুইখানি ছোট ছবি অপেক্ষা একটি দেওয়ালে একখানি বড় ছবি ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। দৃশ্যাবলীর ছবিগুলি সাধারণতঃ সকলেই পছন্দ করিয়া থাকে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি! অনেকের আবার ঐতিহাসিক চিত্রা-বলীই পছন্দ। সুতরাং তুমি তোমার রুচি অনুযায়ী ছবি নির্বাচন করিবে।

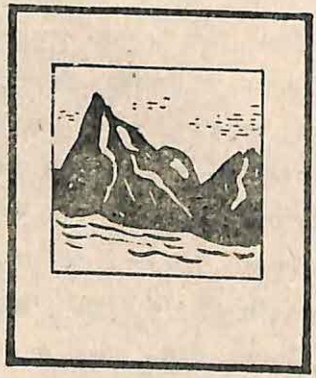
***চিত্র-নির্বাচনে ফ্রেম***—চিত্র-সন্নিবেশ করিবার সময় চিত্রখানির ফ্রেমের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অনেক সময় দেখা যায় ফ্রেমের **অসামঞ্জস্য**

√ 

পাশাপাশি করিয়া বসানো ছবিতে পাশের বর্ডার উপরের বর্ডার হইতে চওড়া হইবে; নীচের বর্ডার সর্বাপেক্ষা চওড়া হইবে।

 ×

পাশাপাশি করিয়া বসানো ছবি, কিন্তু উপরের ও পাশের বর্ডার সামঞ্জস্যহীন মাত্রাজ্ঞানের অভাব সূচিত করে।

√ 

সোজা করিয়া বসানো ছবিতে উপরের বর্ডার পাশের বর্ডার অপেক্ষা চওড়া হইবে।

 ×

উপরের বর্ডার পাশের বর্ডার অপেক্ষা সরু—ইহা মাত্রাজ্ঞানের অভাব।

**ও অসমতার** জন্য ছবির সৌন্দর্য অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই লক্ষ্য

রাখিবে ছবি ও ছবির ফ্রেম—এই-দুইয়ের মধ্যে যেন যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি থাকে। ছবির রঙ ও ছবির ফ্রেমের রঙ—এই-দুইয়ের মধ্যেও যথেষ্ট মিল থাকা প্রয়োজন।

## কার্পেট

গৃহ-সজ্জায় কার্পেট বা গালিচা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। ধনী গৃহস্বামী কার্পেট দ্বারা মেঝে আবৃত করেন এবং কার্পেটগুলিও উহাদের সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে ও বিচিত্র বর্ণসম্ভারে গৃহস্বামীর ঘরখানিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা কতখানি বা উহার ব্যবহারই বা কতরূপ হইতে পারে উহা তোমরা পড়িয়াছ। কার্পেট আমাদের প্রাচ্যেরই অতি প্রাচীন জিনিস। মেসোপটেমিয়া, মিশর, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলেই হয়ত উহার প্রথম সৃষ্টি। তখনকার দিনে, যখন কলের আমদানী হয় নাই, কার্পেট একটি দুষ্প্রাপ্য মহার্ঘ বস্তু হিসাবেই পরিগণিত হইত। তখনকার দিনে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া নানা রঙের সহিত রঙ মিলাইয়া অসীম ধৈর্য সহকারে একটির পর একটি গ্রন্থি দিয়া হাতেই কার্পেট বুনিয়া যাইত। হাতে-বোনা এই সকল কার্পেট একদিকে যেমন মজবুত হইত—অপরদিকে নানা বর্ণে ও নক্শায় উহা আবার তেমনি বিচিত্র ও মনোরম হইয়া উঠিত।

***র‍্যাগ ও কার্পেট***—ক্রমে কলের আমদানী হয়। প্রাচ্যের এই কার্পেটগুলির অনুকরণে প্রতীচ্যের মানুষ উহাদের জীবনের দ্রুতগতির সহিত তাল রাখিয়া নূতন নূতন **কার্পেট বা র‍্যাগ** ( rug ) কলেই বুনিয়া লইতে আরম্ভ করে। র‍্যাগও মেঝেয় পাতিবার একপ্রকার পশমের আস্তরণ। কলে-বোনা র‍্যাগ বা কার্পেটের মধ্যে কেবলমাত্র আকার ও আয়তন ছাড়া আর বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। চারিধারে বোনা র‍্যাগ একটি সুসম্পূর্ণ জিনিস। নিতান্ত ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া র‍্যাগ সম্পূর্ণ ঘরের মাপেও পাওয়া যায়। কার্পেটের বোনা নকশা অনেক ক্ষেত্রে র‍্যাগের অনুরূপও হইতে পারে, কিন্তু কার্পেট সাধারণতঃ অনেক দীর্ঘ হয় ও চোঙাকারে গুটানো থাকে। কাপড়ের মত কাটিয়াই উহা বিক্রয় করা হয়। কার্পেট ২২½ ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৩০ ফুট পর্যন্ত চওড়া দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান-বিশেষে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রস্থের কার্পেট ব্যবহৃত হয়। কার্পেট কাটিয়া লইয়া জুড়িয়া দিবার বিভিন্ন উপায় আছে ; এবং জোড়-মুখ যাহাতে দেখা না যায় সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পশম ছাড়াও মিশ্রিত পশম, পাট, সূতা প্রভৃতি বিভিন্ন জমিনেরও কার্পেট তৈয়ারি হইতে পারে। এই কার্পেটগুলি যদিও ততটা মজবুত ও স্থায়ী হয় না কিন্তু মূল্যের দিক হইতে উহা অনেক সস্তা। সাধারণ বহু কাজেই উহা ব্যবহৃত হয় এবং উহাকে সহজেই পরিষ্কার করা যায়। সূতার কার্পেটের চল ক্রমেই বাড়িতেছে। আজকাল পাটেরও বহু সূক্ষ্ম কারুকার্য-বিশিষ্ট কার্পেট দেখা যায়। ইহার দামও পশমের কার্পেট অপেক্ষা অনেক কম। পশম ও পাট মিশাইয়া আজকাল যে একরকম কার্পেট বোনা হয়, স্থায়িত্ব, রঙের ঔজ্জ্বল্য ও পরিষ্কার করার দিক দিয়া প্রায় অন্যান্য সকল কার্পেট অপেক্ষাই উহা উৎকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। পশমের কার্পেট মূল্যবান জিনিস এবং নক্শার চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্যে উহা নিঃসন্দেহে মনোরম কিন্তু পশম বলিয়াই উহা যত্ন সহকারে ও সন্তর্পণে ব্যবহার করিতে হয়।

***বিভিন্ন রকমের কার্পেট***—কলে কার্পেট বোনার রেওয়াজের পর হইতেই উইল্টন ( Wilton ), এক্সমিনস্টার ( Axminister ), ভেলভেট ( Velvet ), ইনগ্রেন ( Ingrain ), চেনিল ( Chenille ), লক উইভ (.Lock Weave ) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্পেটের চল বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের উইলটন শহরের নাম হইতেই উইলটন কার্পেটের নামকরণ হইয়াছে। উইলটন কার্পেট অত্যন্ত মজবুত। পশমের কিছুটা অংশ কার্পেটের পিছনের দিকে লইয়া গিয়া বুনিয়া দিবার দরুন উহার প্রতিরোধ-ক্ষমতাও কিছু বেশী। এক্সমিনসটার কার্পেটের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সাধারণতঃ এই কার্পেটের বুননে অসংখ্য রঙ দেখা যায় এবং অসংখ্য রঙ আছে বলিয়াই ইহার বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতাও চমৎকার। ইনগ্রেন কার্পেটের সোজা ও উল্টো দিক বলিয়া কিছু নাই—ইহার দুই দিকই ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই কার্পেটের বুননের ও রঙ সাজাইবার এমনই বিশেষত্ব যে, একদিককার রঙ কার্পেটের অন্য পিঠে বিভিন্ন মূর্তি বা ছবির রঙে রূপায়িত হয়। 'চেনিল' একটি ফরাসী শব্দ। চেনিলের অর্থ গুটিপোকা ; এই কার্পেট দেখিলে মনে হইবে, যেন V-এর আকারে ছোট ছোট কম্বলের টুকরা কাটিয়া লইয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার নক্শা হঠাৎ দেখিলে গুটিপোকার কথাই মনে করাইয়া দেয়। 'লক উইভ' কার্পেটের বিশেষত্ব এই—উহা যেদিকেই কাট না কেন—উলের বোনার ন্যায় উহার খুলিয়া আসার সম্ভাবনা নাই।

***প্রাচ্যের কার্পেট***—প্রাচ্যের কার্পেটগুলিকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহা প্রথমতঃ হাতে-বোনা। হাতে-বোনা বলিয়াই ইহা যেমন নিখুঁত তেমনই মজবুত। স্থায়িত্বের দিক দিয়া উহা অন্যান্য সকল কার্পেটকেই ছাড়াইয়া যায়।

এই কার্পেটগুলির অফুরন্ত রঙ ও নকশার দিকে যতই তাকানো যায়, ততই যেন ইহার গভীরতা ও বিচিত্রতায় মন মুগ্ধ হয়। গৃহসজ্জায় প্রাচ্যের এই কার্পেটগুলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেই এখনও সমানভাবে আদৃত হয়। কলে-বোনা কোনও কার্পেটই ইহার স্থান পূরণ করিতে পারে না। প্রাচ্যে কার্পেট বা র‍্যাগ ( rug ) বলিতে আমরা অনেক সময় **নামদার** উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু নামদার মধ্যে প্রাচ্যের আসল কার্পেটের ন্যায় হাতে-দেওয়া অসংখ্য গ্রন্থি-গুলি থাকে না। প্রাচ্যের কার্পেট বলিতে প্রধানতঃ **পার্শিয়ান** কার্পেটগুলিকেই বুঝায়। পার্শিয়ান কার্পেটগুলি উহাদের রঙ, নক্সা ও শিল্পনৈপুণ্যে অন্যান্য সকল কার্পেটকেই ছাড়াইয়া যায়। তুরস্ক ( Turkey ). ককেশাস ( Caucassus ), বেলুচিস্তান, চায়না প্রভৃতি দেশের কার্পেটও বিখ্যাত। আমাদের দেশের কার্পেটও নিঃসন্দেহে মনোরম। কিন্তু পার্শিয়ান কার্পেটের ঔজ্জ্বল্যের কাছে যেন অপরগুলি ম্লান হইয়া পড়ে!


জীবন-তরু

***পার্শিয়ান কার্পেটের নক্সা***—পার্শিয়ান আর্ট বা শিল্পকলার মধ্যে পার্শিয়ান কার্পেটগুলিও একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পার্শিয়ান কার্পেট-গুলির বিভিন্ন নক্সার মধ্যে প্রায়ই কোন না কোনও অর্থ নিহিত থাকে। যেমন, পার্শিয়ান কার্পেট 'জীবনতরু'র ( Tree of Life ) ছবি। ইহা আর কিছুই নহে—ছোট-খাটো ডালপালায়-ভরা জীবনের প্রতীক একটি ছোট চারাগাছ মাত্র। এই চারাগাছের নক্সা আজ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়—কিন্তু ইহা প্রথমে আসে সিরিয়া হইতেই। আবার অনেক কার্পেট দেখিবে, একজোড়া পাখী দুইটি ডালে মুখামুখি বসিয়া আছে। এই পাখীগুলি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী পাখী-রূপেই পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। পার্শিয়ান কার্পেটে এইরূপ প্রায় প্রতি চিত্রের পিছনেই কোনও না-কোনও কাহিনী থাকে। প্রাচ্যের এই বিভিন্ন নক্সাযুক্ত কার্পেটের অনুকরণেই আজ প্রতীচ্যের লোকেরা কলে কার্পেট

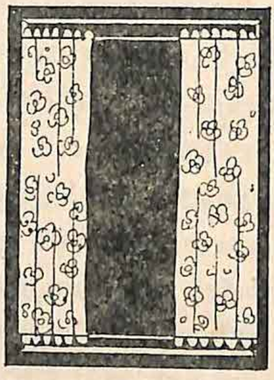
বুনিতেছে। এই সকল অর্থযুক্ত ছবি ছাড়াও আবার অনেক সময় কার্পেটে বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নক্সা ইত্যাদিও দেখা যায়।

## পর্দা

***পর্দা-সংযোজনার নিয়ম***—গৃহ-প্রসাধনে পর্দা একটি প্রধান উপকরণ। পর্দা-সংযোজনার রীতিগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

কোনও কক্ষে পর্দা-সন্নিবেশ করিতে হইলে প্রথমেই জানিয়া লইবে, সেই কক্ষটি কোন্ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইবে, উহার অন্যান্য জিনিসগুলি সাজাইবার পরিকল্পনা কি, গৃহস্বামীর রুচিই বা কিরূপ। কক্ষটির আয়তন, দেওয়ালের রঙ, দরজা-জানালাগুলির আকার-প্রকার কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত তথ্যগুলিই তোমাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। তারপর ঘরের রঙ, আয়তন, দরজা-জানালা প্রভৃতির মাপ—এই সমস্তগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তোমাকে পর্দা রচনা করিতে হইবে। সকল রকম জানালায় একই রকম পর্দা সংযোজন করা যায় না। লম্বা, চৌকা, ছোট, বড়—বিভিন্ন জানালায় বিভিন্ন আকার ও আয়তন অনুযায়ী পর্দার ব্যবস্থা করিতে হয়। পর্দা রচনা করিতে সর্বদাই মাত্রা ও

ক



খ

সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। **মাত্রা ও সমন্বয়ের** অভাবে পর্দা বেমানান হইয়া পড়ে। (ক)-চিত্রে লক্ষ্য করিলেই দেখিবে—পর্দা বাঁকা ভাবে কাটিয়া জানালার আয়তন ও পর্দার আকার উভয়ের মধ্যে একটি সহজ সমন্বয় রক্ষা করিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে। (খ)-চিত্রখানিতে দেখ—পর্দা সোজা করিয়া কাটা, তথাপি জানালার আয়তনের সহিত সামঞ্জস্য থাকাতে উহা বেমানান হয় নাই। কিন্তু অপরপক্ষে (গ) ও (ঘ)-চিত্রে দেখ—পর্দা-রচনায় যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা

সূচিত হইলেও এবং নূতনত্বের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও, সমন্বয় ও সহজ মাত্রা-জ্ঞানের অভাবে দুইখানি পর্দাই অত্যন্ত বেমানান হইয়াছে। (ঘ)—পর্দাখানি অযথা অনাবশ্যক আড়ম্বরের পরিচায়ক হওয়াতে উহার সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে।

গ 

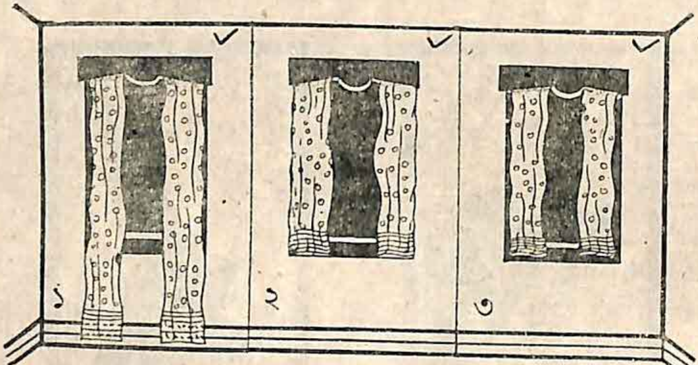
 ঘ

পর্দা রচনা করিবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে লক্ষ্য করিবে, তোমার রচনা-ভঙ্গীর জন্য জানালার সৌন্দর্য কোথাও ব্যাহত হইতেছে কি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জানালাগুলি মোটামুটি লম্বা সমকোণ-বিশিষ্ট, সেই কারণে পর্দাগুলিও প্রায়ই সোজা হয়, যাহাতে লম্বা লম্বা ভাঁজ ফেলা যায়। যে-সকল ক্ষেত্রে পর্দা সোজা করিয়া কাটা ও সোজা বড় বড় ভাঁজ ফেলাই যেখানে উদ্দেশ্য—সেই সকল ক্ষেত্রে, হয় পর্দাগুলিকে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া দাও, যাহাতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত পৌছায়, কিংবা মেঝে হইতে এক ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চি উপরে রাখ, কিংবা জানালার সহিত একেবারে সমান করিয়া দাও, কিন্তু উহার মাঝামাঝি করিও না। জানালার ঝুল হইতে যদি পর্দাখানির মাপ ছোট কর, কিম্বা মেঝে পর্যন্ত না পৌছাইয়া যদি পর্দাখানিকে ঘরের মাঝামাঝি আনিয়া ছাড়িয়া দাও—তাহা হইলে উহা অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইবে।

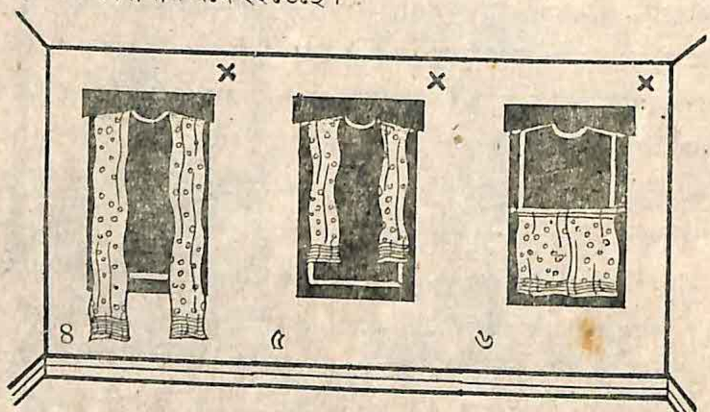
পর-পৃষ্ঠায় ১ম চিত্রখানিতে—পর্দাটিকে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া মাটির সহিত ঠেকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও অসঙ্গতি নাই, মনোরম দেখাইতেছে।

২য় চিত্রে—পর্দায় জানালার কাঠামোটিও ঢাকিয়া গিয়াছে, এবং জানালার সমান করিয়াই পর্দাখানি কাটা হইয়াছে। এই পর্দাটিতেও কোথাও মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যায় ন', এই কারণে ইহাও বেমানান মনে হয় না

৩য় চিত্রে—জানালার ফ্রেমটিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে কিন্তু পর্দা জানালার সমান করিয়া কাটা। পর্দার সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য এই ক্ষেত্রে কাঠের কাঠামোটিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। এই পর্দাখানিতে কোথাও সুর ও সঙ্গতি নষ্ট হয় নাই এবং উহা দেখিতেও মনোরম হইয়াছে।




৪র্থ চিত্রে—পর্দাখানির ঝুল জানালার ঝুল হইতে দীর্ঘ—এবং দেওয়ালের অর্ধেক আসিয়াই যেন থামিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সুর কাটিয়া যাওয়ায় পর্দাখানিকে বেমানান মনে হইতেছে।

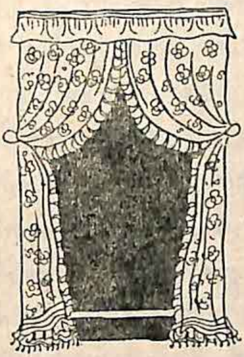


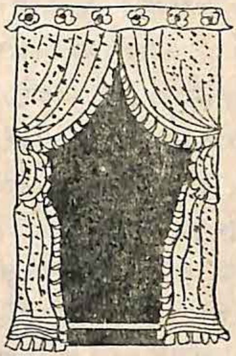

৫ম চিত্রে—পর্দাখানির ঝুল জানালা হইতে ছোট, তাই বিসদৃশ দেখাইতেছে।

৬ষ্ঠ চিত্রখানিতেও—পর্দার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় কোথাও যেন ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পর্দাগুলি মোটামুটি রচিত হইবার পরে উহার কিনারাগুলি ও

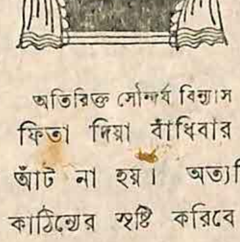
উপরের বা নীচের ধারগুলি কুঁচি, লেস, ফ্রিল ইত্যাদির দ্বারা কেমন করিয়া আরও সুন্দর করিয়া তোলা যায়, উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অনেক স্থলে আবার নানা রকমের সিল্কের ফিতা দিয়া হালকা করিয়া পর্দাগুলিকে





কুঁচি, লেস, ফ্রিল ইত্যাদি দ্বারা পর্দাগুলির অতিরিক্ত সৌন্দর্য বিন্যাস

বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়ার দরুণ পর্দার গায়ে যে আবার কতকগুলি ভাঁজের সৃষ্টি হয়, সেই ভাঁজগুলি পর্দাকে আরও রমণীয় করিয়া



অতিরিক্ত সৌন্দর্য বিন্যাস



অত্যধিক আঁট না হয়

তোলে। ফিতা দিয়া বাঁধিবার সময় আবার লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহা অত্যধিক আঁট না হয়। অত্যধিক আঁট হইলে, উহা পর্দার কমনীয়তার পরিবর্তে কাঠিন্যের সৃষ্টি করিবে। পর্দাগুলিকে যদি তুমি অত্যধিক আঁট করিয়া ঠিক মাঝামাঝি বাঁধ, তাহা হইলে উহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে এবং উহা অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে।

***পর্দার রঙ*** - ঘরের রঙ ও বাহিরের আলো, এই দুয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্দার রঙ নির্বাচন করা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু **পর্দার রঙই আসল। বাহিরের আলোককে প্রয়োজনানুযায়ী উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল**

**করিয়া গৃহাভ্যন্তরের পরিবেশকে মনোরম করিয়া তোলা পর্দার একটি প্রধান কাজ।** পর্দা তৈয়ারি করিবার পূর্বেই দেখিয়া লইবে, ঘরের আলোর গতি কিরূপ। কোন্ দিক হইতে কতখানি আলো ঘরে আসিতেছে, উহার ঔজ্জ্বল্য কতখানি কমাইবে বা বাড়াইবে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পর্দার ব্যবস্থা করিবে। অনেক সময় দেখিবে নিপুণ পর্দা রচনাকারিরা আলোর বুকে পর্দার কাপড়খানিকে মেলিয়া ধরিয়া দেখিতেছেন—কোন্ আলোয় কিরূপ রঙের পর্দা কোন ঘরে অধিকতর মানাইবে। ঘরের আয়তন অনুযায়ীও পর্দার রঙের তারতম্য হইতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখিবে, পর্দার বিভিন্ন রঙ সংযোজনার নৈপুণ্যের জন্যই কক্ষের আয়তন ছোট বড় প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন ঘরখানি যদি ছোট হয় এবং তুমি যদি উহাকে পর্দার সাহায্যে বড় প্রতীয়মান করাইতে চাও, তাহা হইলে তুমি পর্দাকে **পটভূমি** হিসাবেই ব্যবহার কর। অর্থাৎ পর্দার রঙ নির্বাচন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহা দেওয়ালের রঙের সহিত মিশিয়া যায়। যদি গৃহ-সজ্জার উপকরণ হিসাবে বহু কারুকার্য-খচিত উজ্জ্বল ও বিচিত্র রঙের পর্দা ব্যবহার কর দেখিবে ঘরের আয়তন ছোট মনে হইতেছে।



মেলিয়া ধরিয়া দেখিতেছেন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেওয়ালের রঙ ও ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রাদির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিতে পর্দাই একমাত্র যোগসূত্র। সুতরাং পর্দা সন্নিবেশ করিবার সময় ঘরের দেওয়াল ও মেঝের রঙ, আসবাব-পত্রাদির সংস্থান ও উহাদের রঙ বা বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কারণ উহাদের সহিত **সামঞ্জস্য সৃষ্টিতেই পর্দার সার্থকতা।** তুমি কক্ষের মধ্যে যেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক তাহার উপরেই পর্দার রঙ নির্ভর করিবে। কক্ষের অন্যান্য জিনিসপত্রাদির কথা বিবেচনা করিয়াই তোমাকে স্থির করিতে হইবে, যে

তুমি তোমার জানালা ও জানালার পর্দাটিকেই প্রাধান্য দিবে, কিংবা পর্দাটিকে অন্যান্য উপকরণগুলির একটি সুন্দর পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করিবে। এই বিবেচনার দ্বারাই পর্দার রঙ নির্বাচিত হইবে। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল রঙ ও কারুকার্যখচিত গৃহসজ্জার নানা উপকরণ ও জিনিসপত্রাদির সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহা হইলে পর্দাকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। সেই ক্ষেত্রে পর্দার জন্য এমন একটি রঙ বাছিয়া লও যাহা সহজেই দেওয়ালের রঙের সহিত মিশিয়া যাইবে। তাহা হইলেই দেখিবে, কক্ষমধ্যস্থ জিনিস গুলির সৌন্দর্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পর্দা পটভূমির কাজ করিলেও তুমি যদি চাও উহা সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, তাহা হইলে উহার রঙও সেইভাবে নির্বাচন করিবে। যেমন, দেওয়াল যদি বালি রঙের হয়, তাহা হইলে পর্দার জন্য সোনালী বা মরিচা রঙের মত রঙ নির্বাচন করিবে। ঘরের মধ্যে যদি গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলির সংখ্যা কম হয় তাহা হইলে উজ্জ্বল রঙ ও নক্শা-বিশিষ্ট পর্দা সংযোজনা করিবে, যাহাতে পর্দা, উহার বর্ণ ও চিত্র দিয়া আসবাবপত্রাদির অভাব ঢাকিয়া দিতে পারে; যে ভাবে যে রঙ-ই নির্বাচন কর না কেন, সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র ও সাধারণ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যের কখনও অভাব না হয়।

সংসারে গৃহসজ্জার ছোটখাট আরও অনেক জিনিস থাকে, যেমন— দেওয়ালের ছবি, বহু-কারুকার্য-খচিত একখানি জয়পুরী প্লেট বা একটি ফুলদানি কাশ্মীরি কাজ-করা ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স, কিংবা হাতীর দাঁতের একটি বাতিদান। ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর পরিবর্তে ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করাই এই জিনিসগুলির প্রধান কাজ। তবে ইহাদের প্রয়োজন নাই, একথাও বলা চলে না, কারণ ইহাদের সুকুমার শিল্পে অনেক সময় ঘরের বড় বড় আসবাবগুলির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। তা ছাড়া, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ছোটখাট অনেকগুলি কাজেই ইহারা সহায়তা করে।

## আসবাবপত্র

***দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আসবাব***—গৃহ-রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইলে কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয়। আসবাবপত্রের যথাযথ নির্বাচন ও সংস্থানের উপরেই গৃহের ভিতরকার সৌন্দর্য, শান্তি ও আরাম

অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণতঃ খাওয়া-দাওয়া, স্নান, নিদ্রা, পাঠাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদাদি গ্রহণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি সংসারের বিভিন্ন কাজগুলির সুষ্ঠ সমাধান করিতে হইলে যাবতীয় যা-কিছু সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয়, গৃহের আসবাব বলিতে মোটামুটি সে সমস্তকেই বুঝায়। সুতরাং চেয়ার, টেবিল, আয়না, আলমারি, বইয়ের শেল্‌ফ, কাপড়-চোপড় রাখিবার র‍্যাক, আলনা, কার্পেট, পর্দা, ফুলদানী ইত্যাদি সমস্তই আসবাবপত্রের পর্যায়ে পড়ে।

ছোট বা বড়, যে-কোনও রকম আসবাবই হোক না কেন, উহাদের নির্বাচনে ও সন্নিবেশে যথেষ্ট রুচি ও মাত্রাজ্ঞানের আবশ্যক। স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর রুচি-সঙ্গত ও একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবখানি ক্রয় করিয়া উহার যথাযথ সংস্থান দ্বারা কিভাবে গৃহের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবেন ও অধিবাসীদের



আসবাবপত্রের সংস্থানের উপরে গৃহের সৌন্দর্য নির্ভর করে

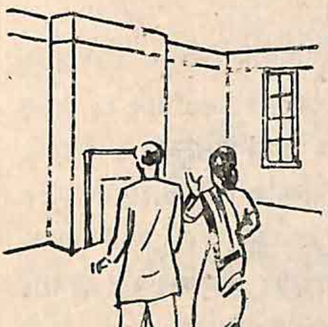
প্রয়োজন মিটাইবেন, উহার উপরেই নির্ভর করে গৃহস্বামীর গৃহ-রচনার কলা-কৌশল।

***আসবাবপত্রাদির সংস্থান***—আসবাবপত্রাদির যথাযথ সংস্থান সুষ্ঠ পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনা ব্যতীত আসবাব ক্রয় করিলে উহা পরে সন্নিবেশ করা কঠিন হইয়া উঠে। পরিকল্পনা করিবার সময় সর্বদা

খেয়াল রাখিবে, বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন আয়তন ও পরিসর অনুযায়ী আসবাব-পত্রাদির কিভাবে সংস্থান করিলে সৌন্দর্যের দিক হইতে তোমার গৃহখানি কিছুটা **বৈশিষ্ট্য** অর্জন করিবে।

কেবলমাত্র সজ্জার দিকে তাকাইলে চলিবে না।—কোন্ জিনিসটি কিভাবে রাখিলে কতখানি আরামদায়ক হইবে, উহার সংস্থান দ্বারা সেই কক্ষের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত হইবে কিনা এবং সর্বোপরি জিনিষটি উহার প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে কিনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

আসবাবপত্রগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ—যেগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন—খাট বা চৌকি, লেখাপড়ার চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, শেল্ফ ইত্যাদি, আর যেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় নয় অথচ গৃহসজ্জায় বিশেষ স্থান অধিকার করে, যেমন—একখানি বিশেষ কার্পেট, দেওয়ালের ছবি, একটি বিশেষ ধরনের তৈয়ারি টিপয় বা বুক-কেস ইত্যাদি। যে-কোনও আসবাব



ঘরের আয়তন অনুযায়ী
আসবাব নির্বাচন কর



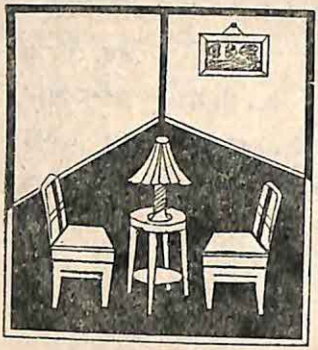
পরে সন্নিবেশ করাই
কঠিন হইয়া উঠে

তুমি যে ভাবেই সন্নিবিষ্ট কর না কেন, তোমার বিশেষ বিবেচ্য হইবে, সেই আসবাব উহার বিশেষ প্রয়োজনটুকু মিটাইতেছে কিনা। আসবাবপত্রের সংস্থাপন সর্বপ্রথমেই তোমার গৃহের বাসিন্দাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। জীবনযাত্রায় **স্বাচ্ছন্দ্য আনাই আসবাবপত্র সংস্থানের প্রধান উদ্দেশ্য।**



সৌন্দর্য আরও স্নিগ্ধ ও
উজ্জল হইয়াছে

এইভাবে মোটামুটি একটি পরিকল্পনা করিয়া তুমি আসবাবগুলির যথাযথ সংস্থাপনের কাজে প্রবৃত্ত হইবে। পূর্বেই পরিকল্পনা না করিলে পরে জিনিসপত্র সন্নিবেশ করাই কঠীন হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমেই স্থির করিবে, তোমার কক্ষের কোন্ অংশটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, কোন অংশটির সৌন্দর্য তুমি আরো ভালো করিয়া ফুটাইতে চাও। হয়ত ঐ অংশটি হইতেছে ঐ জানালাটি, যাহা দিয়া বাহিরের বহুবিস্তৃত প্রান্তর ও আকাশ দেখা যায় অথবা বারান্দার ঐ দেওয়ালটি যাহা অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, যাহার গায়ে তুমি সোফাগুলি সাজাইতে পার। তেমন কিছু বিশেষ যদি না থাকে তাহা হইলে যে-কোনও একটি জায়গাকে প্রধান মনে করিয়া সাজাইতে আরম্ভ কর। **যে-কোনও একটি ক্ষেত্র ঠিক করিয়া ঐখান হইতে শুরু করাই গৃহ-সজ্জার মূলনীতি।**

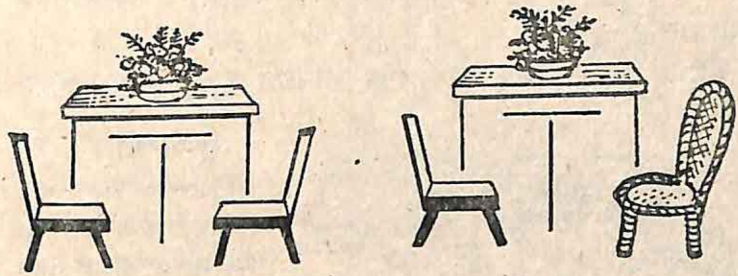


কোনগুলিও বহু প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে

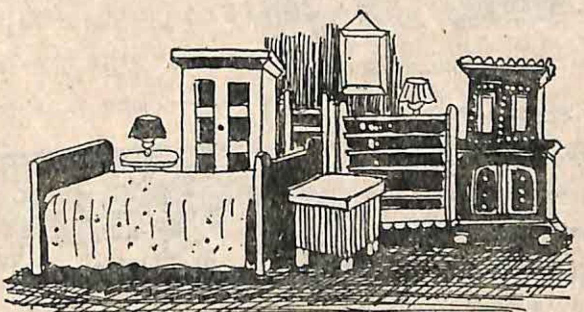
যে জিনিসগুলি দেখিতে একই রকম সাধারণতঃ সেই জিনিসগুলিকে হয় সামনা সামনি, নয় পাশাপাশি, নয় কোণাকুণি সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে। অনুরূপ জিনিসের সংস্থান অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অসমান জিনিসকেও রুচিসম্মত উপায়ে সন্নিবিষ্ট করা যায়। তোমার ঘরে দুইখানি চেয়ার রহিয়াছে—একখানি গদি-আঁটা ঝালর-দেওয়া ও সামান্য বড়; অপরখানি অপেক্ষাকৃত ছোট, অত্যন্ত সাদাসিদা ও সম্পূর্ণরূপে বাহুল্য-বর্জিত। তোমার কক্ষে দুইখানি চেয়ারেরই প্রয়োজন ও উহাদের যথাযথ সংস্থান আবশ্যক। যে জায়গায় এই দুইখানি চেয়ার সন্নিবেশ করিতে চাও, সেই জায়গাটি সমান দুই-ভাগে ভাগ করিয়া ছোট চেয়ারখানিকে দাগ লাইন হইতে আরও পিছনের দিকে হটাইয়া দাও। দেখিবে দুইখানি চেয়ারই বেশ সামঞ্জস্য সহকারে সংন্যস্ত হইয়াছে। এইভাবে ঘরের অসমান আসবাবপত্রগুলিও পরিসর কমাইয়া বাড়াইয়া তুমি সমান ও সুন্দরভাবে সংন্যস্ত করিতে পার।

আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থানে সর্বদাই **বাহুল্য বর্জন করিবার চেষ্টা করিবে।** যে জিনিসে তোমার প্রয়োজন নাই, সে জিনিস আনিয়া অযথা আবহাওয়াকে সঙ্কুচিত করিবে না। **আসবাব-বাহুল্য ঘরের বায়ু চলাচলে**

বাধার সৃষ্টি করে। আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়া ঘর সাজাইবার সময় ঘরের কোণগুলির কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিবে। ঘরের কোণগুলি যে কোনও প্রয়োজনে আসে না ইহা মনে করিওনা, ঠিকমতন সাজাইতে পারিলে কোণ-



গুলিও ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে। বৈঠকখানা প্রভৃতি ঘরে নিরালায় পড়া, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন



সমস্ত বড় জিনিস একদিকে রাখিবে না

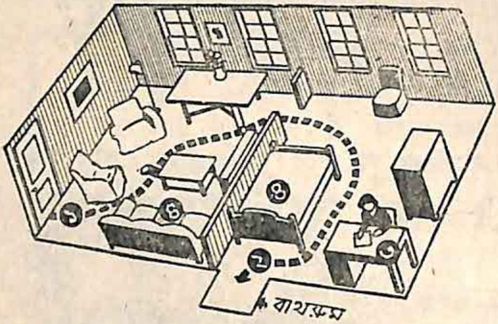
কোণগুলি মিটাইয়া থাকে। কোণগুলির জন্য যদি নিতান্তই কিছু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোণটিতে সামান্য একটি গাছ রাখিয়া দিলে বা একটি লতা ঝুলাইয়া দিলেও দেখিবে ঘরের সৌন্দর্য আরও স্নিগ্ধ হইয়াছে। ঘর সাজাইবার সময় সমস্ত বড় ও ভারী জিনিসগুলি যাহাতে দেওয়ালের একদিকে না পড়ে, সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, কারণ উহাতে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের একান্ত অভাব ঘটে। বড় এবং ছোট, উঁচু এবং নীচু সমস্ত আসবাবগুলিই এমনভাবে সাজাইবে যাহাতে একটি সহজ সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়।

আসবাবপত্র-সন্নিবেশে সর্বদা মনে রাখিবে যে (১) ঘরের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া কখনও কোনও জিনিস সন্নিবিষ্ট করা অনুচিত, (২) আসবাবপত্রের

সংস্থান এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিতে খুলিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, এবং

(৩) একই ঘরে যদি পড়াশুনা বা গল্পগুজব ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে আসবাবপত্রাদির এমনভাবে সংস্থান করিবে যাহাতে কেহ কাহারও কাজে ব্যাঘাত না করে।

নীচের দুখানি ছবিতে আসবাবপত্র বিন্যাসের **সু** ও **কু-ব্যবস্থা** দেখান হইয়াছে।

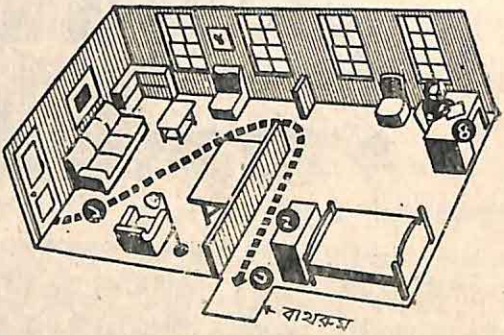



**কু-ব্যবস্থা**—

(১) প্রবেশপথ আসবাবপত্রে সঙ্কীর্ণ, (২) আসবাবের অনুচিত বিন্যাসে স্নানাগারের পথ আঁকা বাঁকা, (৩) পড়ার টেবিলে আলোর অপ্রাচুর্য ও (৪) জানালার মুখোমুখি সোফা ও শয্যা—আব্রুর অভাব।

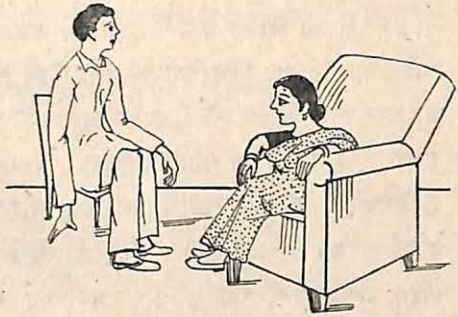
**সু-ব্যবস্থা**—

(১) প্রবেশ পথ সহজ, (২) শয্যার একপ্রান্তে দেরাজের সংস্থানে স্থানের প্রাচুর্য, (৩) স্নানাগারের পথ সহজ ও সরল, (৪) পড়ার টেবিলে বাঁদিক হইতে আলোর বন্দোবস্ত।




***আসবাবপত্র নির্বাচন***—কোন কক্ষের আসবাব নির্বাচন বা ক্রয় করিতে হইলে প্রথমেই সেই কক্ষের আয়তন ও পরিসরের কথা চিন্তা করিবে। আয়তন অনুযায়ী আসবাবপত্র নির্বাচন করা প্রয়োজন কারণ বড় ঘরে অত্যধিক ছোট আসবাব যেমন বিসদৃশ বোধ হয়, ছোটঘরে বড় আসবাবও ঠিক তেমন বেমানান ও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠে। আসবাব নির্বাচনের সময় আরও লক্ষ্য রাখিবে উহার উচ্চতা প্রস্থ ইত্যাদি তোমার দৈহিক গঠনের অনুরূপ হইয়াছে কিনা। কারণ যথাযথ শয়ন উপবেশন ইত্যাদির উপরেই সুষ্ঠু দেহভঙ্গী নির্ভর

করে। চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তোমার উপবেশন ও অন্যান্য কাজকর্মের বস্তুগুলি যদি অসমান বা দেহের অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে তোমার দেহের যথাযথ গঠন নিঃসন্দেহে ব্যাহত হইবে। সুষ্ঠু ভঙ্গীর পরিবর্তে দেখিতে দেখিতে তুমি দেহের বিকৃত ভঙ্গীই আয়ত্ত করিয়া বসিবে।



দৈহিক গঠনের অনুরূপ হইয়াছে কিনা

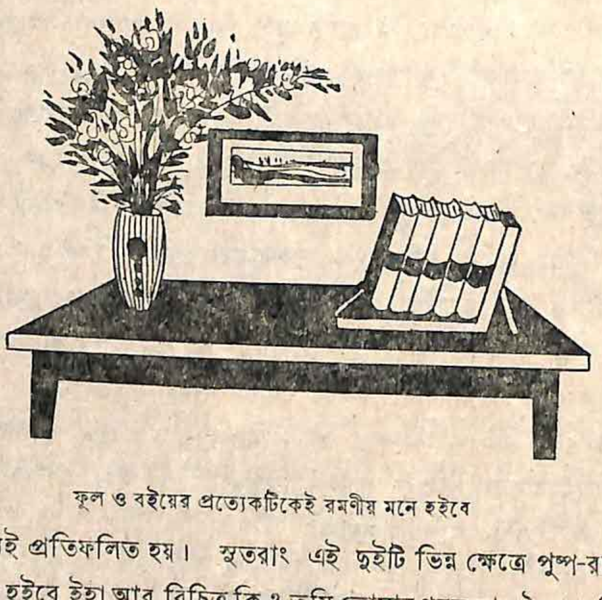
মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যই আসবাব-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আসবাব নির্বাচনের সময় যাহাতে উহা যথেষ্ট আরামদায়ক হয় ইহাও লক্ষ্য রাখিবে। আরাম, আসবাবের আকার বা আয়তনের উপর নির্ভর করে না; আরাম নির্ভর করে বস্তু-বিশেষের গঠন প্রণালীর উপর। সুতরাং আসবাব-নির্বাচনের সময় উহার গঠন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দিবে। আসবাব-নির্বাচন করিতে হইলে তুমি প্রথমেই দেখিয়া লইবে, যে উদ্দেশ্য ও যে প্রয়োজনের জন্য তুমি আসবাবটি ক্রয় করিতেছ, ঐ আসবাবটিতে তোমার সে **উদ্দেশ্য** সফল হইবে কিনা ও তোমার সে **প্রয়োজনটি** মিটিবে কিনা। যেমন—সেলাই করা, আরাম করা, পড়াশুনা করা, খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন চেয়ার রহিয়াছে। প্রত্যেকটি চেয়ারে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তুমি দেখিয়া লইবে তোমার নির্বাচিত চেয়ারখানি তোমার প্রয়োজনের উপযোগী কিনা। আসবাব নির্বাচনে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাহাতে কেহ অসাবধানতাবশতঃ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে আসবাবপত্র হইতে যেন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হয়। এইজন্য আজকাল অনেক আসবাবেরই কোণগুলি গোল করিয়া দেওয়া হয়। ইহা আবার বিশেষভাবে প্রযোজ্য শিশুদের আসবাব সম্বন্ধে।

## পুষ্পবিন্যাস

**বিভিন্ন স্থানের পুষ্পরচনা**—গৃহ-উদ্যানে ফুল ফুটিলে ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে গৃহখানিও মনোরম হইয়া উঠে। সুতরাং উদ্যান হইতে

ফুলগুলিকে ছিঁড়িয়া গৃহে আনিয়া লাভ কি—যদি তুমি উহাদের স্থান ও ক্ষেত্র অনুযায়ী সাজাইয়া উহাদের রূপ ও রঙকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে না পার? গৃহের বিভিন্ন স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল সাজানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু উহাতে যথেষ্ট চিন্তা ও রুচির আবশ্যক। ফুলগুলির রূপ যদি ভাল করিয়া ফুটাইতে হয় তাহা হইলে একটি আধারের মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ফুলগুলিকে গুঁজিয়া দেওয়া চলে না। এখানে **সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি, মাত্রাজ্ঞান, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য** প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। তোমরা ফুল সাজাইবার রীতিগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি পড়িয়াছ। এখন দেখা যাক, বিভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্র অনুযায়ী কিভাবে পুষ্পবিন্যাসের তারতম্য হইয়া থাকে।

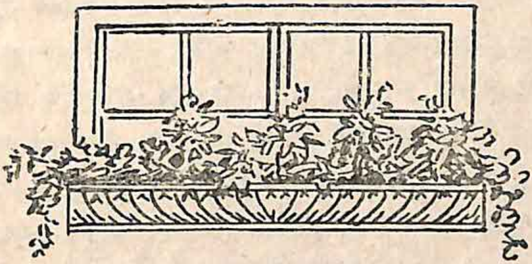
ইহা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ—জন্মতিথি, বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি আনন্দ অনুষ্ঠান এবং মৃত্যুবার্ষিকী, শ্রাদ্ধবাসর প্রভৃতি শোকসভাগুলির কর্মসূচী এক প্রকার হয় না। একটির আবহাওয়া আনন্দমুখর—হাসি, গান, আলো ও রঙের প্রাচুর্যে ঝলমল; অপরটির আবহাওয়া স্তব্ধ, বিষণ্ণ—গভীর বেদনা যেন সমস্ত



ফুল ও বইয়ের প্রত্যেকটিকেই রমণীয় মনে হইবে

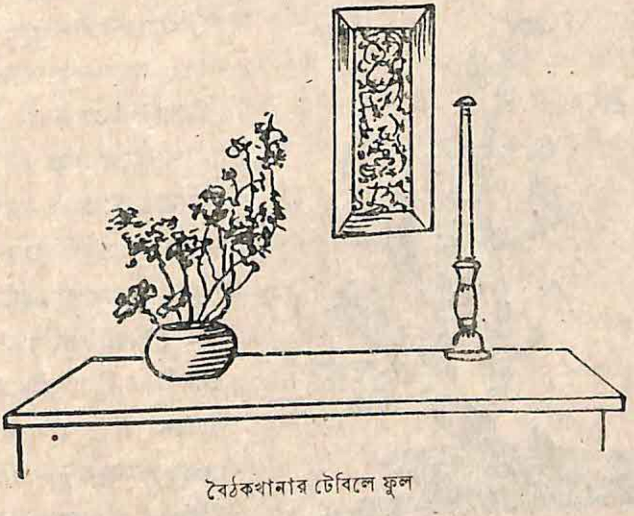
কিছুর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এই দুইটি ভিন্ন ক্ষেত্রে পুষ্প-রচনাও যে ভিন্নতর হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? তুমি তোমার গৃহসজ্জার নৈপুণ্য দিয়াই আবহাওয়াকে বদলাইয়া দিতে পার ইহা যেমন ঠিক, তেমনি তোমার নিপুণ পুষ্প-নির্বাচন ও বিন্যাসের দ্বারাও তুমি গৃহের বিভিন্ন অংশকে প্রয়োজন অনুযায়ী

সজ্জায় শোভিত করিতে পার। পুষ্প নির্বাচন করিবার নিয়মগুলি সম্বন্ধে তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী যেমন পুষ্প নির্বাচন বিভিন্ন হয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুযায়ী তোমার রচনাভঙ্গীরও যথেষ্ট তারতম্য



জানালার কার্ণিসে লতা

হইবে। কাজেই পুষ্পরচনা করিবার সময় প্রথমেই তুমি তোমার **গৃহের কোন্ স্থানটির জন্য কি প্রয়োজনে** পুষ্পরচনা করিতেছ সেই লক্ষ্যটি সঠিক নির্ণয় করিয়া লইবে। তুমি কি তোমার গৃহের প্রবেশ পথটির জন্য পুষ্পরচনা করিবে



বৈঠকখানার টেবিলে ফুল

কিংবা তোমার খাবার টেবিলটিকে সাজাইবে, না-কি তোমার বইয়ের শেল্‌ফটির উপর একগুচ্ছ পুষ্প রাখিবে—কোন্ স্থানটি তোমার লক্ষ্য, সেইটি আগে স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ. তুমি খাবার টেবিলে যেভাবে পুষ্পরচনা করিবে, বইয়ের শেল্‌ফের উপর ছবির কিনারে হয়ত সেভাবে করিবে

না। ফুলের সৌন্দর্যকে যদি ফুটাইতে চাও তাহা হইলে প্রতিটি জায়গার জন্য তোমার বিশেষ বিশেষ রচনাশৈলীর প্রয়োজন।

খাবার টেবিলের জন্য যদি পুষ্পরচনা কর, তাহা হইলে উহা এমনভাবে করিবে যাহাতে দৃষ্টির সহিত সমান্তরাল হয়। অত্যধিক উঁচু পুষ্পদান ও পুষ্পস্তবক দৃষ্টির সহজ গতিকে ব্যাহত করিবে। ফুলের আধারটি এমনভাবে নির্বাচিত করিবে ও ফুলগুলিকে এমনভাবে সাজাইবে যাহাতে আসনে উপবিষ্ট অতিথি অভ্যাগতের স্বাভাবিক দৃষ্টির সহজ গতিপথে পুষ্পরচনার সহজ সৌন্দর্য ধরা পড়িয়া যায়। খাবার টেবিলে অত্যধিক উঁচু বা দীর্ঘ পুষ্প-স্তবক অতিথিদের পরস্পরের দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করিয়া আলাপ-আলোচনার বাধা জন্মায়। খাবার টেবিলে একটি চ্যাটালো পাত্রে লিলি জাতীয় ফুল জলে ভাসাইয়াও রাখিতে পার—ইহাতে ফুলগুলিকে স্বাভাবিক মনে হইবে ও টেবিলের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলির সঙ্গে একটি সহজ সঙ্গতিরও সৃষ্টি করিবে।



খাবার টেবিলের পুষ্প-সজ্জা



লতা, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে পার।

শোবার ঘরে, পড়ার ঘরে, বইয়ের ডেস্কের উপর দেওয়ালে ছবিখানিকে কেন্দ্র করিয়া যদি ফুল সাজাইতে চাও তাহা হইলে ফুলের ডালগুলিকে ততখানি উঁচু কর—যাহাতে দু'একটি ডাল বা পাতা ছবিখানির পিছনে দেওয়ালের উপর গিয়া পড়িতে পারে। উহাতে ছবি, ফুল ও বইয়ের শেল্‌ফ প্রত্যেকটিকে রমণীয় মনে হইবে। যে-কোনও ঘরে বা যে-কোনও স্থানে ফুল সাজাও না কেন সেই স্থানের অন্যান্য জিনিস-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সাজাইবার চেষ্টা করিবে। কারণ তোমার সজ্জা যতই মনোরম হোক না কেন, সেই স্থানের অন্যান্য জিনিসগুলির সহিত

যদি উহার কোনও সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে তোমার পুষ্প-রচনাটিও বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে। এই কারণেই স্থান ও সেই স্থানের যে জিনিসগুলির সহিত মিল রাখিয়া তুমি ফুল সাজাইবে, সেই জিনিসগুলির দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়।

যদি যাতায়াতের পথে কোনও একটি স্থানের জন্য তুমি একটি পুষ্পস্তবক রচনা করিতে চাও, তাহা হইলে এমন একটি স্থান বাছিয়া লও, যে স্থানটি সকলের চোখে পড়িবে। সেই স্থানের ফুলের বিভিন্ন রং ও বৃন্তের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একটি স্তবক রচনা কর—যাহার সাহায্যে সেই স্থানটিকেই উজ্জ্বলতর করিয়া তোলা যাইবে। এইভাবে ঘরের কোণটি, দেওয়াল, ঝোলান ঘড়ির নীচেকার জায়গাটি, ছবির নীচেটা, বৈঠকখানার টেবিল, শোবার ঘরের জানালার কার্ণিস প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গার জন্য বিভিন্ন রীতিতে পুষ্প বিন্যাস করিতে পারা যায়।

এই সঙ্গে এই কথাটি মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তুমি যে সর্বদাই তোমার চাহিদা অনুযায়ী পুষ্প সংগ্রহ করিতে পারিবে এমন নহে। বেশীর ভাগ স্থলে আমরা ফুল উপহার হিসাবেই পাইয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ফুলগুলি মাটিতে ফেলিয়া নিরীক্ষণ কর, ঐ ফুলগুলি কোন্ স্থানে মানাইবে—সেই অনুযায়ী ফুলগুলিকে ফুলদানিতে সাজাইয়া তারপরে খালি জায়গা বাছিয়া উহাদের সংন্যস্ত কর। ফুলগুলিকে ফুলদানিতে সাজাইয়া তারপরে খালি জায়গা বাছিয়া উহাদের সংন্যস্ত করা ফুল সাজানোর রীতি নহে। এতৎব্যতীত কেবলমাত্র যে ফুল দিয়াই সাজাইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। তুমি লতা, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদিও গৃহ সজ্জায় ব্যবহার করিতে পার।

যদিও বিভিন্ন স্থানে পুষ্প-রচনার কতকগুলি ছবি দেওয়া গেল, কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখিবে ফুল সাজাইবার কোন বিশেষ ভঙ্গী বা নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেওয়া চলে না। তোমার নিজের রুচি অনুযায়ী ও মাত্রাজ্ঞান সহকারে তুমি ফুল সাজাইবে।

**পুষ্প-রচনায় রঙের মিল ঃ—**পুষ্প রচনায় রঙের মিল একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃতির বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। বিভিন্ন ফুলের রঙের সহিত মিল ও সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণের সমাবেশ ঘটাইয়া গৃহের রূপ ফুটাইয়া তোলাই গৃহকর্ত্রীর কাজ। আধারের রঙের সহিত ফুলের রঙ মিলানো সংগৃহীত ফুলগুলির বিভিন্ন বর্ণের সহিত বিভিন্ন বর্ণের সামঞ্জস্য ঘটানো,



যাতায়াতের পথে পুষ্পরচনা করিতে হইলে এমন একটি স্থান বাছিয়া লও যাহা সহজেই চোখে পড়িবে।



এমন একটি স্তবক রচনা কর যাহার সাহায্যে সেই স্থানটিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলা যায়।

পর্দা, আসবাবপত্র ও দেওয়ালের রঙ ইত্যাদি মিলিয়া ঘরের মধ্যে যে রঙের সৃষ্টি হইয়াছে সেই রঙের সহিত সংগৃহীত পুষ্পগুলির রঙের সঙ্গতি স্থাপন করা —**'পুষ্প-রচনায় রঙের মিল'** বলিতে এই সবগুলিকে বুঝায়।

কোনও বিশেষ স্থানের জন্য পুষ্পরচনা করিতে গেলে তোমাকে প্রথমেই দেখিতে হইবে আধারের রঙের সঙ্গে ফুলের রঙ মিশিয়াছে কিনা। এই কারণেই **সহজ সাদাসিধা সাধারণতঃ একরঙা আধারগুলিই নির্বাচন করিবার রীতি,** যাহাতে ফুলের রঙের সহিত আধারের রঙের সহজে অমিল হইতে না পারে। একই পুষ্পস্তবকে তুমি যদি বিভিন্ন ফুল ব্যবহার কর তাহা হইলে ফুলগুলিকে পর পর মাটিতে ফেলিয়া দেখিয়া লও, উহাদের পরস্পরের মধ্যে রঙের মিল রহিয়াছে কিনা। পাতাগুলির রঙের সহিতও ফুলের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। সমস্ত পাতার সবুজ আবার সব সময়ে একরকম হয় না। কতকগুলিতে হলুদ মিশানো থাকে, কতকগুলিতে নীলের ভাগ বেশী, কতকগুলিতে আবার হাল্‌কা সবুজ বা ঘোলাটে সাদা রঙের হইয়া থাকে। সুতরাং বাছিয়া লও, কোন্ সবুজের বুকে পুষ্প-রচনাটি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পুষ্প-রচনায় **রঙের মিল ও সঙ্গতি তোমার নিজের রুচি দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে।**



কোনও সবুজের বুকে পুষ্প-রচনা
ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

পূর্বেই বলিয়াছি পুষ্প-রচনা করিতে হইলে দেওয়ালের রঙ ও অন্যান্য জিনিসপত্রাদি মিলিয়া যে রঙের সৃষ্টি করিয়াছে তোমাকে সেই রঙের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে স্থানের জন্য পুষ্প রচনা, তার পরিবেশের সহিতই যদি মিল না রহিল, তাহা হইলে সেই রচনা সার্থক হয় কিরূপে? মিলের অর্থ এইখানে একই রকম না হওয়া। মিলের অর্থ, ঘরের বা স্থানের আবহাওয়া অনুযায়ী রচনায় রঙের পরিবর্তন করিয়া **আবহাওয়াকে প্রভাবিত করা।** যেমন কোনও কক্ষ যদি নিরানন্দ মনে হয় বা কোনও কক্ষের কোনও অংশ যদি ভারী বিষণ্ণ বোধ হয় তাহা হইলে তুমি ঐ স্থানে একগুচ্ছ **হলুদ রঙের ফুল** সাজাও। হলুদ রঙের সঙ্গে সোনালী সূর্যকিরণের সাদৃশ্য আছে এবং ঐ পুষ্পগুচ্ছ যথাযথ বিন্যস্ত করিতে পারিলে উহা নিমিষেই ঐ অংশের

ম্লান ভাব দূর করিয়া উহাকে উজ্জ্বল ও মনোরম করিয়া তুলিবে। অপরপক্ষে ঐ কক্ষেই যদি সুবিন্যস্ত একগুচ্ছ লাল ফুল রাখিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে ঐ আবছা ম্লান আলোয় লাল পুষ্পগুচ্ছটির সকল সৌন্দর্যই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ লাল ফুলই যদি সামান্য আলোর বুকে সংন্যস্ত কর তাহা হইলে দেখিবে ঐ ফুলই উহার প্রখর ঐশ্বর্যে ঝলমল করিতেছে। মিল বলিতে বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যই বুঝায়। কাজেই দেখিতেছ, কোনও বিশেষ স্থানের জন্য পুষ্প-রচনা করিতে সেই স্থানের রঙ ও পরিবেশের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়।

## আলপনা

***আলপনার সৃষ্টি ও ব্যবহার***—আলপনা গৃহরঞ্জনের একটি প্রধান উপকরণ। ঘরের মেঝে, দেওয়াল প্রভৃতি ঘরের বিভিন্ন অংশ আলপনার সাহায্যে সজ্জিত করা যায়। আলপনা একটি বিশেষ কারুকলা এবং রূপসজ্জাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। পুজামণ্ডপ, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশপথ প্রভৃতি যে কোনও জায়গাই হোক না কেন, গৃহরঞ্জনের অন্যান্য যাবতীয় উপকরণের অভাবেও কেবলমাত্র আলপনার সৌন্দর্যেই উহাকে সুন্দর করিয়া তোলা যায়। আলপনার ইতিহাস হইতে দেখা যায় ঠিক গৃহরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আলপনার সৃষ্টি নয়, আলপনা মেয়েদের শিল্প রুচি এবং বাংলার নানা ব্রতের সহিত জড়িত। তখনকার দিনে বিভিন্ন ব্রতে মেয়েরা মাঙ্গলিক হিসাবেই পূজার বেদী, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশপথ প্রভৃতি আলপনা দিয়া চিত্রিত করিত। প্রথম প্রথম উহারা শুকনো চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াই বিভিন্ন লতাপাতা, নক্‌শা ইত্যাদি আঁকিত। তারপর ধীরে ধীরে দেওয়ালে ও থামের গায়ে আলপনা দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত চাউলের গুঁড়ার সহিত জল মিশাইয়া লইবার পদ্ধতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের আলপনায় প্রথম হইতেই বরাবর সাদা রঙটারই অধিক চল ছিল, যদিও আজকাল শান্তিনিকেতনে ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন রঙ মিশাইয়া আলপনা দিবার প্রয়াস দেখা যায়।

কাজেই দেখিতেছ, তখনকার দিনে আলপনার ব্যবহার কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে ও বিশেষ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল যেমন গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে যেখানে-সেখানে আলপনার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, তখনকার দিনে আলপনার সেইরূপ চল ছিল না। বস্তুতঃ অজন্তা

ও ইলোরার গিরিগুহায় দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন রঙ-বিশিষ্ট যে সমস্ত নিখুঁত চিত্রাবলী দেখা যায়, আলপনার ইতিহাসে কোথাও সেইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নক্‌শার আলপনা আঁকিয়া আসিতেছেন। দেখিতে গেলে, আলপনা খানিকটা গতানুগতিকভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই কারণেই একদিকে যেমন উহার মধ্যে মৌলিকতা বা নূতনত্বের অভাব দেখা যায়, অপর দিকে আবার তেমনি একই লতা বা একই নক্‌শা পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ করিয়ার নৈপুণ্যে উহাকে সমৃদ্ধ মনে হয়। বিশেষ করিয়া কোনও রকম মাপ জোখ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র অঙ্গুলি-চালন ও অঙ্গুলির সাবলীল ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কয়েকটি মাত্র রেখার সাহায্যে বিচিত্রতর চিত্র ফুটাইয়া তোলা অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কাজ নিঃসন্দেহ। তখনকার দিনে অধিকাংশ মেয়েদেরই শিশু বয়স হইতে এই ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

বস্তুতঃ এই **পুনরুক্তি** বা **পুনঃকরণ** ও নক্‌শাগুলির **সমভাবাপন্নতাই** আলপনার বৈশিষ্ট্য। আলপনায় ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ইত্যাদি অপেক্ষা বৃত্তাকার নক্‌শারই চল অধিক। **বৃত্তাকার নক্‌শাকেই আলপনার প্রাণ** বলা যাইতে পারে। **মাঘমণ্ডল** বা **তারাব্রতের** আলপনাগুলিতেও দেখ—বৃত্তকার নক্‌শাই উহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন পূজা-পার্বন, লোকাচার, মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি হইতেই আলপনার সৃষ্টি। বিভিন্ন ছড়া ও আলপনার মধ্য দিয়া কখনও কখনও মেয়েরা ব্রতানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুটিকে লিপিবদ্ধ করিত—কাজেই অনুষ্ঠানাদির আলপনার মধ্যে পদ্ম, লতামণ্ডন, ফুলপাতা, নদনদী, পল্লীজীবনের দৃশ্য, পশু, পক্ষী, মাছ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আলপনা দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ছবির মধ্যে বাস্তবতাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা মণ্ডন করিবার প্রচেষ্টাই যেন অধিকতর পরিস্ফুট। যেমন নদীর ছবিতে নদীর আসল রূপ ফুটানো অপেক্ষাও নদীটিকে একটি মণ্ডন হিসাবে ব্যবহার করিবার দিকেই চিত্রকারিণীর অধিকতর যত্ন দেখা যায়। এই কারণেই আলপনাকে একটি **মণ্ডনশিল্প** বলা হয়।

কিন্তু পাড় বা লতামণ্ডনের বেলায় এই ব্যবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। আলপনার সমস্ত লতামণ্ডনগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা মেয়েরা নিজেদের মন হইতেই সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতির বিভিন্ন লতাপাতাকে

ভিত্তি করিয়াই বাংলার মেয়েরা **কল্‌মিলতা, শঙ্খলতা, খৈ-লতা, কলাছড়ি** প্রভৃতি রচনা করে। লতামণ্ডনে প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতা ও মেয়েদের মনের



**তারাব্রতের আলপনা**

এই আলপনাটিতেও বৃত্তের প্রাধান্য লক্ষ্য করিবে, বৃত্তই বাংলার আলপনার প্রাণ

এই সহজ সাবলীল ভঙ্গী ফুটিয়া উঠে বলিয়াই উহা সূক্ষ্মতায় ও সৌন্দর্যে অন্যান্য সকল প্রদেশের লতামণ্ডনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ প্রভৃতি

অঞ্চলের আলপনায় দড়ির ফাঁস, বিন্দু, জ্যামিতিক নক্শা প্রভৃতিরই অধিক চল দেখা যায় এবং ঐ সকল অঞ্চলে সাধারণতঃ হলুদ, লাল, প্রভৃতি শুকনো গুঁড়োরই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এই কারণেই হয়ত ঐ সকল অঞ্চলে আলপনা **রঙ্গোলী** নামে অভিহিত হয়।

প্রাচীন বাংলার এই মণ্ডনশিল্প **'আলপনা'** ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে কেমন করিয়া আজ আধুনিক বাংলার গৃহ-প্রসাধনের প্রধান উপকরণের পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। আজকাল প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেয়েদের আলপনা শিখাইবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। মেয়েদের



তোমাদেয় শিল্পী মনকে সুপ্ত হইতে দিও না

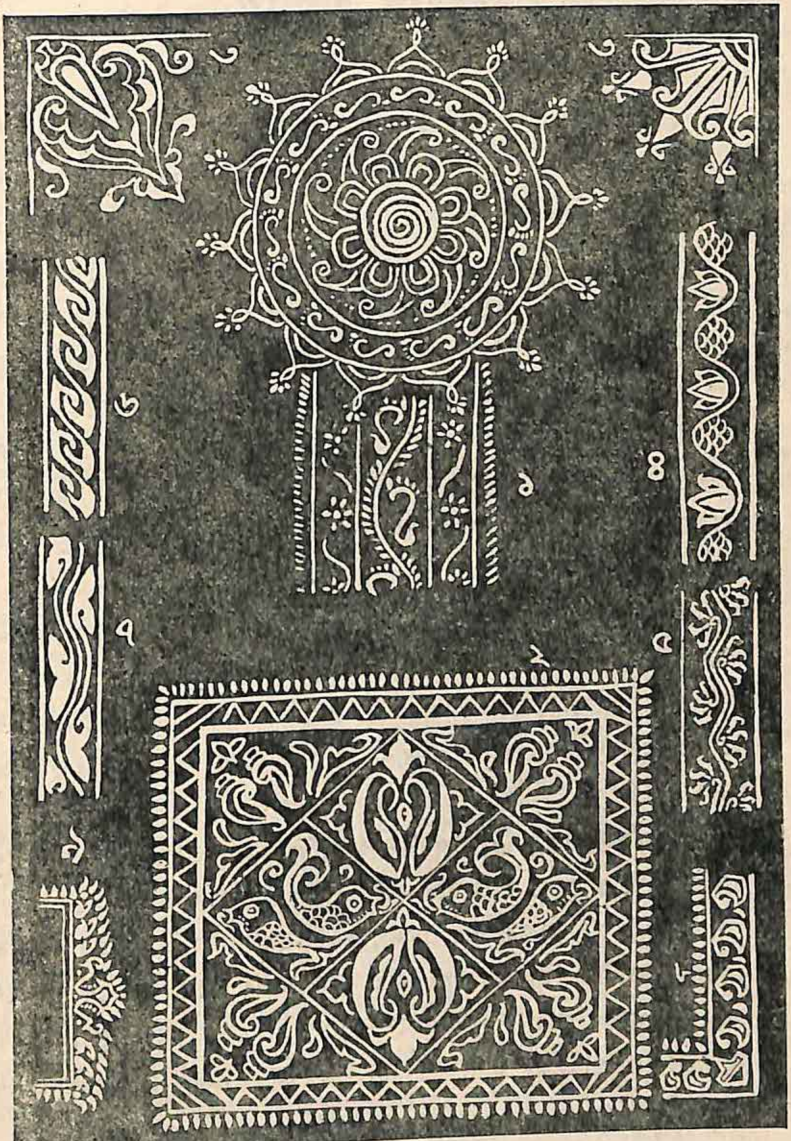
স্বভাবতঃই শিল্পী-মন। শিল্প সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা উহাদের অন্তর্নিহিত। এই কারণেই তখনকার দিনের মেয়েরা বিনা শিক্ষায় বিভিন্ন লতা-পাতা, নক্শা, ফুল ইত্যাদি আলপনার মধ্যে অতি সহজেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিত।

তোমরাও বাংলার মেয়ে, তোমাদেরও সহজাত শিল্পী-মন। গৃহ-রচনার ভার তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমাদের শিল্পী মনের শক্তিকে কখনও লুপ্ত হইতে দিও না। পরিচ্ছন্নতায় ও প্রসাধনে ছবির মতন করিয়াই তোমাদের গৃহখানি রচনা কর। ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালেব গায়ে, ছাদের খিলানে বিভিন্ন ছাঁচের আলপনায় আঁকিয়া গৃহখানিকে শ্রীমণ্ডিত কর। আলপনার প্রতি রেখায় অঙ্কিত কর অন্তরের শিল্পীদেবতাকে। প্রসাধনের প্রতি কাজে **নিজের মনকে প্রতিফলিত করাই** গৃহসজ্জার প্রথম সোপান জানিবে।



মাঘমণ্ডলের ব্রত আলপনা

যদিও বিভিন্ন জিনিসের ছবি দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহাদের স্বাভাবিকতা অপেক্ষা মণ্ডনের প্রতিই যেন অধিকতর লক্ষ্য




বিভিন্ন প্রয়োজনে আলপনার নক্‌শা

১। লক্ষ্মীপূজার, ২। বরাসনের, ৩। ঘরের কোণের, ৪। পদ্মলতা ও খৈ-লতা
৫। কলাছড়ি, ৬। শঙ্খলতা, ৭। কল্‌মিলতা, ৮। ঘরের কিনারের, ৯। খিলানের

# তৃতীয় অধ্যায়

## গৃহ-পরিচালনা

***গৃহকর্মে শ্রমবিভাগ ও সময় তালিকা***—গৃহ সমাজের একটি অংশ। কতিপয় গৃহের সমষ্টি হইতেই সমাজের সৃষ্টি। সেই হিসাবে দেখিলে গৃহকে একটি ছোটখাট সমাজরূপে কল্পনা করা যায়। সমাজ বড়—বহু লোককে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ ছোট, সেইজন্য গৃহের লোকসংখ্যাও কম। তাঁতীর তাঁত বোনা, চাষীর চাষ করা, ধোপার কাপড় কাচা প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি যেমন বিভিন্ন লোকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, ঠিক তেমনি গৃহেও বিভিন্ন কাজ ও কাজের বিভাগ রহিয়াছে। গৃহের সুষ্ঠু পরিচালনা করিতে হইলে বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি এই বিভিন্ন কাজগুলি পরিবারের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে। আদর্শগৃহ তাহাকেই বলে, যে গৃহে স্বামী, পুত্র, আত্মীয়-পরিজন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কর্মগুলি যথাসময়ে খুশী-মনে করিয়া যায়। গৃহকর্মগুলি গৃহের লোকদের মধ্যে যথাযথ বন্টন করা ও উহাদের দিয়া খুশী মনে তুমি কিভাবে ঐ কাজগুলি করাইয়া লইবে, উহার দ্বারাই গৃহ-পরিচালনায় তোমার নিজের নৈপুণ্য ও কৌশল নিরূপিত হইবে। বস্তুতঃ গৃহকর্মগুলিকে গৃহের বিভিন্ন লোকের দায়িত্বে যথাযথ ভাগ করিয়া দিবার উপরেই নির্ভর করে গৃহের সুশৃঙ্খল পরিচালনা।

***শ্রমবিভাগের উদ্দেশ্য***—গৃহ পরিচালনার ভার যদিও গৃহকর্ত্রীর উপরেই ন্যস্ত, তবুও গৃহের যাবতীয় কর্মই একলা তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব নহে। কাজেই তুমি যদি গৃহকর্ত্রী হও, সংসারের বিভিন্ন কাজগুলি বিভিন্ন বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও, দেখিবে কর্মভার অনেকটা লাঘব হইয়াছে এবং কর্মের অন্তরালে তোমারও কিছুটা অবসর মিলিয়াছে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক লোকেরই যেমন **শ্রমের** প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন **বিশ্রামের**।

সংসারের বিভিন্ন কাজগুলি বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করা—সংসারে যে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধে প্রত্যেককেই সজাগ ও সচেতন করিয়া রাখা। সংসারের সকলের সমবেত চেষ্টাতেই আদর্শ গৃহ গড়িয়া উঠে। গৃহকর্ম-

গুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া শক্তি ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন লোকের হাতে বণ্টন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য, সকলের পারস্পরিক প্রচেষ্টায় একটি সার্থক কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করা, যাহার মধ্য দিয়া গৃহ-পরিবেশে একটি অনুপম লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিবে।

ইহা ছাড়াও তোমরা জান, **গৃহের ধর্মই হইতেছে সংসারের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া সহানুভূতি ও সহযোগিতায় পরস্পরকে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা।** সংসারের সমস্ত কাজগুলি পরিবারের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এক একটি যোগসূত্র বলিয়া জানিবে। খেলায় যেমন বিভিন্ন লোক এক একটি অংশ গ্রহণ করে, তেমনি জানিবে সংসারের এক একটি কাজও বহু লোকের পরিশ্রমে সার্থক হইয়া উঠে। ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির পরস্পর সহযোগিতাতেই একটি কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া গৃহকর্মগুলি মানুষের মনের খোরাক যোগায়, কাজে লিপ্ত থাকিলে সংসারের নানা খুঁটি-নাটিতে অযথা মন ক্ষত-বিক্ষত ও বিচলিত হয় না। অলস কর্মবিমুখ মনে নানা অবাস্তব চিন্তা জাগিয়া উঠে এবং তাহাতেই গৃহের সুখ ও শান্তি নষ্ট হয়।

গৃহকর্ম শিশুদের শিক্ষারও একটি প্রশস্ত পথ। সুতরাং উহাদের বয়স অনুযায়ী দেহ ও মনের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া গৃহকর্ত্রী, উহাদের দ্বারা সম্ভব, এইরূপ কাজগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব উহাদের উপরই ছাড়িয়া দিবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই উহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণগুলির উন্মেষ হইতে থাকিবে।

***শ্রম-বিভাগ***—আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দাস-দাসী-পরিবৃত বৃহৎ সংসার। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, আশ্রিত বহুলোক, অনেক সময় একসঙ্গে একই সংসারে বসবাস করিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা ও বিবেচনা সহকারে কাহার কি কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে হয়। দাসদাসীর প্রাচুর্য আমাদের দেশেই দেখা যায়। কিন্তু দাসদাসী আছে বলিয়া, সংসারের যাবতীয় কাজ উহাদের উপর চাপাইয়া, নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া দিনাতিপাত করিব, এইরূপ চিন্তা কখনও উচিত নয়। উহারা প্রত্যেকেই মানুষ—তোমারই মত সুখদুঃখ-বোধ উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, এ-কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া, নিজের কাজ যতটা সম্ভব নিজেই সম্পন্ন করিবে। উহাদের দ্বারা রান্না ইত্যাদি, যে কাজের জন্য যাহাকে নিযুক্ত করা হয় সে কাজগুলিই করাইয়া লইবে। পশ্চিমের দেশগুলিতে দাসদাসীর কাজের জন্য লোক প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সেই সমস্ত দেশে প্রত্যেক গৃহেই প্রত্যেকের

কাজ নিজেকে করিয়া লইতে হয়, 'উহা দাসদাসীর কাজ', 'ইহা আমার কাজ' এইরূপ ভেদবুদ্ধি সেখানে নাই। **প্রত্যেক কাজকেই সমান সম্মানজনক মনে করিবে।** সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে যাহাই করা হোক না কেন, উহাতে



প্রত্যেক কাজই সমান সম্মানজনক

অগৌরবের কিছু থাকিতে পারে না। গৃহ-প্রসাধন, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি প্রধান বিভাগে, যে-সমস্ত কাজে অত্যধিক শারীরিক শ্রম প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণতঃ পুরুষদেরই করণীয়। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ হইতে বিরত রাখাই কর্তব্য। তাহাদের মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে, এবং সংসারে তাহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন এই বোধ জাগাইতে শ্রম বেশী হইবে না এইরূপ কতকগুলি কর্ম কিন্তু তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিবে। প্রতি পদেই তাহাদের অনুভব করিতে দিবে যেন তাঁহাদের ছাড়া সংসার চলে না। আশ্রিত-পরিজনদের কাজগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিবে যাহাতে তাঁহারা মনে করিতে না পারেন —তোমার সংসারের যাবতীয় কাজ তাঁহাদের দিয়া করাইয়া লইতেছ। আবার তুমি যদি কোন রকম কর্তব্য কর্ম তাঁহাদের না দাও, তাহা হইলে তাঁহারা যে আশ্রিত এই বোধটি সর্বদা তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকিবে। গৃহ-প্রসাধন ইত্যাদি কাজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কর্তব্য অনেক। ঘর পরিষ্কার করা, জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখা, বিছানা করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজগুলি ছোটরাই করিতে পারে। রান্না করা, কাপড় কাচা, পরিবেশন ইত্যাদি কাজেও ছেলে-মেয়েরাই মায়ের সাহায্য করিবে। বাগানের কাজেও ঘরের ছেলেমেয়েরাই

প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে গৃহকর্মগুলির বিভিন্ন বিভাগ করিয়া বয়স, শক্তি ও রুচি অনুযায়ী গৃহের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারিলে দেখিবে, তোমার গৃহকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে, গৃহের কাহারও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইতেছে না এবং সর্বোপরি তোমার গৃহ-পরিবেশও অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

***সময়-তালিকা***—সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে—পুরুষ উদয়াস্ত, অর্থাৎ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, কিন্তু মেয়েদের কাজের যেন কোনও শেষ নাই—উহাদের সংসারের চাকা ঘুরিয়াই চলে। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে যথার্থ সত্য নাই। মেয়েদের কাজও বিরামহীন নয়। কেবল যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার অভাবেই উহাদের কাজগুলি বিশৃঙ্খলভাবে একটানা একটার পর একটা চলিতে থাকে। গৃহকর্মগুলির সুশৃঙ্খল পরিচালনা করিতে হইলে, অর্থাৎ প্রত্যেকের শ্রম ও বিশ্রামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গৃহকর্মগুলির ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি কাজের **সময়-তালিকা**। বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। ইহার যথাযথ সমাধা হয় একমাত্র সময়-তালিকার সাহায্যেই। গৃহের সময়ও সীমাবদ্ধ, উহা অফুরন্ত নয়। কিন্তু গৃহের কার্যাবলীর সংখ্যা আরও অনেক অধিক, এবং উহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সুতরাং গৃহে গৃহকর্মের জন্য সময়-তালিকার প্রয়োজন আরো বেশী হইবে ইহা আর বিচিত্র কি।

**সময়-তালিকা** তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমেই ভাবিয়া লইবে কোন্ কোন্ কাজগুলি তোমার প্রত্যহই করিতে হয়; যেমন রান্না করা, খাওয়া, বিছানা করা ইত্যাদি। সংসারের কাজগুলির মধ্যে প্রত্যহ করিতে হয় না, সপ্তাহে একবার করিলেও চলে, এইরূপও বহু কাজ থাকে; যেমন সংসারের আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা, কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা ইত্যাদি। এইরূপ এক-একটি কাজের জন্য সপ্তাহে এক-একটি দিন ধার্য করা যায় যেমন রবিবারে কাপড় কাচা, সোমবারে ঘর সাফ করা ইত্যাদি। আরও কতকগুলি কাজ থাকে যেগুলি মাসে একবার করিলেও চলে; যেমন তোলা বাসন-কোসনগুলি পরিষ্কার করা, গরম কাপড় রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি। এইভাবে সংসারের বিভিন্ন কাজগুলির প্রথমে তালিকা তৈয়ারি করিয়া লও। প্রতিদিন যে কাজগুলি করিতে হয় এবং যে-গুলির জন্য মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যেমন রান্না, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি, সেইগুলিকে সে সময়ের জন্য স্থির রাখিয়া অন্য কাজগুলির

জন্য তোমার সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করিয়া লও। সপ্তাহের বিশেষ কাজগুলির জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য করিয়া ফেল ও প্রতিদিনের কাজের তালিকার সহিত দিন ও সময় অনুযায়ী এ কাজগুলিকেও জুড়িয়া দাও। এই ভাবেই গৃহকর্মের সময়-তালিকা তৈয়ারি করিতে হয়। নীচে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাজগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

দৈনিক কাজ :—

(১) শয়নঘর, বৈঠকখানা ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহৃত ঘরগুলির পরিচ্ছন্নতা বিধান ( ঝাড়ু দেওয়া, মোছা, রাত্রে ব্যবহৃত বিছানা, মশারি রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি )।

(২) স্নানের ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করা।

(৩) বাজার করা, আহার্য তৈয়ারি ও পরিবেশন করা।

(৪) বাসন-কোসন ধোয়া।

সাপ্তাহিক কাজ :—

(১) উপরের তলা পরিষ্কার করা।

(২) নীচের তলা পরিষ্কার করা।

(৩) কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা।

(৪) জামা-কাপড় সেলাই করা।

মাসিক কাজ :—

(১) তোলা বাসন-কোসন পরিষ্কার করা।

(২) গরম কাপড়-চোপড় ইত্যাদির তদারক করা।

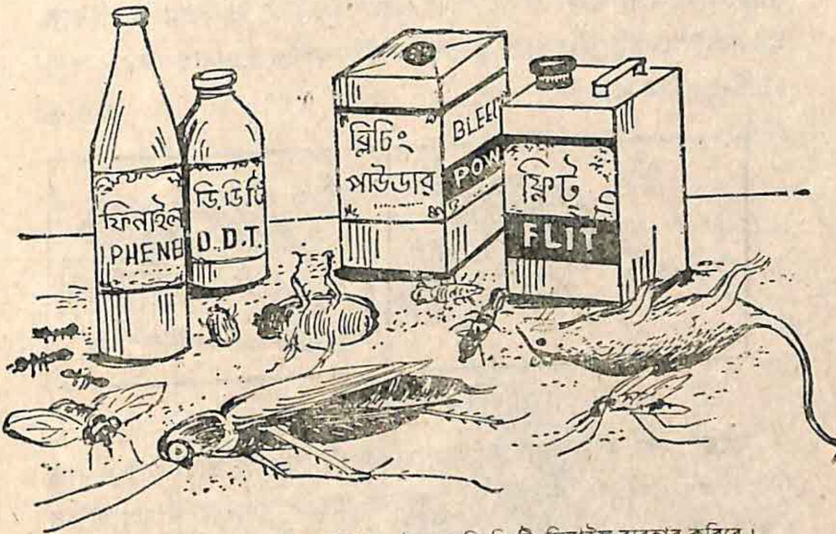
(৩) বই ইত্যাদি গোছানো।

(৪) জামা-কাপড় মেরামত করা।

## গৃহের কীট-পতঙ্গ ও তাহাদের প্রতিকার

বাসগৃহের নানারকম কীট পতঙ্গ বলিতে আমরা সাধারণতঃ মশা, মাছি, পিঁপড়া, উই, ছারপোকা, আরশুলা, উকুন, গুবরে পোকা, উপমক্ষিকা, রূপালী পোকা, মথ, ইঁদুর, বিছা, মাকড়সা, কেঁচো ইত্যাদি বুঝি। ইহাদের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের যে কত ক্ষতি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহাদের দূর করিবার উপায়গুলি তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে আলো বায়ুহীন অন্ধকার, ভিজা গর্ত বা ফাটলযুক্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন স্থানই এইসব পোকামাকড়ের প্রধান উৎপত্তি স্থান।

**পিঁপড়া, আরশুলা, গুবরে পোকা** প্রভৃতি অত্যন্ত নোংরা জায়গায় থাকে ও সেখান হইতে নানারকম আবর্জনা ও রোগজীবাণু প্রভৃতি গৃহে লইয়া আসে। আরশুলা প্রভৃতির উপদ্রবে গৃহের বাসিন্দাদের প্রায়ই অস্থির হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আজকাল বাজারে অনেক রকম পোকা মারিবার পাউডার




পোকা-মাকড় দূর করিতে ফ্লিট, ব্লিচিং পাউডার, ডি-ডি-টি, ফিনাইল ব্যবহার করিবে।

পাওয়া যায়, সেগুলি আনিয়া ব্যবহার করিবে। ফ্লিট বা শতকরা ১০ ভাগ ডি-ডি-টি দ্রব মাসে দুই তিন বার করিয়া ব্যবহার করিলে আরশুলা, পিঁপড়া, ঝিঁঝিঁ পোকা, উই ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। মেঝের ফাটল, গর্ত বা

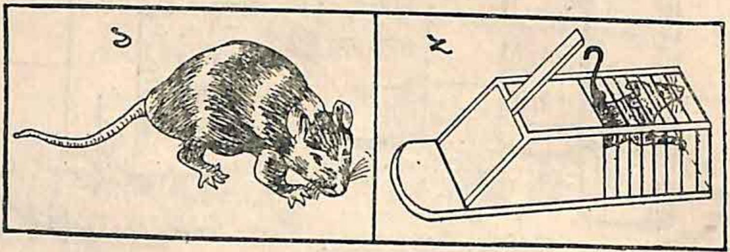


পিঁপড়া আরশুলা উইপোকা

অন্ধকার স্থান ইত্যাদির মধ্যে উপরোক্ত দ্রব্য বেশী করিয়া ব্যবহার করিবে।

**নেংটি ইঁদুর, ইঁদুর** প্রভৃতিও বাহিরের ড্রেন, ডাষ্টবিন, পায়খানা হইতে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ ও রোগজীবাণু গৃহে বহন করিয়া আনে ও

গৃহের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। ইঁদুর মারিবার জন্য অনেকে **ইঁদুর-কল** ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে আবার খাদ্যদ্রব্যাদির সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়াও ইঁদুর মারিবার প্রয়াস পান। কিন্তু ইঁদুর যাহাতে গৃহে না আসে সর্বাগ্রে তাহার জন্যই সকলের সচেতন হওয়া আবশ্যক। **ড্রেনের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দাও,** ঘরের মধ্যে বাহির হইতে প্রবেশ করা যায় এইরূপ গর্ত ইত্যাদি থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া দাও। খাদ্যদ্রব্যাদি কখনও কোথাও অনাবৃত বা ছড়াইয়া রাখিও না।




ইঁদুর ও ইঁদুর মারা কল

**মাছি**—মশা, মাছি ইত্যাদি পোকামাকড়গুলি গৃহে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতি রোগের জীবাণু মাছির দ্বারাই বাহিত হয় ও খাদ্য, পানীয় ইত্যাদিতে ছড়াইয়া পড়ে। 'র‍্যাট ফ্লি' ( rat flea ) নামক মাছির ন্যায় একরকম বিশেষ ধরনের পোকা প্লেগের জীবাণু মানুষের দেহে সংক্রামিত করে। তোমরা জান, আবর্জনাযুক্ত জায়গাগুলিতে মাছি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ডিম উহারা একই সঙ্গে একই জায়গায় পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকটি ডিম এক-একটি মাছিতে পরিণত হয়। সুতরাং মাছি মারা অপেক্ষা মাছির ডিমগুলি নষ্ট করা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং মাছি যাহাতে জন্মাইতে না পারে, সেদিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কাজেই




খাদ্য কণার উপর মাছি

তোমরা গৃহ ও গৃহপরিবেশকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখিবে। আবর্জনাদি কোনও একটি পাত্রে ফেলিয়া মুখে আঁট ঢাকনি দিয়া দিবে। গ্রামদেশে সাধারণতঃ ফ্লাশ পায়খানা থাকে না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তোলা পায়খানায় সর্বদাই মলের উপর ছাই চূণ বা বালি ফেলিয়া রাখা উচিত, যাহাতে মাছি বসিতে না পারে। মাসে ২।৩ বার গৃহের আশে পাশে ডি-ডি-টি বা ব্লিচিং পাউডার ছড়াইলে এবং গৃহের মেঝে ও দেওয়ালে ফ্লিট বা **শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ ডি-ডি-টি** দ্রব স্প্রে করিলে মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উৎপাত দেখিতে দেখিতে কমিয়া আসিবে। ২।৩ দিন অন্তর অন্তর ঘরের মেঝে ফিনাইল জল দিয়া মুছিয়া নেওয়া খুব ভালো।

গৃহে মাছির উৎপাতে অনেকে মাছি মারিবার জন্য একরকম আঠাযুক্ত কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৫ ভাগ রেড়ীর তেল ও ৮ ভাগ রজন একত্রে



ফিনাইল মাছির প্রতিরোধক

গরম করিয়া মোটা কাগজে লেপিয়া এই কাগজ তৈয়ারি হয়। অনেকে আবার সামান্য দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সহিত **ফরমালিন জাতীয় বিষ** ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেন। ইহা ছাড়া রান্না ও খাবার ঘরের জানালাতে সরু তারের জাল দিলে মাছির উৎপাত কমে

**মশা**—মশার উৎপাতও প্রায় গৃহেই দেখা যায়। মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগের জীবাণু মানব শরীরে সংক্রামিত হয়। **অ্যানোফিলিস** জাতীয় মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। মাছির ন্যায় এই মশাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহারাও ১০০ হইতে ৫০০টি ডিম একসঙ্গে পাড়ে। সাধারণতঃ জলা জায়গায় ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে এবং জলের বুকে ডিম হইতেই মশা বাহির হইয়া আসে। সুতরাং মশা মারা অপেক্ষাও মশা যাহাতে জন্মাইতে না পারে তৎপ্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। গৃহের আশেপাশে কোথাও জলাভূমি রাখিতে নাই। ভিজা স্যাঁতসেঁতে ডোবাগুলি ভরাট কর এবং অন্ধকার ঝোপঝাড়, আবর্জনা স্তূপ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ফেল। ড্রেনের মধ্যে কেরোসিন বা শতকরা ১০ ভাগ ডি-ডি-টি দ্রব ঢালিয়া দাও। কেরোসিনের মধ্যে মশার ডিম বাড়িতে বা বাঁচিতে পারে না। সেই জন্য খোলা ড্রেনে মাঝে মাঝে কেরোসিন দিবে। গৃহে মশার প্রাদুর্ভাব হইলে মশারি খাটাইবে, কিন্তু মনে রাখিও **মশা কালো রং ভালবাসে**। সুতরাং কালো মশারি বা পর্দা ইত্যাদি কখনও ব্যবহার করিও না। ফ্লিট বা ডি-ডি-টি স্প্রে করিয়া দিলে মশা-মাছি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় ইত্যাদির উপদ্রব কমিয়া যায়। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া **ধূপধুনো, তামাক, মশক নিবারণী ধুনো** ইত্যাদি জ্বালাইলে উহার ধোঁয়ায় মশা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। নেবুর তেল ( citronella oil ) ১ ভাগ, ৪ ভাগ নারিকেলের তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া দেহে মাখিলে কয়েক ঘণ্টার জন্য মশা বসে না।

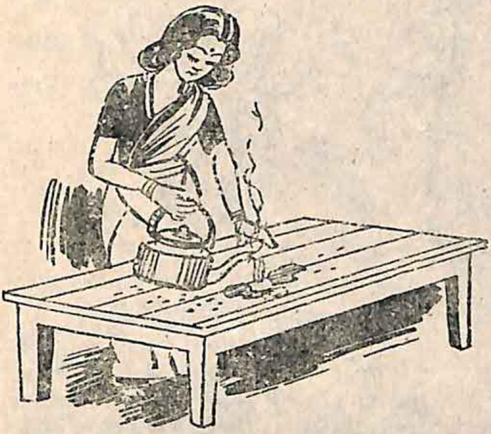


ফ্লিটে মশার উপদ্রব কমে

**কুকুরের গায়ের পোকা**—গৃহ-পালিত কুকুর বিড়ালের গায়েও একরকম ক্ষুদ্র কীট জন্মাইতে দেখা যায়। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতাই ইহার একমাত্র কারণ। শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ ডি-ডি-টি পাউডার সামান্য পরিমাণ লইয়া মাসে দুইবার মাখাইয়া দিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইবে। এই সঙ্গে কুকুরের থাকিবার জায়গায়ও ডি-ডি-টি দিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। পাউডার লাগাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যেন চোখে না লাগে; বিড়াল প্রায়

সময় তাহাদের গা চাটে, সেইজন্য তাহাদের গায়ে ডি-ডি-টি পাউডার না দেওয়াই ভালো।

**ছারপোকা**—মশা-মাছির ন্যায় প্রায় প্রতি গৃহে ছারপোকার উৎপাতও কম নয়। ছারপোকা সাধারণতঃ খাট, চৌকি, চেয়ার, ময়লা বিছানা পত্র ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকেই জন্মিয়া থাকে। খাটের ফাঁকে গরম জল ঢালিয়া ছারপোকা মারিবার বিষয় তোমরা পড়িয়াছ। ছারপোকারও জন্মস্থান অপরিচ্ছন্ন ময়লা বিছানাপত্র ইত্যাদি। সুতরাং ছারপোকা দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে শয্যাদ্রব্যগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা প্রয়োজন। শতকরা



গরম জলে ছারপোকা মরিয়া যায়



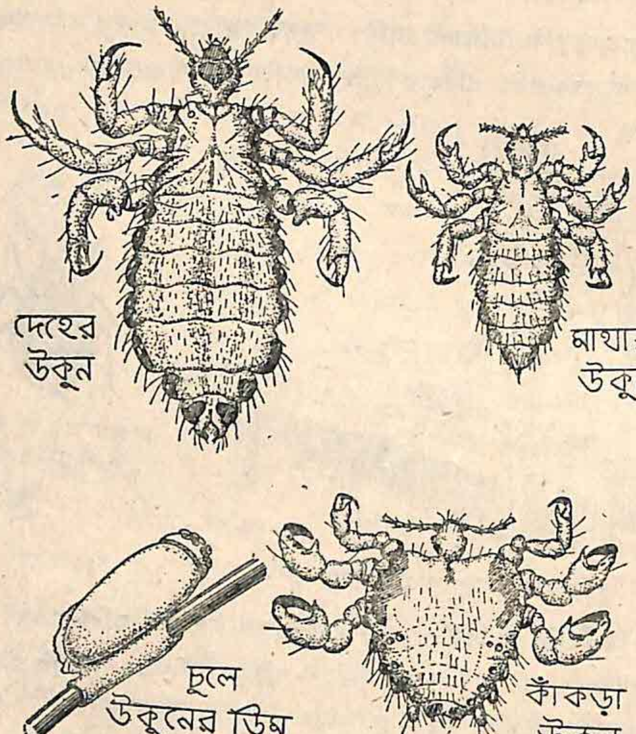
ছারপোকা ( বড় করিয়া দেখানো )

৫ ভাগ ডি-ডি-টি দ্রব বিছানাপত্রে, মেঝে দেওয়ালে স্প্রে করিলে এবং জামা কাপড়ে বিশেষ করিয়া কোণগুলিতে ১০ ভাগ ডি-ডি-টি পাউডার ছড়াইলে ছারপোকা নির্মূল হইয়া যাইবে।

**উকুন**—আমরা কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর গায়ের পোকার কথাই আলোচনা করিলাম, কিন্তু মানুষের গায়েও অনুরূপ পোকা কখনও দেখ নাই কি? তোমরা নিশ্চয়ই উকুন দেখিয়াছ, উকুনই মানুষের গায়ের পোকা। উকুন সাধারণতঃ তিন প্রকারের যথা, মাথার উকুন, দেহের উকুন ও কাঁকড়া উকুন। উহারা যথাক্রমে মানুষের মাথায়, দেহে ও তলপেটের নিকট বাসা করে এবং ওইসব জায়গায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলি চুলের সঙ্গে শক্তভাবে লাগিয়া থাকে ( চিত্রে দেখ ) এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত চুল ছাইয়া ফেলে। উকুন নানা রকম চর্মরোগের জীবাণু বহন করে। উকুনের হাত হইতে

নিষ্কৃতি পাইতে হইলে প্রথমেই নিজের দেহ ও পরিচ্ছদাদির পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হইবে। মাথায় উকুন হইলে উকুনের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই চুল কাটিয়া ফেলেন। আবার অনেকে হাল্কা **লাইসল, ডেটল** বা **শতকরা ৫ ভাগ ডি-ডি-টি** দ্রব প্রভৃতির জল দিয়া চুল ধুইয়া ফেলেন।

**মনুষ্য দেহাশ্রয়ী তিন প্রকারের উকুন ঃ—**




মনুষ্য দেহাশ্রয়ী উকুন ও তাহার ডিম অনেক বড় করিয়া দেখানো

ট্যালকম পাউডারের সহিত শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে ডি-ডি-টি পাউডার মিশাইয়া গয়ে মাখিলে দেহের উকুন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

**কাপড়-কাটা কীটাদি**—কাপড়-কাটা পোকাগুলির কথা আলোচনা না করিলে গৃহের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গাদির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে এই কাপড়-কাটা পোকাগুলি একরকম স্থায়ী উপদ্রব হিসাবেই দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে খয়েরী রঙের প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা

কতকগুলি পোকা ( Moth ) আছে। দেখিতে গেলে মনে হয়, ইহারা যেন লাফাইয়া চলে। আর কতকগুলি দেখিতে রূপালী, চক্‌চক্‌ করে ও মাছের মতন বাঁকানো এই খয়েরী ও রূপালী পোকা সব রকম কাপড়ই কাটিয়া ফেলে, কিন্তু সাধারণতঃ খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পরিচ্ছদাদিতেই যেন উহাদের ঝোঁক কিছুটা বেশী। আর কতকগুলি পোকা আছে উহারা কেবল গরম কাপড়ই কাটে। এই পোকাগুলির হাত হইতে



রূপালী পোকা



মথ

গরম জামা-কাপড়গুলিকে বাঁচাইতে হইলে, কাপড়গুলি হইতে প্রথমে **পেট্রোলের সাহায্যে** তৈলাক্ত দাগ ইত্যাদি উঠাইয়া কাপড়গুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। তৈলাক্ত দাগযুক্ত অংশই এই পোকারা প্রথমে কাটিতে আরম্ভ করে। **নিমপাতা, কর্পূর, ন্যাপথালিন, তামাকপাতা** প্রভৃতি কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া



ন্যাপথালিন ইত্যাদি দিয়া রাখিবে

দিলে পোকা সহজে আসে না।

সর্বদা ব্যবহার কর না, এইরূপ গরম কাপড়গুলি আঁটা ঢাকনিযুক্ত টিনের ট্রাঙ্কের মধ্যে কর্পূর, ন্যাপথালিন ইত্যাদি দিয়া রাখিয়া দিবে। পোকা যদি কাটিতে আরম্ভ করিয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত পোকা বাছিয়া কাপড়লি রৌদ্রে দিবে এবং ট্রাঙ্কটি ঝাড়িয়া উহার ভিতরটা কেরোসিনমাখা ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া লইবে। তারপরে ট্রাঙ্কটি রৌদ্রে দিয়া উহার মধ্যে **পাইরেথ্রাম** (pyrethrum) বা **ডি-ডি-টি পাউডার** দিয়া কাপড়গুলি উঠাইয়া রাখিবে। কয়েক দিন অন্তর অন্তর এইরূপ করিলে সহজেই গরম কাপড় হইতে কাপড়-কাটা পোকাগুলি দূর হইবে।

## ধাতু-নির্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার

প্রায় প্রতি গৃহেই কিছু-না কিছু বিভিন্ন ধাতুনির্মিত জিনিসপ্রত্রাদি দেখা যায়। যথাযথ উপায়ে উহাদের যত্ন লওয়া ও পরিষ্কার করার উপরেই উহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কোন্ কোন্ ধাতুনির্মিত বাসন কিভাবে পরিষ্কার করিতে হয়, উহা তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্য জিনিসগুলির সমস্ত ময়লা দূর করিয়া জিনিসগুলিকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া উহাদের সৌন্দর্য বর্ধন করা।

বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। এখন দেখা যাক, কোন্ ধাতু তোমরা কোন্ জিনিসের প্রয়োগে সহজে পরিষ্কার করিতে পারিবে। ধাতুদ্রব্যগুলিকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। **নরম ধাতু-নির্মিত দ্রব্য ও কঠিন ধাতু-নির্মিত দ্রব্য।** নরম ধাতু বলিতে আমরা সেই সেই ধাতুকেই বুঝি যাহাতে সহজেই দাগ বা আঁচড় ইত্যাদি পড়ে, যেমন—তামা, এনামেল, রূপা ইত্যাদি। কঠিন ধাতু সেইগুলিই জানিবে, যেগুলিতে সহজে দাগ ইত্যাদি পড়ে না, যেমন—পিতল, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি।

**এনামেল**—আজকাল বেশির ভাগ গৃহেই রন্ধন ও অন্যান্য কাজে এনামেলপাত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এনামেলের পাত্রগুলির লেপ অত্যন্ত পাতলা ও হাল্‌কা হইয়া থাকে। এই কারণেই উহা সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। এনামেলের পাত্র খুব উত্তপ্ত হইলে জায়গায় জায়গায় উহার লেপগুলি চটিয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ এনামেলের পাত্র রন্ধন করিবার বাসন হিসাবে ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত, তবে রন্ধন করা জিনিসগুলি উহাতে ঢালিয়া রাখিতে পার। এনামেল-পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে গরম জল ও সোডা দিয়া উহার ভিতরে-বাহিরে ধুইয়া ফেলিবে ; পরে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া রাখিবে।

**অ্যালুমিনিয়াম**—অ্যালুমিনিয়ামের দাম অপেক্ষাকৃত কম। বাসনও হাল্‌কা। ইহা সহজেই উত্তপ্ত হয় এবং তাপও অধিকক্ষণ সংরক্ষণ করে। এই সকল কারণে অ্যালুমিনিয়ামের চলও অধিক। চায়ের কেট্‌লি, ভাজিবার সস্‌প্যান প্রভৃতি অ্যালুমিনিয়ামেরই তৈয়ারি। অ্যালুমিনিয়ামের অসুবিধা এই যে, ক্ষার-পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে উহা সহজেই ক্ষয় হয়। এই কারণে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন **কখনও সোডার জলের ধুইতে নাই।** সোডার

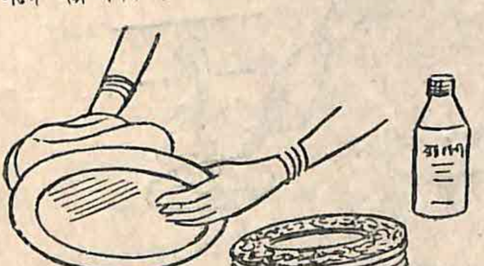
সংস্পর্শে আসিলেই অ্যালুমিনিয়াম কালো হইয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে পাতলা সাদা ছাই, অথবা মিহি খড়ির গুঁড়া ব্যবহার করিবে। খড়ির গুঁড়া সামান্য ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশাইয়া পাত্রটির গায়ে লাগাইয়া রাখ। পরে শুকাইয়া গেলে একখানি শুকনো কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে আল্‌গা হাতে ঘষিয়া পালিশ কর। পাতলা মিহি ছাই দিয়া মাজিয়াও অনুরূপ উপায়ে ঘষিয়া পালিশ করিতে পার।

**তামা**—তামার পাত্র বেশীর ভাগ পূজার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্যে তাম্র পাত্রটিকে ডুবাইয়া লও। পরে সামান্য জলের মধ্যে খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া ঐ নরম পদার্থটিকে পাত্রের গায়ে মাখাইয়া দাও। পরে একটুকরা কাপড় লইয়া পূর্বোক্ত উপায়ে হাল্‌কা হাতে আস্তে আস্তে পাত্রটি ঘষিয়া পরিষ্কার কর। তামার যে-সকল বাসন-কোসনাদি রান্নারকাজে ব্যবহৃত হয়, উহা **লেবু, তেঁতুলের জল** বা **ভিনিগার** ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কার করা যায়। সঙ্গে অল্প লবণ ব্যবহার করিলে আরো ভালো ও শীঘ্র পরিষ্কার হইবে।



প্রথমে খড়ির গুড়া পাত্রটির গায়ে মাখাইয়া দাও

**পিতল**—প্রায় প্রতি গৃহেই পিতলের বাসনের চল দেখা যায়। পিতলের গায়ে অত্যন্ত গভীরভাবে কোনও দাগ লাগিলে দেখিবে সামান্য **লেবুর রস, নুন** কিংবা **তেঁতুল** মাখাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া ভাল করিয়া মাজিয়া ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায়। লবণ ও ভিনেগার-সংযোগেও পিতলের পাত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। পরে সামান্য ব্রাসো ( Brasso ) বা



ব্রাসো লাগাইয়া পালিশ কর

খড়ির গুঁড়া ইত্যাদি লাগাইয়া পূর্ব-বর্ণিত উপায়ে ধীরে ধীরে পালিশ করিবে।

**কাঁসার পাত্র**—৭ ভাগ তামা ও ১ ভাগ টিন মিশাইয়া কাঁসা তৈয়ারি হয়। ইহার সহিত দস্তাও কিছু পরিমাণে মিশানো থাকে। কাঁসা পিতল অপেক্ষা দেখিতে উজ্জ্বল। অধিক উত্তপ্ত করিলে কাঁসার পাত্র ফাটিয়া যাইতে পারে। তামা বা পিতলের পাত্র যে-যে ভাবে পরিষ্কার করিয়া থাক, কাঁসার পাত্র পরিষ্কার করিতেও সেই সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে।

**ব্রঞ্জ**—( Bronze ) কলিকাতার ময়দানে ও অনেক রাস্তার চৌমাথায়, অনেক বড় বড় লোকের মূর্তি আছে তোমরা জান। সেইগুলি কিসের তৈয়ারি ধরিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের বেশীর ভাগই ব্রঞ্জ-এর তৈয়ারি। কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণেই ব্রঞ্জের সৃষ্টি। ব্রঞ্জের জিনিসও তোমরা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উহাতে খড়ির গুঁড়া মাখাইয়া এক টুকরা কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে পার।

**লৌহ**—লোহপাত্র অত্যন্ত ভারী বলিয়া ইহা আনা-নেওয়া বা নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হয়। তথাপি রন্ধনগৃহে লোহপাত্রের কিছু না-কিছু ব্যবহার দেখা যায়। রান্নার কড়াই, রুটি সেঁকিবার তাওয়া ইত্যাদি সাধারণতঃ লোহেরই হইয়া থাকে। অত্যধিক উত্তপ্ত লোহপাত্রে কখনও ঠাণ্ডা জল দিবে না, ইহাতে লোহপাত্রটি ফাটিয়া যাইতে পারে। লোহার



লৌহপাত্রটি ফাটিয়া যাইতে পারে

বাসন ইত্যাদি ধুইবার পর পরিষ্কার ভাবে মুছিয়া রাখিবে, নতুবা ইহাতে মরিচা ধরিতে পারে।

**ইস্পাত**—ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি ইস্পাতের তৈয়ারি। কিছু কাটিবার পরেই ছুরির ফলায় দাগ ধরিয়া যায়। সুতরাং ব্যবহারের পরেই ছুরি, কাঁটা

ইত্যাদি ধুইয়া ফেলিবে, কিন্তু উহাদের হাতলগুলি কখনও জলে ডুবাইবে না, কারণ ইহাতে হাতলগুলির রং চটিয়া যাইবে—জায়গায় জায়গায় হাতলগুলি ফাটিয়াও যাইতে পারে, এবং গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে ফলা হইতে উহাদের জায়গায় জায়গায় আল্‌গা হইয়া খুলিয়া আসাও বিচিত্র নয়। সুতরাং ব্যবহার করিবার পরে ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি যখন জলে ডুবাইবে, খেয়াল রাখিবে হাতলগুলি যাহাতে জলের উপর থাকে। ফলাগুলি যদি পরিষ্কার করিতে চাও, তাহা হইলে একটি আলু দু'টুকরা করিয়া উহাতে সামান্য **বাথব্রিক** ( bath brick )-এর পাউডার লাগাইয়া ফলাটিতে ঘষিয়া দাও, পরে পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধুইয়া মুছিয়া লও। শান পাথরে সামান্য বাথব্রিকের গুঁড়া দিয়া ছুরিখানি উহাতে শান দিয়া লইতে পার। বাথব্রিক আর কিছুই নয় ধাতু পরিষ্কার করিবার একরকম বিশেষ উপকরণ। শান দেওয়া প্রভৃতি কাজেও এই জিনিসটির যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। হাতলগুলি পরে একখানি ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

কাঁটা চামচ ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার আরও একটি উপায় আছে। একটি পাত্রে গরম জলের মধ্যে কিছুটা নুন ও সোডা মিশাইয়া উহার মধ্যে এই জিনিসগুলি দিয়া দু'এক মিনিট ফুটাইয়া লও। দেখিতে দেখিতে উহাদের পূর্বের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

**বিভিন্ন ধাতু-নির্মিত বাসন পরিষ্কার করিতে মনে রাখিবে ঃ—**

(১) যে-কোন ধাতুর বাসনই পরিষ্কার কর না কেন, উহা প্রথমেই সামান্য গরম সাবান জলে ডুবাইয়া উহা হইতে সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থগুলি দূর করিবে।

(২) পালিশ আরম্ভ করিবার পূর্বে পাত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া লইবে।

(৩) বাসনগুলিকে পরিষ্কার করিবার জন্য যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় উহা যেন সম্পূর্ণরূপে সেই পাত্রটি হইতে মুছিয়া লওয়া হয়।

(৪) পরিষ্কার করিবার জায়গার চারিধারে কাগজ বা কাপড় পাতিয়া লইবে, যাহাতে পরিষ্কার করা জিনিসগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিতে না হয়।

## মরিচা পড়া ও জলের দাগ

তোমরা প্রত্যেকেই দেখিয়াছ, কিছুদিন বাহিরে রাখিয়া দিলেই লোহায় মরিচা পড়ে। মরিচা কি এবং উহা কোথা হইতে আসে কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? মরিচা যে কেবলমাত্র লোহাতেই পড়ে তাহা নহে, তামা,

সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুগুলিতেও মরিচা পড়িতে দেখা যায়। মরিচা পড়া লোহার জিনিস সামান্য ঘসিলেই দেখিতে পাইবে একরকম লালচে চুর্ণ-জাতীয় পদার্থ উহা হইতে উঠিয়া আসিতেছে। ইহাকেই আমরা বলি **মরিচা**। লোহা যখন বায়ুর আর্দ্রতা ও বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, তখনই উহার গায়ে এই লাল চূর্ণগুলি জমিতে থাকে। লোহার পেরেক বা অন্য কোনও জিনিস যদি কয়েকদিন বাহিরের হাওয়ায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে উহার গায়ে মরিচার একটি পুরু আবরণ পড়িয়া যায়। কিন্তু পেরেকগুলি যদি কেরোসিন বা অন্য কোনও তেলের মধ্যে ডুবাইয়া একটি পাত্রে করিয়া হাওয়ায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে বহুদিন পরেও উহাতে মরিচার দাগ পড়িবে না। উহার কারণ কি? উহার কারণ আর কিছুই নয়, তেলের পুরু স্তর বা আবরণ ভেদ করিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না—এবং লোহার পেরেকগুলিও বায়ুর অক্সিজেন ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসে না, সুতরাং উহাতে মরিচাও পড়ে না। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে লোহার কল-কব্জা ও ছোটখাট জিনিসগুলিতে **ভ্যাসিলিন** বা অন্যান্য তৈলাক্ত জিনিস ( grease ) প্রভৃতি মাখাইয়া রাখিতে দেখা যায়।

গ্রামদেশে অনেক স্থলেই দেখা যায় গৃহস্থের বাড়ীর ছাদ ও দেওয়ালগুলি ঢেউখেলানো টিনের তৈয়ারি। এই টিনগুলিও যদি অনাবৃত বা কোনও রকম লেপহীন অবস্থায় হাওয়ায় অনেকদিন পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে উহাতেও মরিচা পড়িয়া যায়। এই কারণে গৃহস্থের অনেক সময় আলকাতরা বা অন্যান্য তৈলাক্ত রঙ ( paint ) ইত্যাদির দ্বারা টিনের উপর একটি লেপ দিয়া রাখেন। তোমরা প্রশ্ন করিতে পার, টিনে মরিচা পড়িবে কেন? তোমরা হয় ত জান না, একখানি লোহার পাতের উপর দস্তার লেপ লাগাইয়াই এই ঢেউখেলানো টিনগুলি তৈয়ারি হয়। বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসে বলিয়াই দস্তায়ও মরিচা পড়ে, তবে তাহা লোহা অপেক্ষা অনেক দেরীতে। অপরপক্ষে তুমি একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে—সোনা রূপায় দাগ পড়ে না; এমন কি ইস্পাত ( Stainless steel ) প্রভৃতি ধাতুগুলি হাওয়ার সংস্পর্শে আসিলেও উহাতে কখনও মরিচা পড়ে না। কাজেই দেখিতেছ বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসিলে কতকগুলি ধাতুতে মরিচা পড়ে, এবং লোহা উহার মধ্যে একটি। তামা বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া 'কপার অক্সাইড' (Copper oxide) এর সৃষ্টি

করে এবং পরে এই 'কপার অক্সাইড' বায়ুস্থিত কার্বন ডায়ক্সাইড এর সংস্পর্শে আসিয়া 'কপার কার্বনেট' (Copper carbonate)-এ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং দেখিতেছ, কার্বন ডায়ক্সাইডই তামায় মরিচা পড়ার প্রধান কারণ।

**জলের দাগ**—লোহা প্রভৃতি ধাতুতে যেমন মরিচার দাগ পড়ে, তেমনই পিতল কাঁসা ইত্যাদির পাত্রে যদি বহুদিন পর্যন্ত জল ইত্যাদি রাখিয়া দাও, কিম্বা ঐ পাত্রগুলি যদি জলের মধ্যে বসাইয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে ঐ পাত্রগুলির চারিধারে চক্রাকারে নীল দাগ পড়িয়াছে। এই দাগগুলির কারণও অক্সিজেন বলিয়াই জানিবে। বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসাতেই ঐ ধাতুগুলিতে অনুরূপ দাগ পড়িয়াছে। তোমরা জান, জলের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন আছে। জলমধ্যস্থিত অক্সিজেন ইত্যাদির সংস্পর্শে আসাতে পিতল প্রভৃতি ধাতুগুলিতে ঐরূপ দাগ পড়িয়াছে।

মরিচা ও মরিচা-জাতীয় দাগগুলি কিভাবে পড়ে দেখিলে। এখন দেখা যাক ঐ দাগগুলি দূর করিবার উপায় কি। সাধারণতঃ ঐ দাগগুলি আমরা ছাই ইত্যাদি দ্বারা মাজিয়া ঘসিয়াই তুলিয়া ফেলি। কিন্তু যদি একটু তেঁতুল বা লেবু ইত্যাদির রস উহাতে মাখাইয়া রাখ, দেখিবে আপনা হইতেই ঐ দাগগুলি অতি সহজে উঠিয়া আসিতেছে। পরে নরম মাটি বা কোনও মিহি ছাই বা অন্য কোনও চুর্ণ দিয়া আল্‌গা হাতে ঘসিয়া দিলেই দেখিবে, উহাদের পূর্বেকার সেই উজ্জল রঙ ফিরিয়া আসিয়াছে। যদি যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করিতে পার তাহা হইলে **নাইট্রিক অ্যাসিড** বা **সালফিউরিক অ্যাসিডের** হাল্‌কা দ্রব করিয়া, উহার মধ্যে পাত্রগুলি ডুবাইয়া লইলেও, নিমিষে ঐ দাগ মিলাইয়া যাইবে। তবে ঐ অ্যাসিডগুলি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারেই ব্যবহার করিবে, যাহাতে ইহা তোমার গায়ে বা কাপড়ে পড়িয়া না যায়। অনেক সময় টেবিলের উপর ভিজা গেলাস ইত্যাদি রাখিবার দরুণ কাঠের উপর জলের দাগ পড়ে। **স্পিরিট** অথবা **অ্যামোনিয়া** দ্রব দ্বারা ঘসিয়া দিলেই ঐ দাগ মিলাইয়া যাইবে।

## বস্ত্র পরিষ্কারক বিভিন্ন দ্রব্য

পরিধেয় বস্ত্রাদি মলিন হইলে উহা কিভাবে পরিষ্কার করিতে হয় তোমরা মোটামুটি পড়িয়াছ। কাপড় কাচার বিজ্ঞান জানিতে হইলে কাপড়ের বিভিন্ন জমিন, ও উহাদের ধুইবার প্রণালী সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনই

কাপড় পরিষ্কার করিবার উপাদানগুলির বিষয়ও তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। কাপড় পরিস্কার করিতে সাধারণতঃ সাবান, সোডা, রিঠা, মস্থরীর জল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাক, এই উপাদানগুলির কোন্‌টির কি গুণ, ও ইহা কেনই বা ব্যবহৃত হয়।

তোমরা জান, বড় বড় শহরের ধোঁয়া ও ধূলা তৈলাক্ত। মানুষের শরীর হইতে অহরহ যে ক্লেদ ঘর্মের আকারে নিঃসারিত হইতেছে, উহা কতক পরিমাণে তৈলাক্ত। আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি এই দুই রকম তৈলাক্ত পদার্থের দ্বারাই প্রধানতঃ মলিন হইয়া থাকে। তৈলাক্ত ময়লাগুলি কাপড়ের সূক্ষ্মতর তন্তুতে আটকাইয়া যায়। মলিন পরিচ্ছদ প্রভৃতি হইতে এই তৈলাক্ত ময়লা উঠাইবার জন্যই ক্ষার জলের প্রয়োজন—ক্ষার জলে তৈল বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায় ও ভাসিয়া উঠে। পল্লীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সোডা ও সাবানের পরিবর্তে সাজিমাটি, কলাবাসনার ছাই ইত্যাদি ক্ষারদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

***সোডা ও সাবান***—কাপড়কাচা সাবান ও সোডা একপ্রকার ক্ষারদ্রব্য। সাবান ও কাপড়কাচা সোডায় প্রধানতঃ আছে সোডিয়াম কার্বনেট ও তাহার সঙ্গে মিশিয়া আছে জলের অংশ। কাপড়ে যদি ক্ষারদ্রব্যের মাত্রা অধিক হয়, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। এই কারণেই খারাপ সাবান, অর্থাৎ যে-সকল সাবানে ক্ষারের অংশ বেশী, সেই সকল সাবান ব্যবহার করিতে নাই। উহা কাপড়ের তন্তুগুলিকে নানাভাবেই জখম করিতে পারে। অনেক সাবানপ্রস্তুতকারক সাবানের মধ্যে কস্টীক পটাস ও রঞ্জন মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। এই দুইটি জিনিসও কাপড়ের ক্ষতি করে। রঞ্জন-মেশান সাবান দেখিতে পিঙ্গল বর্ণের হয়। রঞ্জনের সাবানে সহজেই ফেনা হয় বটে, কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সাবানে ব্লিচিং পাউডার বা সোডা বেশি থাকিলে কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু কাপড় অল্প দিনেই ছিঁড়িয়া যায়।



কাপড় ছিঁড়িয়া যায়

সাবানে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হইয়াছে কিনা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাও তাহা হইলে সাবান জলে গুলিয়া উহাতে লেবুর রস মিশাইবে। যদি দেখ অত্যধিক বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। ভেজাল-মিশ্রিত সাবান জলে গুলিলে, জলের তলায় বহু কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। রঙিন কাপড়ে ক্ষারবর্জিত সাবান ব্যবহার করাই বিধেয়, কারণ ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগে রঙ সহজেই চটিয়া যায়। এই কারণে **রঙিন কাপড়ে সোডার ব্যবহারও নিষিদ্ধ।** রেশম বা পশম কাপড়েও অতিরিক্ত ক্ষার প্রয়োগ করিতে নাই। কারণ রেশম বা পশম উভয় প্রকার বস্ত্রের ক্ষার-প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম।

***রিঠার জল***—রিঠা একপ্রকার বন্য ফল। পল্লীগ্রামে রেশমী বা পশমী বস্ত্রাদি কাচিতে অনেকে সাবান, সোডা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষারদ্রব্যের ব্যবহার না করিয়া দেশীয় প্রথায় রিঠার জলেই কাপড় কাচিয়া থাকেন। রিঠার জল সাধারণতঃ গরম ও সিল্কের কাপড়েই ব্যবহৃত হয়। রেশমী বা পশমী কাপড়ের তন্তুগুলিই এমন যে উহাতে ময়লা গভীরভাবে বসিতে পারে না। এই কারণে রেশম বা পশমবস্ত্র কাচিতে হইলে, উহাতে ক্ষারদ্রব্য প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। রিঠার জলে রেশম বা পশম-কাপড়ের জমিন

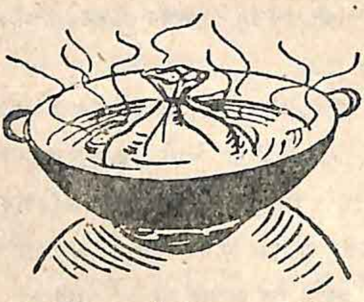


রিঠার জলে জমিন নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই

নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। রিঠার বীচিটি ফেলিয়া ফলের টুক্‌রাগুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া জলের মধ্যে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরের দিন ঐ জলে টুক্‌রাগুলি চটকাইয়া লইলেই দেখিবে ফেনা হইতেছে। ঐ সফেন জলের মধ্যেই তোমার রেশম ও পশম বস্ত্রগুলি দিয়া কাচিয়া লইবে।

এইভাবে কাচা কাপড় পরে আবার মসুরীর জলে ডুবাইয়া লইতে পার। মসুরীর জল কিভাবে প্রস্তুত করিতে তাহা এখন বলা হইতেছে।

**মসুরীর জল**—পূর্বেই বলা হইয়াছে, রঙিন কাপড় প্রভৃতিতে যদি অত্যধিক ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উহার রঙ চটিয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কা থাকায়, এবং ক্ষারবর্জিত উত্তম সাবানাদির অভাবেও, পল্লীগ্রামে অনেকে রঙিন কাপড় ইত্যাদি ধুইতে মসুরী-ডালের জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মসুরীর জলের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা তত অধিক নয়, কিন্তু উহা কাপড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠিন্য আনিয়া দিতে পারে। এই জল ক্ষার পদার্থ বর্জিত, সুতরাং ইহার প্রয়োগে কাপড়ের রঙ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।


মসুরী কাপড়ে বাঁধিয়া জলের মধ্যে সিদ্ধ করিবে

জলের পাঁচ ভাগের একভাগ মসুরী ডাল লইয়া উহা একটি কাপড়ে বাঁধিয়া পরিমাণ অনুযায়ী জলের মধ্যে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে সিদ্ধ করিবার পর যে জলটি তৈয়ারি হইবে, উহা সাধারণতঃ কলপরূপেই ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা যদি পরিষ্কারক দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করিতে চাও, তাহা হইলে ঐ ডালটি পুনরায় জল দিয়া ফুটাইয়া লও। ঐ জলটিই কাপড় ধুইবার পক্ষে উপযুক্ত হইবে। তবে কাপড় পরিষ্কার করিবার এত রকম দ্রব্য থাকিতে একটি খাদ্য-শস্যকে এইভাবে নষ্ট করা উচিত নয়। আজকাল নানাপ্রকার সাবানহীন কৃত্রিম বস্ত্র-পরিষ্কারক গুঁড়াও পাওয়া যায়, যেমন—সার্ফ, ডেট ইত্যাদি।

## কাপড়ের বিভিন্ন কলপ তৈয়ারির নিয়ম

***কলপের প্রয়োজনীয়তা***—পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার পর উহা ভাল ভাঁজ, পাট বা পালিশ করিবার জন্য কলপের প্রয়োজন হয়। কলপ দেওয়া কাপড়ের আঁশের মধ্যে ময়লা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পরে উহা পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়। ভাত চিড়া বা খই-এর মণ্ড, পাতলা লেই, ময়দা-সিদ্ধ প্রভৃতি, কলপ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধোপারা সাধারণতঃ ভাতের মাড়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে বড় বড় দোকানে

বা ধোপাখানায়, এবং বিদেশে প্রায় সর্বত্রই এই উদ্দেশ্যে তৈয়ারি স্টার্চ (starch) এর ব্যবহার দেখা যায়। ফুটন্ত বা কাঁচা, উভয় প্রকার জলেই স্টার্চ ব্যবহৃত হইতে পারে।

**ফুটন্ত জলে স্টার্চের ব্যবহার**—কিছুটা স্টার্চের মধ্যে সামান্য ঠাণ্ডা জল দিয়া স্টার্চ-দ্রব তৈয়ারি করিয়া লও। পরে জল ফুটিলে উহাতে সামান্য বোরাক্স পাউডার মিশাইয়া ঐ ফুটন্ত জলটি আস্তে আস্তে ঐ দ্রবের মধ্যে ঢালিবে ও সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবে, নতুবা স্টার্চ ডেলা পাকাইয়া যাইতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই দেখিবে ঐ স্টার্চ-মিশ্রিত জলটি শটির ন্যায় ঈষৎ নীলচে ও আঠালো হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবেই ফুটন্ত জলে স্টার্চ তৈয়ারি করিবার নিয়ম। স্টার্চের মধ্যে বোরাক্সের ব্যবহার কাপড়ের মসৃণতা বাড়ায়। এইভাবে তৈয়ারি স্টার্চের মধ্যে পরিষ্কার-করা নীল-দেওয়া কাপড়খানি ডুবাইয়া লইবে। পরিষ্কার শুকনো কাপড়ের কাঠিন্যের প্রয়োজন হইলে, এইভাবে তৈয়ারি স্টার্চের মধ্যে ডুবাইয়া লইতে পার। ব্যবহার করিবার সময় নীচের মাপ অনুযায়ী স্টার্চ ও অন্যান্য পদার্থগুলির পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে পার :—



নীলচে ও আঠালো হইয়া উঠিতেছে

**৩০ গ্রাম** (প্রায় ১ আউন্স) স্টার্চ—বড় চামচের দু'চামচ ঠাণ্ডা জলে মিশাইবে।

চা-চামচের আধ চামচ বোরাক্স—ফুটন্ত জলে মিশাইবে।

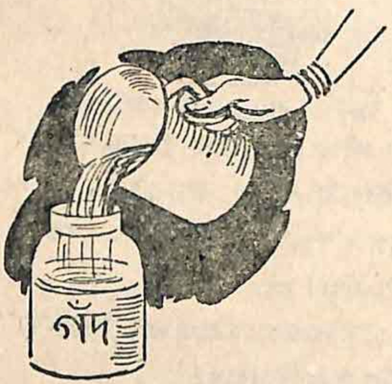
আঠালো না হওয়া পর্যন্ত জলের পরিমাণ—½ লিটার।

**কাঁচা জলে স্টার্চের ব্যবহার**—শার্টের কলার, কাফ, বেল্ট, নার্সের টুপি ইত্যাদি পোষাকের বিভিন্ন অংশ অনেক সময় অধিকতর কঠিন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে স্টার্চ ঠাণ্ডা জলেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**কাঁচা জলে স্টার্চ ইত্যাদির পরিমাণ—৩০ গ্রাম** ( প্রায় ১ আউন্স ) স্টার্চ, আধ চা-চামচ বোরাক্স, ৩ বা ৪ ফোঁটা তার্পিন, সিকি লিটার ঠাণ্ডা জল।

পূর্বোক্ত উপায়ে সামান্য জলে স্টার্চটি প্রথমে গুলিয়া লও ও উহার সহিত ৩।৪ ফোঁটা তার্পিন মিশ্রিত কর। সামান্য ফুটন্ত জলে বোরাক্স পাউডারটি মিশাইয়া লও। পরে উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া ঐ বোরাক্স মিশ্রিত জলটি স্টার্চের দ্রাবকের সহিত গুলিয়া লও। পরে এক টুকরা কাপড় দিয়া এইরূপে তৈয়ারি স্টার্চটি ছাঁকিয়া লইবে। কাঁচা জলে স্টাচ তৈয়ারি করিবার ইহাই নিয়ম। তার্পিন দিবার কারণ এই যে, উহা শ্বেতসারটিকে ( starch ) কাপড়ের তন্তুর মধ্যে চলিয়া যাইতে সাহায্য করে। এই উপায়ে স্টার্চ তৈয়ারি করিয়া কাপড়ের কাঠিন্য আনিতে হইলে মনে রাখিবে, কাপড় শুকাইবার পূর্বেই ইস্ত্রি করিতে হইবে এবং ইস্ত্রির গরমে স্টার্চ আঠালো হইয়া উঠিবে বলিয়া ইস্ত্রিকেও অধিকতর গরম করিতে হইবে।

**মসুরী ডালের কলপ**—মসুরী ডাল এক টুকরা কাপড়ে বাঁধিয়া প্রায় ৪৫ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, উহার আঠালো জলটি কিভাবে কলপের মতন ব্যবহৃত হইতে পারে, উহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। এখন দেখা যাক, গঁদের কলপ কিভাবে তৈয়ারি হয় ও উহার প্রয়োগই বা কিরূপ।



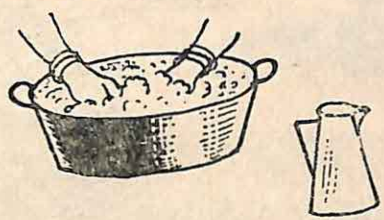
গঁদ-মিশ্রিত জলটি ছাঁকিয়া বোতলে রাখ

**গঁদের কলপ**—ভাল সিল্ক অথবা রেশম-বস্ত্র প্রভৃতিতে সাধারণতঃ কলপের ব্যবহার হয় না, তবে অনেক সময়ে অত্যন্ত পাতলা ও নিকৃষ্ট ধরণের সিল্ক প্রভৃতিতে কলপের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই গঁদের কলপ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ লিটার (অর্থাৎ প্রায় ২ পাইণ্ট) জলে ১১০ গ্রাম (প্রায় ৪ আউন্স) পরিমাণ গঁদ ব্যবহার করিবে। গঁদের টুক্‌রাগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখ। জলের সহিত মিশিয়া গেলে পরে ঐ গঁদ-মিশ্রিত জলটি ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখ। বোতলে রাখিবার সময় যদি উহার সহিত কয়েক ফোঁটা ফরম্যালিন বা ক্লোরোফরম মিশাইয়া দাও তাহা হইলে চিতি পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। কাপড়ে দিবার সময়, তোমার যে কাপড়ে যেরূপ কাঠিন্য প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী এক বা ততোধিক চামচ এইরূপে

তৈয়ারি গঁদের কলপ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। প্রতি পাইণ্ট জলে যদি এক চা-চামচ মেথিলেটেড 'স্পিরিট' মিশাইয়া দাও, তাহা হইলে কাপড়ের চাকচিক্য ও মসৃণতা আরও বাড়িবে।

## পশমের কাপড় কাচা

পশমের কাপড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম। পশমী কাপড়ের তন্তুগুলি সহজেই কুঁচকাইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই পশমবস্ত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন লওয়া প্রয়োজন। অত্যধিক রগড়ানো, ক্ষারদ্রব্যের ব্যবহার, অত্যধিক গরম জল প্রভৃতি পশমবস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ। অত্যধিক গরম জলে, বা গরম জল ব্যবহার করিবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা জলের প্রয়োগেও পশমের আঁশ সংকুচিত হয় ও কুঁচকাইয়া যায়। এই কারণে কোনও পশমবস্ত্র ধুইতে হইলে যতটুকু জল প্রয়োজন উহার সবটাই ঈষদুষ্ণ করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। পূর্বই বলা হইয়াছে পশম বস্ত্র রগড়াইতে নাই, উহা কচলাইয়া থুপিয়াই কাচিবার নিয়ম। এই কারণে পশমবস্ত্রে সাবানও ঘসিয়া দেওয়া উচিত নয়, কারণ উহাতেও তন্তুগুলি সরিয়া যাইতে পারে। সাবানের ছোট ছোট কুচি বা সাবানের গুঁড়া প্রথমে সামান্য গরম জলের সহিত মিশাইয়া সাবানের জেলি তৈয়ারি করিয়া লইবে। তোমার ঐ পশমবস্ত্রটি কাচিতে যতখানি সাবান জল প্রয়োজন হইবে, ততখানি ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পরে তুমি ঐ সাবানের জেলিটি ও সিকি চা-চামচ বোরাক্স মিশাইয়া লইবে। বোরাক্সের ব্যবহারে পশমে অ্যাসিডের দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে তৈয়ারি সাবান জলের সাহায্যে পশমের কাপড় পরিষ্কার করিবার পরেও উহা আরও কয়েকবার পরিষ্কার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া



কচলাইয়া লইবে



আরো কয়েকবার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইবে

ফেলিবে, যাহাতে কোথাও সাবান লাগিয়া থাকিতে না পারে। সাবান হইতে ক্ষারদ্রব্যটুকু টানিয়া লইবার ক্ষমতা পশমের অদ্ভুত, এই কারণেই সাবান জলে ধুইবার পরেও উহা আরও কয়েকবার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন। জল হইতে পশমের কাপড় কখনও কোণায় ধরিয়া টানিয়া তুলিবে



নরম হাতে থুপিয়া থুপিয়া কাচিবে

না বা মোচড় দিয়া নিংড়াইবার চেষ্টা করিবে না। তলায় দুইখানি হাত দিয়া কাপড়খানি জল হইতে উঠাইবে ও একখানি টাওয়েলের মধ্যে পশমবস্ত্রখানি দিয়া কোনও উপায়ে চাপিয়া সমস্ত জলটুকু বাহির করিয়া দিবে।

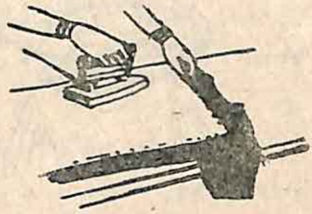
পশমের কোট, জ্যাকেট, জাম্পার প্রভৃতি বোনা জিনিসগুলি ধুইতে হইলে প্রথমে ব্রাশ করিয়া কলার, প্লেট ইত্যাদি যথাযথ ভাবে টাঁকিয়া লইবে, নতুবা, জল দিলে উহা ঝুলিয়া পড়িবে কিংবা কুঁচকাইয়া যাইবে। জলে ডুবাইবার পূর্বে জামাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, হাতের মাপ ইত্যাদি লইয়া রাখিবে যাহাতে ইস্ত্রি করিবার সময় সেই মাপ অনুযায়ী ইস্ত্রি করিতে পার। পশমের বোনা জামা কাপড় কখনও ঝুলাইয়া শুকাইতে দিবে না, কারণ উহাতে ঐ জামা কাপড় অশোভনরূপে লম্বা ও চওড়া হইয়া যাইতে পারে। পশমের বোনা



পূর্বেই মাপ ইত্যাদি লইয়া রাখিবে

জিনিস টেবিল বা চওড়া র‍্যাক প্রভৃতির উপর পাতিয়া শুকাইতে দিবার নিয়ম।

***পশম বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার নিয়ম***—পশমের তন্তুগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ইহা তোমরা পড়িয়াছ। ইহা তাপ কু-পরিবাহী (bad conductor of heat)। অর্থাৎ সূতার কাপড়ের বেলায় যেমন সূতার কাপড়ের মধ্য দিয়াই ইস্ত্রির তাপ পাতা-চাদর ইত্যাদির মধ্যে সঞ্চালিত হয়, পশমের বেলায় তাহা হয় না। ইস্ত্রির সমস্ত তাপটুকু পশম নিজের দেহেই টানিয়া লয়। এই কারণেই পশমবস্ত্র ইস্ত্রি করিবার সময় ইস্ত্রির তাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়া প্রয়োজন, নতুবা পশম সহজেই পুড়িয়া যাইতে পারে। পশমের কাপড়খানি যদি অত্যধিক শুকাইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইস্ত্রি করিবার সময় উহাতে জলের ছিটা দিবে না, বরঞ্চ একটি ভিজা কাপড় উহার উপর পাতিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবে। ইস্ত্রির পরেও পশম-বস্ত্রখানি কিছুক্ষণ হাওয়ায় রাখিবে, কারণ অনেক সময় পশম-বস্ত্র ভিজা থাকিলেও উহা অনুভব করা যায় না।



ভিজা কাপড় উপরে পাতিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবে

## রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উহার উপকারিতা

রন্ধন করাও একটি কলা-বিশেষ এবং ভাল রন্ধন করিতে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রয়োজন ইহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। ভাজা, সিদ্ধ করা, আগুনে ঝল্‌সানো ইত্যাদি রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে এবং তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(১) **ভাজা** ( frying ):—সামান্য তেল বা ঘি ইত্যাদি' গরম করিয়া উহার মধ্যে তরকার বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি প্রয়োজনানুযায়ী মসলা ইত্যাদি মাখিয়া ছাড়িয়া দাও। লুচি ইত্যাদি ভাজিতে হইলে যথেষ্ট ঘি বা তেল ইত্যাদি দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে জিনিসটি উহার মধ্যে ডুবিয়া যায়। আবার, অপরপক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য তেল-ঘিয়ের মধ্যে জিনিসটি এপিঠ-ওপিঠ করিয়া দিয়া নামাইয়া লওয়া হয়। ভাজিবার এই দুইটি প্রক্রিয়ার সহিতই তোমরা প্রায় সকলেই পরিচিত আছ। রন্ধনের এই প্রথাই সর্বাপেক্ষা সময়-সংক্ষেপকারী। যদিও এই প্রক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত রুচিকর ও

সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি তৈয়ারি করা যায়, কিন্তু ভাজিয়া লইবার দরুণ উহা **অত্যন্ত দুষ্পাচ্য হয়** ও উহার প্রায় সব **ভাইটামিনই নষ্ট হইয়া যায়।** কিন্তু ফুটন্ত তেল বা ঘিয়ের মধ্যে ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা তৈয়ারি হইয়া যায় বলিয়া, উহার সুগন্ধি বা নির্যাস ইত্যাদি নষ্ট হইবার সুযোগ পায় না।



ভাজা



সিদ্ধ করা

(২) **সিদ্ধ করা** ( boiling ) :—সিদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভাজা খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় সিদ্ধ-করা খাদ্যদ্রব্য তত দুষ্পাচ্য নয়। সিদ্ধ-করা খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম হয়, এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যাদি ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু তরিতরকারি ইত্যাদি সিদ্ধ করিবার পরে যদি জলটিকে ফেলিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রক্রিয়ায় রন্ধন করিলে উহাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইয়া থাকে। তোমরা জানো, অনেক জল দিয়া ভাত সিদ্ধ করিবার পরে যদি ভাতের ফ্যান ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাতে আর পুষ্টি বিশেষ কিছুই থাকে না। ফ্যান না ফেলিয়া যে ভাত তৈয়ারি করা হয়, উহাই অধিকতর পুষ্টিকর। উহাতে চাউলের সুগন্ধি ও ভাইটামিন মজুত থাকে।

(৩) **দমে সিদ্ধ করা** ( stewing ) :—ইহা সিদ্ধ করার অনুরূপই একটি প্রক্রিয়া। মাংস ইত্যাদির কঠিন অংশগুলি যখন অল্প আঁচে একটি ঢাকাযুক্ত পাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা হয়, তখনই বলা হয় দমে সিদ্ধ-করা। এই প্রক্রিয়ায় মাংসের পুষ্টি বা সুগন্ধি নির্যাস ইত্যাদি কিছুই নষ্ট হয় না। তোমরা জান, মাংসকোষ-মধ্যস্থিত যে সংযোজক তন্তুগুলি থাকে, রাঁধিবার সময় উহার দুষ্পাচ্য **কোলোজেন** গলিয়া যায় এবং রাঁধা মাংসে উহা হইতেই সহজপাচ্য **জিলেটিন** উদ্ভূত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ—কচি পাঁঠা ইত্যাদির মাংস অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সিদ্ধ হয়। যে-সকল জন্তু যত বৃদ্ধ, উহাদের মাংস

সিদ্ধ হইতে তত অধিক সময় লাগে। ইহার কারণ, বৃদ্ধ জন্তুদের শরীরে সংযোজক তন্তু অনেক বেশী থাকে, ফলে উহাদের মাংস শক্ত হয় এবং বেশীক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু মাছ-মাংস ইত্যাদির জান্তব-প্রোটিন যদি অত্যধিক উত্তাপে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রোটিনাংশ জমিয়া কঠিন হইয়া যাইবে এবং উহা দুষ্পাচ্য হইয়া উঠিবে। **মাংস সিদ্ধ করিবার নিয়মই স্বল্প আঁচে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা।** কাজেই দেখিতেছ, এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হইতেছে এই যে, ইহাতে জ্বালানির প্রয়োজন স্বল্প, খাদ্যদ্রব্যও সহজপাচ্য হয়, এবং খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির নির্যাস ইত্যাদি নষ্ট হইবারও কোনও আশঙ্কা থাকে না। কারণ এই ক্ষেত্রে সিদ্ধ-করা জল ফেলিয়া দিবারও কোন প্রশ্ন উঠে না। তোমরা মাছ-মাংস, সব্‌জি ইত্যাদির স্টু (stew)-এর সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত আছে। খাদ্যদ্রব্য হইতে নিষ্কাষিত নির্যাসের দ্বারাই স্টু-এর ঝোলটি সুস্বাদু হইয়া উঠে।

(৪) **ভাপে সিদ্ধ করা** (steaming):—ভাপে সিদ্ধ করার বেলাতেও স্বল্প আঁচের প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় রান্না করার প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে জান্তব-প্রোটিনের কঠিন হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। ভাপে রান্না করা খাদ্যদ্রব্যাদি সহজেই হজম করা যায় এবং এই কারণে উহা রোগী ও শিশু প্রভৃতির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী বলিয়াই জানিবে। এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা সব্‌জি প্রভৃতির খনিজ লবণাদি নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়ায় দুই উপায়ে রান্না করা যাইতে পারে—বাষ্পের সহিত খাদ্যদ্রব্যাদির **প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করাইয়া,** অথবা বাষ্প বা ভাপের সহিত খাদ্যদ্রব্যাদির **অপ্রত্যক্ষ সংযোগের সাহায্য লইয়া।** কিন্তু যেভাবেই রান্না কর না কেন, **ভাপে সিদ্ধ করিবার পাত্রটির মুখ একটি আঁট-ঢাকনি-যুক্ত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সমস্ত বাষ্প বা ভাপটুকুই কাজে লাগানো যাইতে পারে।** তোমরা সকলেই 'ইক্‌মিক কুকার' দেখিয়াছ। ইক্‌মিক কুকারে বাষ্পের সহিত খাদ্যদ্রব্যাদির অপ্রত্যক্ষ সংযোগই হইতেছে। ইকমিক কুকারের বাহিরের বড় বাসনটি আঁট-ঢাকনি-যুক্ত হয়, এবং উহার মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি পাত্র সমেত ঠিক টিফিন কেরিয়ারের মতন এক একটি বাসন বসানো থাকে। এই বাসনটি কুকারের তলদেশের ফুটন্ত জলটুকুর মধ্যে বসানো ছোট একটি বাটির উপরই দেওয়া হয়। কুকারের মুখ আঁট করিয়া দিবার দরুণ সমস্ত ভাপটাই ভিতরের পাত্রটিতে লাগে, ও ভাপের তাপে ভিতরকার তরিতরকারি ইত্যাদি

সমস্তই সিদ্ধ হইয়া যায়। পাত্রগুলির মুখে ঢাকনি থাকে বলিয়া, এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বর্ণ বা গন্ধের বিশেষ পরিবর্তন হয় না, এবং ভাইটামিনগুলিরও অপচয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

(৫) **আগুনে ঝল্‌সানো** (roasting) ;—তোমরা ভাপে বা বাষ্পে সিদ্ধ করার কথা পড়িলে; ভাপে সিদ্ধ করার অর্থই **ভিজা তাপে** সিদ্ধ করা। ঝল্‌সানোর অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঝলসানোর প্রক্রিয়াতে **শুক্‌নো তাপ**



ভাপে সিদ্ধ করা



ঝল্‌সানো

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোমরা জানো, বহু পূর্বে যখন রন্ধন-প্রাণালীর উদ্ভব হয় নাই, সেই সময় মানুষ কাঁচা মাংস ইত্যাদি আগুনে ঝল্‌সাইয়া ভক্ষণ করিত এখনও আমাদের কয়েকটি বিশেষ খাদ্য এইভাবেই তৈয়ারি হয়। 'সিক-কাবাব' প্রভৃতি মাংসের কয়েকটি বিশেষ খাদ্য, তোমরা হয়তো জানো, এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাংসের টুক্‌রাগুলি ঘি ও অন্যান্য মসলা ইত্যাদি মাখাইয়া জলজলে আগুনের সামনে ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা ঐ আগুনের তাপে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে ক্রমাগত এপিঠ-ওপিঠ করিয়া উন্টাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে কোনদিকেই উহা কাঁচা না থাকে। কাজেই ঝল্‌সানো আর কিছুই নহে, খোলা আগুনের উপর ধরিয়া সিদ্ধ করা বা **সেঁকিয়া লওয়া।**

আগুনে ঝল্‌সাইয়া খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে উহাতে খরচ কিছু বেশি পড়ে, কারণ জ্বালানির প্রয়োজন হয় অধিক। অপরদিকে আবার আগুনে ঝল্‌সাইয়া লইবার দরুণ মাংসের সমস্ত জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং মাংসখণ্ডটিও সংকুচিত হইয়া ছোট হইয়া যায়। সুতরাং এই প্রথায় রন্ধন করিতে হইলে মাংসের পরিমাণও অধিক প্রয়োজন হয়। কাজেই এই প্রথায় রন্ধন করা কিছুটা ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু এই প্রথায় রন্ধন করিলে খাদ্যদ্রব্যাদি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হয়।

(৬) **শুক্‌নো তাপে রন্ধন** ( Baking ) :—শুক্‌নো তাপে রন্ধন করা, আগুনে ঝল্‌সানোরই অনুরূপ। কেবল তফাৎ এই যে, ঝল্‌সানোর প্রক্রিয়ায় তাপটি একেবারে খাদ্যদ্রব্যের একধারেই লাগিয়া থাকে। কিন্তু শুক্‌নো তাপে রন্ধন-প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যাদির গায়ে উত্তাপটা সবদিক হইতেই একই সময়ে একই ভাবে লাগে। পাউরুটি, বিস্কুট, কেক এইভাবেই তৈয়ারি হয়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## খাদ্য

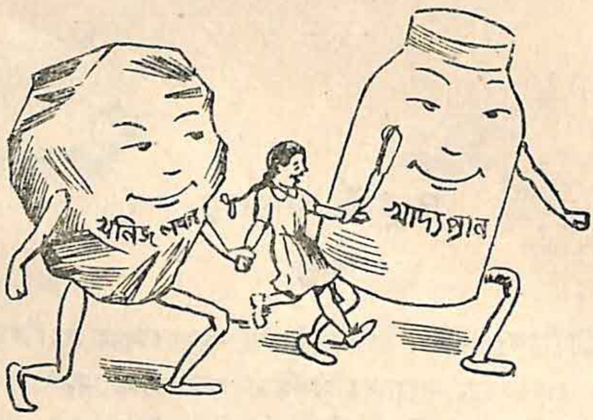
***ভাইটামিন***—ভাইটামিন জীবনীশক্তি-সংরক্ষক অথবা দেহনিয়ন্ত্রণকারী খাদ্য উপাদান। অর্থাৎ আমাদের দৈহিক গঠন ও দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াসমূহের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে ইহার উপরেই।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলিতে আমরা একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থকে বুঝি যাহা প্রোটিন, শ্বেতসার স্নেহ-জাতীয় খাদ্য উপাদান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাইটামিনের দৈনিক প্রয়োজন অতি সামান্য হইলেও, দেহের উপর উহাদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিপোষণ প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহ-যন্ত্রটিকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে উহা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। খাদ্যের এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলিই **"ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ"** নামে পরিচিত। ইহা অতি সূক্ষ্মভাবে ও সূক্ষ্মমাত্রায় উদ্ভিজ্জ খাদ্যে, দুগ্ধে, ডিমে, যকৃতে সঞ্চিত থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণের অভাবে শরীরে কয়েকটি রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং দেহযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে। আজ পর্যন্ত মোটামুটি ছয় প্রকার খাদ্যপ্রাণ আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষরগুলির দ্বারা ইহাদের নামকরণ যথাক্রমে **ভাইটামিন এ, বি, সি, ডি, ই** ও **কে** করা হইয়াছে।

***ভাইটামিনের উৎপত্তি***—সূর্যকিরণের সাহায্যে উদ্ভিদের সবুজ

পাতাগুলি ভাইটামিন বা খাদ্য-প্রাণ তৈয়ারি করে এবং বেশীর ভাগই পাতায় ও ফলে সঞ্চিত রাখে। প্রাণীরা তাহাদের মোট ভাইটামিন সোজাসুজি উদ্ভিজ্জগৎ হইতে সংগ্রহ করে, কিম্বা উদ্ভিদ্ হইতে সঞ্চিত অন্য প্রাণীদেহ হইতে যোগাড় করিয়া লয়। দেখা গিয়াছে, জীবদেহে কেবলমাত্র ডি ভাইটামিন সৃষ্টি হইতে পারে—কিন্তু উহাও সূর্যের রশ্মোত্তর রশ্মির সংস্পর্শে না আসিলে হয় না।




জীবনীশক্তি-সংরক্ষক বা দেহ-নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্য

জীবদেহের যদিও ভাইটামিন উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু জীবদেহে ভাইটামিন সঞ্চিত থাকিতে পারে। যেমন—যকৃত প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়।

'ভাইটামিন' শব্দটি ৪০ বৎসর পূর্বে প্রথম ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে এই খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে মানুষ অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ রসায়নাগারে সস্তায় তৈয়ারি হইতেছে। খাদ্যপ্রাণকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। (১) **জলে দ্রবণীয়** ( water soluble ) যেমন ভাইটামিন **বি** ও **সি**। (২) **তেলে দ্রবণীয়** (fat soluble) যেমন **এ**, ডি, **ই** কে।

***অভাবজনিত রোগ***—দেখা গিয়াছে, অনেকদিন ধরিয়া যদি কাহাকেও টাট্‌কা ফলমূল ও তরিতরকারির পরিবর্তে কেবল কলে ছাঁটা চাউল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারি খাদ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে; কিংবা যদি কাহাকেও টাট্‌কা তরিতরকারি, মাছ, মাংস

ইত্যাদির পরিবর্তে কেবল টিনে প্যাক করা বাসী খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুদিন পরেই উহার চর্মরোগ দেখা দেয়। এই সমস্ত অসুস্থতা **ভাইটামিনের অভাবজনিত**; ইহাদের **অভাবজনিত রোগ** ( Deficiency diseases ) বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের রক্তের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে—এই বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সমতা-সাধনে ভাইটামিন বিশেষ সহায়ক। তোমার দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় লবণগুলির কথা শুনিয়াছ। এই লবণগুলির সহযোগিতায় খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিনগুলি পরিপাক ক্রিয়াতেও যথেষ্ট সহায়তা করে। এই কারণেই বেশীদিন কোনও একটি ভাইটামিনের অভাব হইলেই দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

## *বিভিন্ন ভাইটামিন ও উহাদের প্রয়োজনীয়তা*

**ভাইটামিন 'এ'** :—দেহের পুষ্টি, গঠন ও পরিপোষণে ভাইটামিন-'এ'-র প্রয়োজন অত্যধিক। ইহার অভাবে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমিয়া যায়, রাত্র্যন্ধতা রোগ জন্মে, চর্মরোগ ও শিশুদের নানাবিধ চক্ষুপীড়া দেখা দেয়। ইহাকে **সংক্রমণ-প্রতিষেধক** বলা হয়। ইহার অভাবে শরীরের রোগাক্রমণ প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমিয়া যায়।

দেহচর্মের উপরেও 'এ'-ভাইটামীনের প্রভাব যথেষ্ট। ইহার অভাবে চামড়া উহার স্বাভাবিক মসৃণতা হারাইয়া শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া উঠে, এবং প্রতি লোমকূপে একরকম ফুস্কুড়ি দেখা দেয়।

এই ভাইটামিন **মাখন, দুধ, ঘি, দধি, পনীর, চর্বি, ডিম, বড় মাছের তেল** এবং **জান্তব-যকৃতে** যথেষ্ট আছে। ইহা ছাড়া **ফুলকপি, পালং,**




'এ'-ভাইটামিনের প্রধান উৎস

**বাঁধাকপি, আম** ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। আরও দেখা গিয়াছে **গাজর ভুট্টা, টকবেগুন, কমলালেবু** প্রভৃতি হলুদ বর্ণ সব্‌জিগুলির মধ্যে **ক্যারোটিন** (Carotin) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে যাহা শরীরের মধ্যে

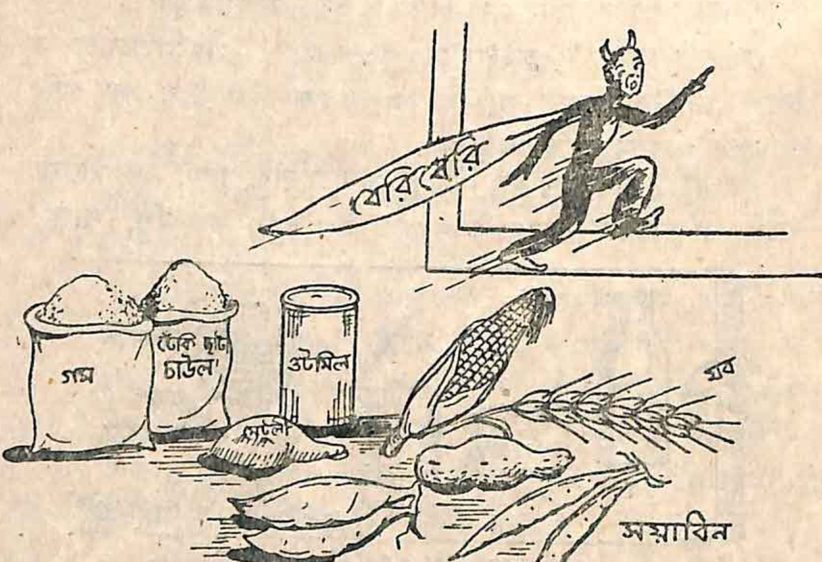
প্রবেশ করিয়া ভাইটামিন 'এ' তৈয়ারি করিতে পারে। একজন সুস্থ, কর্মঠ, মোটামুটিভাবে পরিশ্রমী ও প্রাপ্ত-বয়স্কের পক্ষে দৈনিক ৫০০০ আই. ইউ (ইণ্টারন্যাশানাল ইউনিট) 'এ' ভাইটা-মিন প্রয়োজন।



নানারকম চক্ষুরোগ দেখা দেয়

এই সঙ্গে জানিয়া রাখিবে, ইহা তেল-ঘি জাতীয় স্নেহ-পদার্থে দ্রবণীয় এবং অক্সিজেনের সংস্পর্শে ক্রমশঃ ধ্বংস হয়, কিন্তু উত্তাপে নষ্ট হয় না; সেইজন্য ঢাকা দিয়া রান্না করিলে **'এ' ভাইটামিন** খুব সামান্যই নষ্ট হয়। দৈনিক যদি আধ সের দুধ, আধ ছটাক মাখন, ২টি গাজর, কিছু শাক-সব্‌জি খাদ্যে রাখা হয়, তাহা হইলে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব কোনদিনই হইবে না।

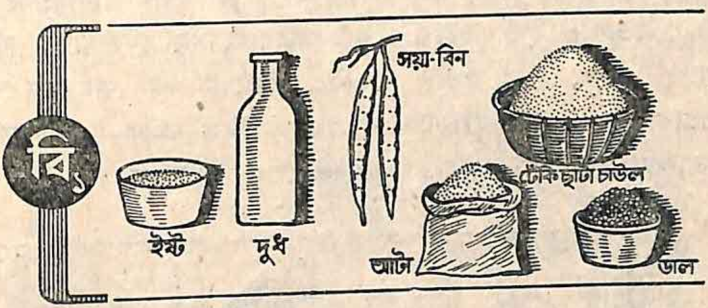
**ভাইটামিন 'বি-১', 'বি-২'** :—তোমরা বেরিবেরি রোগের নাম শুনিয়াছ।




ভাইটামিন বি-১ বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে

জাপান, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেই বেরিবেরি রোগের প্রকোপ বেশী। ইহার

কারণ কি? তোমরা জান ঐ সকল দেশের লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। চাউলের বাহিরের খোসাটির মধ্যে বেরিবেরি-নিরোধক একপ্রকার পদার্থ আছে। কলে-ছাঁটা চাউলে ঐ অংশটি বাদ পড়িয়া যায়, কাজেই অন্য কোনও উপায়ে যদি এই ভাইটামিন পরিপূরণ করা না হয় তাহা হইলে কলে ছাঁটা চাউলই যাহাদের প্রধান খাদ্য, তাহারা সহজেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত




হইবে। ভাইটামিন-'বি'র মধ্যে এই বেরিবেরি-নিরোধক পদার্থ ছাড়া আরও অন্যান্য পদার্থ রহিয়াছে বলিয়া, বেরিবেরি-নিরোধক পদার্থটিকে ভাইটামিন-**'বি-১'** বা **অ্যান্থুরিন** (aneurin) বলা হয়। এই 'বি-১' বা 'অ্যান্থুরিন'-এর অভাবে বেরিবেরি, স্নায়ু-প্রদাহ, স্নায়ু-দৌর্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং নানাবিধ পেটের রোগ দেখা দেয়। এই ভাইটামিন দেহে সঞ্চিত থাকে না, প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করিলে উদ্বৃত্ত অংশ প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই কারণে প্রত্যহই এই ভাইটামিন গ্রহণ করা দরকার।

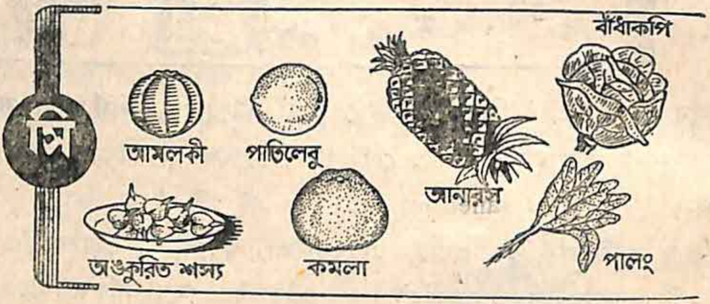
**ভাইটামিন 'বি-২'**র অভাবে চর্মরোগ এবং পেলেগ্রা নামক রোগ জন্মায়। এই দুইটি ভাইটামিন **ঢেঁকিছাঁটা চাউল, লাল আটা, ডাল, যব, ভুট্টা,**




**শাক, সিম, চিনাবাদাম, নারিকেল, ডিমের কুসুম** ইত্যাদিতে পাওয়া

যায়। সম্প্রতি ১২ রকম বিভিন্ন শ্রেণীর ভাইটামিন 'বি' সনাক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের একত্রে **বি-সঙ্ঘ** বা **বি-কম্প্লেক্স** (B-complex) বলা হয়।

**ভাইটামিন 'সি'** (Ascorbic acid)—ইহার অভাবে চর্মের নানাস্থানে রক্তপাত হইয়া কালসিটা পড়ে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়, দাঁতের মাড়ী ফুলিয়া রক্ত পড়ে, দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায়, দুর্বলতা দেখা দেয়, এবং স্কার্ভি নামক একপ্রকার চর্মরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে গাঁটগুলি ফুলিয়া যায়, দেহাভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইতে থাকে ও দেহের রং বিবর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যে টাট্‌কা ফলমূল, শাক সব্‌জি প্রভৃতির অভাবেই এই রোগ দেখা দেয়। আগেকার দিনে বহুদিন ধরিয়া একটানা জাহাজ চলিত বলিয়া টাট্‌কা সব্‌জি ইত্যাদির অভাবে মাঝিমাল্লাদের মধ্যেই এই রোগ দেখা যাইত।

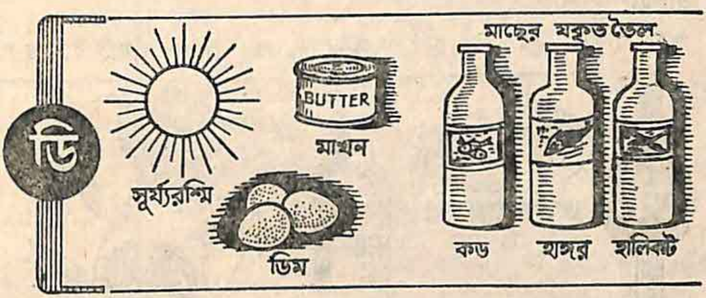



এই খাদ্য-প্রাণ টাট্‌কা ফল ও শাক-সব্‌জিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফলমূল ও তরিতরকারি যতই টাট্‌কা হইবে, ততই 'সি' ভাইটামিনের পরিমাণ অধিক হইবে। ইহা **জলে দ্রবণীয়,** এবং **অক্সিজেনের সংস্পর্শে ও তাপে নষ্ট** হয়। সেইজন্য ফলের রস করিয়া আঢাকা অবস্থায় বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে নাই, উহাতে ভাইটামিনের পরিমাণ কমিয়া যায়। তেমনি অল্প আঁচে ও আঢাকা অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরিয়া সব্‌জি সিদ্ধ করিলে, উহাতে 'সি' ভাইটামিনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায় কারণ তাপ ও বায়ুস্থিত অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার 'সি' ভাইটামিনকে নষ্ট করে।

টাট্‌কা **পালং শাক, বাঁধাকপি, শালগম, কড়াইশুঁটি, লেটুস শাক মূলা শাক, ফুলকপি, আমলকি, লেবু, বাতাবিলেবু, কমলালেবু, কালোজাম, কলা, আম, পেয়ারা, লিচু, আনারস, বেল. শসা, টকবেগুন, পানিফল** ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। শস্যে 'সি'

ভাইটামিন এমনিতেই নাই। কিন্তু অঙ্কুরিত হইলে তখন জন্মায়। দুগ্ধে 'সি' ভাইটামিন একরকম নাই। সেই জন্য ছোটদের শিশুকাল হইতে ফলের রস দেওয়া উচিত। ইহা দেহে সঞ্চিত থাকে না বলিয়া প্রত্যহ খাওয়া চাই। একজন প্রাপ্ত বয়স্কের দৈনিক ৭৫ মিলিগ্রাম এই ভাইটামিনের প্রয়োজন।

**ভাইটামিন 'ডি'**—ইহার অভাবে ছেলেমেয়েদের দাঁত ও হাড়ের স্বাভাবিক পুষ্টি হয় না, রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ হ্রাস পায়,

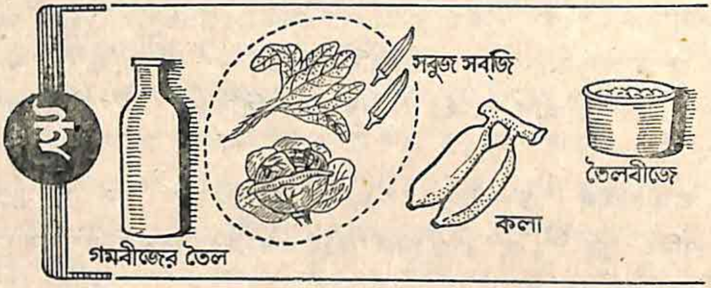



দাঁতে পোকা হয়, এবং শিশুদের রিকেট্ নামক রোগ জন্মাইতে দেখা যায়। এই রোগে হাড়গুলির যথাযথ পুষ্টি ও পরিপোষণ হয় না, ফলে অনেকস্থলে হাড়গুলি বাঁকিয়া যায় এবং মানুষ বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়ে। এই ভাইটামিন **জান্তব যকৃতে, কড, হালিবাট, হাঙ্গর, ইত্যাদি মাছের তেলে, ডিমের কুসুমে** প্রচুর আছে। হালিবাট-লিভার তেলে ভাইটামিন 'ডি'র পরিমাণ কড-লিভারের তেল অপেক্ষা প্রায় ২০ গুণ বেশী।

শিশুদের এই খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজনীয়তা একজন প্রাপ্ত বয়স্কের চাহিদার চতুর্গুণ। **সূর্যের কিরণের** সংস্পর্শে জীবদেহের চর্মে এই খাদ্য-প্রাণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইজন্যই রিকেট রোগীকে তেল মাখাইয়া সূর্যকিরণে রাখা হয়। দুগ্ধে সাধারণতঃ 'ডি' ভাইটামিন কমই থাকে, কিন্তু মাঠে-চরা গরুর দুধে এবং ঘৃতে ইহা অপেক্ষাকৃত বেশী আছে। কিন্তু **কোন শাকসবজির মধ্যে এই ভাইটামিন নাই**। রন্ধনের দ্বারা এই ভাইটামিনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

**ভাইটামিন 'ই'**—ইহার অভাবে স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায় এবং গর্ভ নষ্ট হইতে দেখা যায়। **গমবীজের তৈলে, কলায়,**

লেটুস শাকে, অন্যান্য তৈলবীজে, মাখনে, দুধে, ডিমে ও সবুজ সব্জিতে




এই ভাইটামিন আছে।

**ভাইটামিন 'কে'**—ইহার অভাবে রক্তের স্বাভাবিক জমাট বাঁধার শক্তি




হ্রাস পাইয়া অযথা রক্তক্ষরণ হইতে পারে। **পালং শাক, কপি, সয়াবিন তেল, কমলালেবুর খোসা** এবং **যকৃত** প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন থাকে।



রিকেট্ রোগ

প্রধান ভাইটামিনগুলির কথা মোটামুটি বর্ণিত হইল। উহাদের অভাবে বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং খাদ্য-নির্বাচনের ভার যদি গ্রহণ কর, প্রথমেই লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে খাদ্যে কোন ভাইটামিনের অভাব না হয় এবং খাদ্য-উপাদানগুলি যেন সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলে।

**ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা ও উৎস ঃ—**

| ভাইটামিন | ক্রিয়া | কোন্ কোন্ দ্রব্যে পাওয়া যায় |
|---|---|---|
| এ | শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহতে, জেরোপ্‌থেল্‌মিয়া ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি রোগে, চর্ম্মে, দেহের পুষ্টিতে, বাড়বৃদ্ধিতে ও সংক্রমণ প্রতিষেধকরূপে। | কড্‌লিভার, হ্যালিবাট্‌-লিভার তেল, দুধ, ছানা, মাখন, পনীর চর্বি, ডিম, বাঁধাকপি, চিনাবাদাম, আম ইত্যাদি। গাজর প্রভৃতি হলুদবর্ণ ফলমূল, সব্‌জি প্রভৃতি। |
| বি-১<br>বি-২ | স্নায়ুমণ্ডলীতে, দেহের পুষ্টী বর্ধনে ও পরিপাক ক্রিয়াতে, চর্ম্ম-প্রদাহে, বেরিবেরি রোগ-নিরোধে। | ঢেকিছাঁটা চাউল, ময়দা, লাল আটা, ওটমিল, সয়াবিন, মাছ, মাংস, যকৃত, ডিমের কুসুম, বাদাম, মটরশুটি, শিম, পালং, ডালের খোসা, গমের চোকলা ইত্যাদি। |
| সি | স্কার্ভি নিবারণে, দাঁতের গঠন সংরক্ষণে, মাড়ী ক্ষতে। | লেবু, পেয়ারা, কমলালেবু, বাতাবি, আমলকী, আম, শালগম, আলু, বরবটি, টকবেগুন, পালংশাক, জাম, আপেলের খোসা, নারকেল, যকৃৎ প্রভৃতি অপক্ক মাংস, অঙ্কুরিত শস্য। |
| ডি | অস্থি, দাঁতের গঠন ও পোষণে, রিকেট রোগে। | হ্যালিবাট-লিভার তেল, কড-লিভারতেল, চর্বি প্রভৃতি, মাছের যকৃতের তেল, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, ইত্যাদি। |
| ই | স্বাভাবিক প্রজননে, পেশী ও স্নায়ুতে। | গমবীজের ঘনীভূত তৈল, কলা, অন্যান্য তৈলবীজ, মাখন, সবুজ-সব্‌জি। |
| কে | রক্তের জমাট বাঁধার শক্তিতে, যকৃতে। | পালং শাক, কপি, সয়াবিন তেল, টকবেগুন, কমলালেবুর খোসায়। |

## খনিজ লবণ

খনিজ-লবণও ভাইটামিনের ন্যায় **শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সমূহকে নিয়ন্ত্রণ** করে ও **শরীর গঠনে** সাহায্য করে। দুইমণ ওজনের

একটি মনুষ্য শরীর যদি ভালোভাবে পোড়ানো যায় তবে তিন সের মাত্র ছাই পড়িয়া থাকে। এই ছাই আর কিছুই নয় কেবল কয়েকটি মৌলিক ধাতুর ক্ষার মাত্র। এইগুলি জীবিত শরীরে থাকে বলিয়া দেহের আভ্যন্তরীণ কার্য সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয়। দেহের প্রধান খনিজ বা ধাতব লবণগুলি হইতেছে **সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্লোরিণ, গন্ধক ও আয়োডিন**। সাধারণ দৈনিক আহার্যে এই খনিজ লবণগুলি যথাযথ পরিমাণে থাকে, সেইজন্য খনিজ লবণগুলির ঘাটতি সচরাচর হইতে দেখা যায় না। তবে গরম দেশে যেখানে অত্যধিক ঘর্মের সহিত দেহ হইতে অধিক পরিমাণে নুন (সোডিয়াম ও ক্লোরিণ) নির্গত হইয়া যায় সেখানে কিছুটা অতিরিক্ত নুন খাইয়া তাহার পরিপূরণ করিতে হয়।

ক্যালসিয়াম লবণের অভাবে শরীরের হাড় ও দাঁত তৈয়ারি করার বা রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা থাকে না; ফসফরাস্ লবণ ব্যতীত জীবকোষ সমূহের বা স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্ভব নয়, আবার লালরক্ত কণিকায় লৌহের অভাব হইলে, উহা শরীরের বিভিন্ন কোষে অক্সিজেন পৌছাইয়া দিতে পারে না। সেইজন্য মনুষ্য দেহে বিভিন্ন ধাতব লবণের চাহিদা অত্যন্ত স্বল্প হইলেও, উহা সুস্থ জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

আমাদের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় **৮০-৯০ গ্রাম** ধাতব লবণ মল, মূত্র ও ঘর্মের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষয় প্রত্যহ পূরণ না হইলে ক্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণের মধ্যে কয়েকটি প্রধান লবণের বিষয় নীচে আলোচনা করা যাইতেছে।

**ক্যালসিয়াম**—এই লবণ ব্যতীত **হাড়ের** ও **দাঁতের** স্বাভাবিক পুষ্টি ও




গঠন হয় না। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় বিঘ্ন

ঘটে, মাংসপেশীর কুঞ্চনও ব্যাহত হয়। বাড়ন্ত শিশুর, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এবং ক্ষয়-রোগীর এই লবণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী, দৈনিক প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ও যুবতীর খাদ্যে **৫০০—৭০০ মিলিগ্রাম** ক্যাল্‌সিয়াম লবণ যথেষ্ট। পরিণত বয়স্কদের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম কারণ তাহাদের অস্থি তৈয়ারি সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

**১ লিটার** খাঁটি দুধে প্রায় **৮৫০ মিলিগ্রাম** শুধু ক্যালসিয়াম আছে। **দুগ্ধ** এবং দুগ্ধজাত সমস্ত খাদ্যে, **ডিম, ছোটমাছ, মাংসের হাড়, সবুজ সব্‌জি, ডুমুর, গাজর** এবং **শুকনো ফলে** ক্যালসিয়াম লবণ প্রচুর আছে। জানিয়া রাখ, যদি দৈনিক আধ লিটার খাটি দুধ একটি ডিম, এক কাপ সব্‌জি-সিদ্ধ খাদ্য তালিকায় রাখ তাহা হইলে তোমাদের এই লবণের কখন অভাব হইবে না।

**ফসফরাস**—এই ধাতব লবণ ব্যতীত স্নায়ু-মণ্ডলীর ও জীবকোষ সমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। আর ক্যালসিয়ামও ফসফরাসের সহায়তা ছাড়া, হাড় ও দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। **দুধ, ডিম, মাছ, মোটা আটা, বার্লি, বজ্‌রা, সয়াবিন, রসুন ও শুকনো ফলে** এই লবণ পাওয়া যায়। দৈনিক সাত আটটি বাদাম দুই তিনটি খেজুর, একটি




ডিম ও খান দুই লাল আটার রুটি খাইলে তোমাদের ফসফরাস লবণের অভাব হইবে না।

**সোডিয়াম ও পটাসিয়াম**—এই দুই ধাতব লবণের অভাবে রক্তের ক্ষারত্ব হ্রাস পায়, হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্য ব্যাহত হয়, স্নায়ু-মণ্ডলী ও পেশী সমূহ দুর্বল হইয়া পড়ে ও পরিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে ৩০ হইতে ৪০ গ্রেন **পটাসিয়াম** ও ৬০ হইতে ৯০ গ্রেন **সোডিয়াম** লবণ থাকা প্রয়োজন। প্রায় সমস্ত **তরিতরকারি** ও **শাক-সব্‌জিতেই** পটাসিয়াম লবণ পাওয়া যায়। **আলু, বাদাম, ডাল** ইত্যাদিতে পটাসিয়াম যথেষ্ট থাকে।

দেহের প্রয়োজনীয় সোডিয়াম লবণের প্রায় সবটুকু আসে সাধারণ **খাবার লবণ** হইতে। খাবার লবণ সোডিয়াম ও ক্লোরিণের সংমিশ্রণে তৈয়ারি। উদ্ভিদ জাত খাদ্যদ্রব্যে সোডিয়ামের পরিমাণ খুবই স্বল্প। **মাছ, মাংস, ডিম, দুধ** প্রভৃতি **প্রাণিজ** খাদ্যদ্রব্যে কিছুটা সোডিয়াম পাওয়া যায়। তাই যাহারা কেবলমাত্র উদ্ভিদ-জাত খাদ্য খাইয়াই বাঁচিতে চাহেন, তাঁহাদের খাদ্যে খাবার লবণের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। খাবার লবণ হইতে সোডিয়াম ছাড়া দেহের ক্লোরিণের চাহিদাও মিটিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের দেহনিঃসৃত ঘর্মের সহিত সোডিয়াম লবণ বাহির হইয়া যায়, কাজেই যাহারা অত্যধিক ঘর্মপ্রবণ তাঁহাদের খাদ্যেও অপেক্ষাকৃত অধিক সোডিয়াম থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই হয়ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে খাদ্যে লবণের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে।

**আয়োডিন**—যদিও এক মিলিগ্রামের এক সহস্রাংশ আয়োডিন

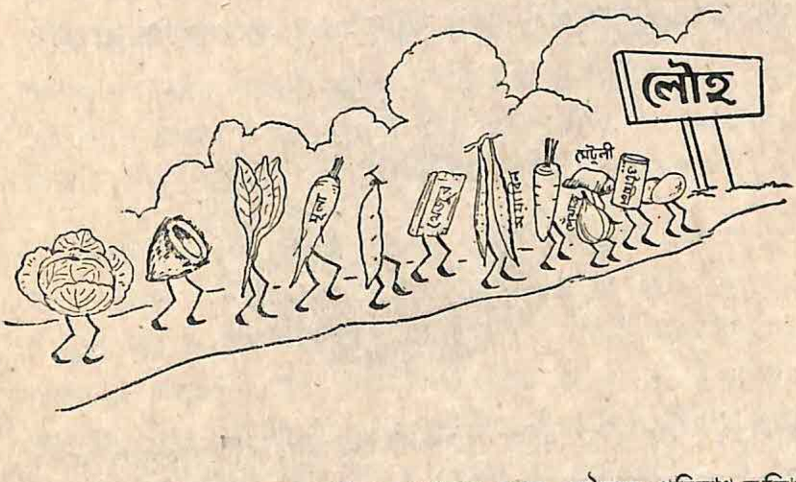



আমাদের প্রত্যহ প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি ঐ স্বল্প পরিমাণ আয়োডিনের

অভাবেই আমাদের শরীর ও মনের সজীবতা ও কর্মশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং আমাদের দেহে ও মনে জড়তা দেখা দেয়। আমাদের শ্বাসনালীর দুই পার্শ্বে দুইটি গ্রন্থি আছে ; আয়োডিনের অভাবে এই গ্রন্থি দুইটি বড় হইয়া **গলগণ্ড** রোগ দেখা দেয়। **রসুন, বীট, শালগম, বেগুন, ফুলকপি, কডলিভার-অয়েল, দুধ, সমুদ্রের মাছ** প্রভৃতিতে আয়োডিন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত জায়গাগুলিতেই এই লবণের অভাব ঘটিতে দেখা যায়।

**লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ**—এই লবণগুলির দৈনিক প্রয়োজন সামান্যই। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে মোট **৩·৫ গ্রাম লৌহ** থাকে ; এই পরিমাণ লৌহের প্রায় ৬০ ভাগ রক্তেই থাকে। লৌহ, লাল রক্তকণিকাগুলির একটি বিশেষ উপাদান। যদি লাল রক্তকণিকার মধ্যে লৌহের অভাব হয় তবে উহা ফুসফুস হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া শরীরের বিভিন্ন কোষে যোগান দিতে পারে না।

এই লবণের অভাব হইতে **রক্তস্বল্পতা** বা **রক্তশূন্যতা** দেখা দেয়। দেহকোষগুলির গঠনে ও কাজে লৌহ বিশেষ সহায়তা করে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৈনিক মোটামুটি ৫ হইতে **৮ মিলিগ্রাম লৌহ** লবণ থাকা প্রয়োজন। যখন কোনও দূষিত পদার্থ দেহে প্রবেশ করে তখন আমরা




রোগাক্রান্ত হই, দেখিতে দেখিতে আমাদের রক্তে লৌহের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেহ ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির ন্যায় লৌহেরও কোন

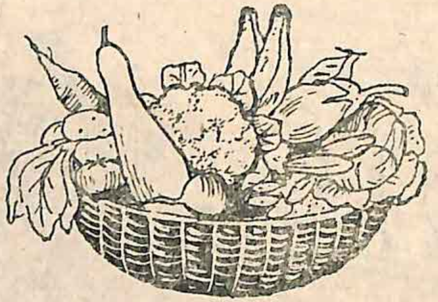
উদ্‌বৃত্ত অংশ জমা করিয়া রাখিতে পারে না। এই কারণেই খাদ্যে লৌহের উপস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। **যকৃৎ, আখের গুড়, কোকো, পিচফল, ডুমুর, ওটমিল, চকোলেট** প্রভৃতিতে লৌহ পাওয়া যায়। কোকোর মধ্যে শতকরা প্রায় **৩·৭৭ মিলিগ্রাম** লৌহ রহিয়াছে। যদি আধ কাপ পালং শাক সিদ্ধ, মাঝারি চামচের দুই চামচ আখের গুড়, কয়েকটি বাদাম দৈনিক খাদ্যে রাখা যায় তাহা হইলে শরীরে লৌহের অভাব কখন দেখা দিবে না।

প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। দেহে এই লবণের চাহিদাও অত্যন্ত কম, সেইজন্য খাদ্যে কখনও এই লবণের অভাব হয় না। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে অনেক সময় মানসিক বৃত্তিগুলির বিকার দেখা যায় ও অনেক সময় দৈহিক পরিণতিতেও বিলম্ব ঘটে।

## খাদ্যে ফল ও সবজি

ফল ও সব্‌জি কার্বোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে।

ফল ও সবজির মধ্যে, খনিজ লবণ ও ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি থাকে বলিয়া, আমাদের খাদ্যে উহার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। আমাদের খাদ্যের নিতান্ত কম করিয়া শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ অন্ততঃ ফল, সবজি ইত্যাদির দ্বারা পূরণ করা আবশ্যক। অর্থাভাব না থাকিলে, ও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য না হইলে, ইহার পরিমাণ আরও বাড়ান যাইতে পারে। ফল ও সবজির লবণগুলি



আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করে। উহার মধ্যে যে শ্বেতসার আছে উহাও দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ ফল ও সবজিতেই ভাইটামিন-'এ' 'বি' ও 'সি' মাত্রাভেদে বর্তমান থাকে।

শাক-সবজি যতদূর সম্ভব টাটকা, কাঁচা বা অল্প সিদ্ধ করিয়া খাওয়াই বিধেয়, কারণ উহাতে ভাইটামিন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। শাক-সবজিতে সেলুলোজের মাত্রা অধিক থাকে বলিয়া কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। সাধারণতঃ সবজি বলিতে আমরা তরিতরকারি ইত্যাদি যাহা মাটির উপরে জন্মায়, ঐগুলিকেই বুঝাইয়া থাকি,—ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি। কিন্তু কচু, আলু, মুলা, গাজর প্রভৃতি তরকারি হিসাবে গণ্য হইলেও, উহারা **কন্দ** বা **মূল জাতীয়** খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। এই সব গুলিই মাটির তলায় হয়।

ফলের মধ্যে শ্বেতসার আছে পূর্বে বলিয়াছি। এই শ্বেতসার 'ফল-শর্করা' নামে অভিহিত হয়। কলা, খেজুর, আঙ্গুর, আম, কাঁঠাল প্রভৃতিতে শর্করার মাত্রা প্রচুর, সেই কারণে পুষ্টিবর্ধক হিসাবেও উহাদের মূল্য অধিক। লেবু, কমলালেবু, আমলকি, আপেল, টমেটো প্রভৃতিতে 'সি' ভাইটামিন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিশমিশ বলিয়া কোনও ফল নাই, শুকনো আঙ্গুরই কিশমিশ নামে অভিহিত হয়। উহাতে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বলিয়া উহা আঙুরের মতন তত সহজপাচ্য নয়। ফল অপেক্ষাও অনেক ফলের খোসায় ভাইটামিন থাকে অনেক বেশী পরিমাণে। ১০৫-৬ পৃষ্ঠার তালিকা হইতে কয়েকটি সাধারণ ফলের প্রধান খাদ্য-উপাদানগুলির পরিমাণ দেখিয়া লও।

**শুকনো ফল**—আখরোট, বাদাম, পেস্তা, নারিকেল প্রভৃতি ফলগুলি শুকনো ফল নামে অভিহিত হয়। বাদাম অত্যধিক পুষ্টিকর এবং উহাতে প্রোটিন ও স্নেহাংশের পরিমাণ যদিও বেশ ভালো কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না। ইহার কারণ বাদামে সেলুলোজের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

প্রতিদিন আহার্যে যাহাতে কিছু ফল ও কিছু কাঁচা সবজি থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে। আলুর মূল্য অধিক নয়—অথচ আলু দেহে যথেষ্ট তাপ উৎপাদন করে ও কর্মশক্তির ইন্ধন যোগায়। কাজেই সবজি ইত্যাদির মধ্যে আলুর স্থান প্রধান জানিবে। বেশীর ভাগ সবজির খোসার নীচেই মূল্যবান লবণগুলি থাকে। সুতরাং যতদূর সম্ভব **সবজির খোসাগুলি ফেলিয়া দিবে না** এবং সিদ্ধ করিবার সময়ও উহাতে যত কম জল দিয়া পার তাহার চেষ্টা করিবে।

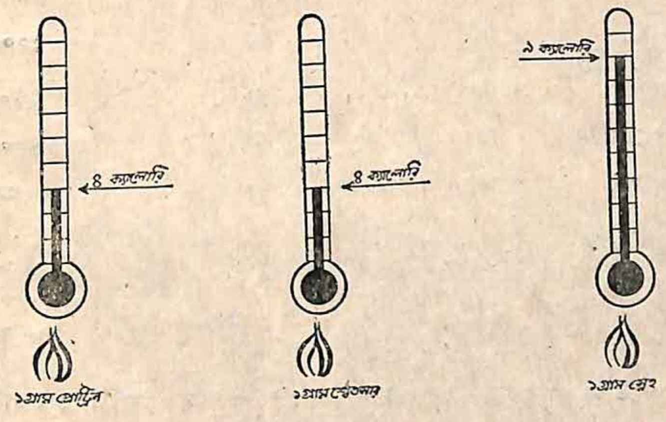
## সুষম খাদ্য

খাদ্যই দেহে পুষ্টিসাধন করে। সুন্দর দেহে সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, রুচিকর, সুসম্পূর্ণ ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। দিনের পর দিন তোমরা যদি একই রকম খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, দেখিতে দেখিতে অরুচি দেখা দিবে—খাদ্য বিস্বাদ মনে হইবে এবং উহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে না। সুতরাং খাদ্যের মধ্যে **বৈচিত্র্য** থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উহা **সুসম্পূর্ণ** ও **সুষম** হওয়া। 'সুষম খাদ্য' কাহাকে বলে উহা জানা প্রয়োজন। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, প্রতি খাদ্য দ্রব্যেরই কতকগুলি প্রকৃতিগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। ঐ গুণ অনুসারে প্রতি খাদ্যদ্রব্যই যদি দৈহিক প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা **সুসম্পূর্ণ** বা **সুষম খাদ্য** হইল জানিবে। তোমরা যদি ক্রমাগত অত্যধিক পরিমাণে কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখিবে দেহে জড়তা দেখা দিতেছে—ক্রমেই আলস্য আসিতেছে এবং তোমাদের কর্মদক্ষতাও কমিয়া যাইতেছে। আবার যদি প্রোটিন-খাদ্য গ্রহণ কর দেখিবে আলস্য দূর হইয়াছে, দেহ সতেজ ও কর্মঠ হইয়া উঠিতেছে। অপরপক্ষে আবার প্রোটিনের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইলে ও জান্তব-প্রোটিন খাদ্যকে সহজে হজম করাইতে হইলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যেরও প্রয়োজন। **'সুষম খাদ্য'** বলিতে সেই খাদ্যকেই বুঝাইবে, যে খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ ও কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি প্রত্যেক খাদ্য উপাদানের পরিমাণ, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য সহকারে ও প্রয়োজন অনুযায়ীই নির্ধারিত হইয়াছে। কোনও একটি খাদ্য উপাদানের যদি আধিক্য হয়, তাহা হইলে উহাকে আর সুষম খাদ্য বলা যায় না।

## পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা

খাদ্য পরিকল্পনা করিতে গেলেই আদর্শ খাদ্য কি ও কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তোমরা জান খাদ্যদ্রব্য জারিত ( oxidation ) হইয়া দেহে তাপ ও কর্মশক্তি ( energy ) সৃষ্টি করে। গাড়ির ইঞ্জিনের মত দেহ-ইঞ্জিনও কয়লা ও পেট্রলের পরিবর্তে, বাহির হইতে অন্ন ও পানীয় সংগ্রহ করে, এবং তাহা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাপ ও ক্রিয়াশক্তি বাহির করিয়া লয়। খাদ্য হইতে উৎপন্ন এই তাপ মাপিবার এককে ( unit )

ক্যালরি বলা হয়। **এক কিলোগ্রাম বা এক হাজার গ্রাম জলের তাপ ১ ক্যালরি সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয় তাহাকে ১ ক্যালরি বলে।** অর্থাৎ যে পরিমাণ খাদ্য দেহে অতখানি তাপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণ **খাদ্যের তাপমূল্য** বা **ক্যালরি-ভ্যালু** ( Calorivalue ) এক। এই হিসাবে **১ গ্রাম প্রোটিন, ১ গ্রাম শ্বেতসার এবং ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ যথাক্রমে দেহে ৪, ৪ ও ৯ ক্যালরি তাপ** উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাপমান যন্ত্রে ( Calorimeter ) এই তাপ মাপা যায়।




১ গ্রাম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ দেহে যথাক্রমে, ৪, ৪ ও ৯ ক্যালরি তাপ সৃষ্টি করে।

একজন পরিণত-বয়স্ক, সুস্থ ও শ্রমশীল ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের উপাদান ও তাপশক্তি নীচের নিয়মেই হওয়া উচিত :—

(১) খাদ্যের ক্যালরি মূল্য **২৫০০** হইতে **৩০০০** ;

(২) খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ **৭৫** হইতে **১০০ গ্রাম** ( ইহার শতকরা ৪০ ভাগ ও ৬০ ভাগ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হওয়া উচিত ) ;

(৩) স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ **৫০** হইতে **১০০ গ্রাম** ( ইহার শতকরা ৪০ ভাগ জান্তব ) ;

(৪) শ্বেতসারে পরিমাণে **২৫০** হইতে **৫০০ গ্রাম** ( ইহার মধ্যে কিছু সেলুলোজও থাকা আবশ্যক ) ;

(৫) সকল রকম ভাইটামিন ;

(৬) ধাতব লবণ যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি, আর স্বল্প পরিমাণ লৌহ, আয়োডিন, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি।

(৭) প্রচুর পরিমাণ জল।

মোটামুটি উপরের নিয়ম অনুসরণ করিয়াই একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক আহার্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল : –

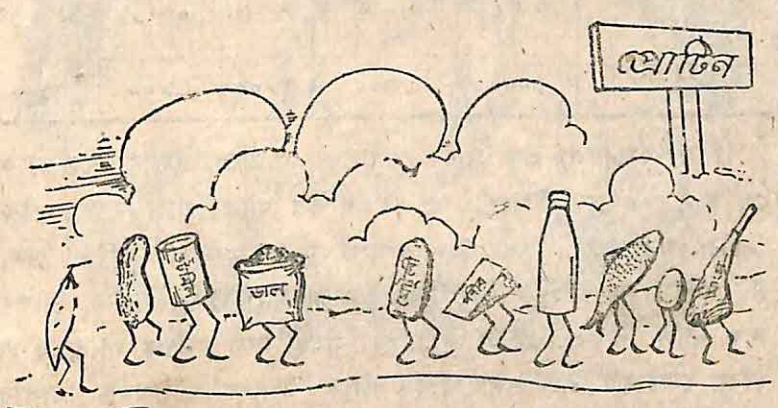
| খাদ্য-উপাদান | খাদ্যদ্রব্য | দৈনিক পরিমাণ | ক্যালরি মূল্য |
|---|---|---|---|
| শ্বেতসার | চাউল | ··· ২২৭ গ্রাম | ৭৮৩ |
| | আটা | ··· ১৭০ " | ৫৯৪ |
| উৎকৃষ্ট প্রোটিন | মাছ | ··· ১১৪ " | ১০০ |
| | দুধ | ··· ৩৪০ " | ২১০ |
| নিকৃষ্ট প্রোটিন | ডাল | ··· ১১৪ " | ৪০০ |
| স্নেহ-পদার্থ | তেল, ঘি ইত্যাদি | ··· ৮৫ " | ৭৮৩ |
| ভাইটামিন ও খনিজ লবণ | ফল ও শাকসব্‌জি | ··· ১৭০ , | ১৬৯ |
| | জল | ৩ পাইন্ট | ৩০৩৯ |

এইভাবে পরিকল্পিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত একজন শ্রমশীল সুস্থ ব্যক্তিকে সপ্তাহে একবার কি দুইবার আট আউন্স মাংস দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ঐ দুইদিন খাদ্যের তাপশক্তি বাড়িয়া যাইবে। এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাংস বাদ দিয়াও চাউল, ডাল, আটা, মাছ, দুধ, তরি-তরকারি, ফল, ঘি ইত্যাদি দিয়া এই দেশের উপযুক্ত করিয়াই একটি **সুষম** ও **আদর্শ খাদ্য** রচনা করা যাইতে পারে। ঐ কারণেই উপরের খাদ্য-তালিকা হইতে মাংস বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া, এদেশে বিশেষতঃ গরমকালে মাংস কম খাওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস হজম করা কঠিন, বিশেষ করিয়া যখন উহা চর্বিযুক্ত থাকে। খাদ্য-পরিকল্পনা করিবার সময় **বিভিন্ন বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া, ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য** ও দৈনিক প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিতে হয়। দিনের পর দিন যাহাতে একই প্রকার আহার্য প্রস্তুত না হয় উহার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। খাদ্য উপাদানগুলির দৈনিক পরিমাণ মোটামুটি ঠিক রাখিয়া খাদ্য-

দ্রব্যগুলিকে এমনভাবে নির্বাচন বা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে উহা একঘেয়ে, বিরস ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া না যায়।

## ছোট ছেলেমেয়েদের খাদ্য

বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন। বয়স অনুযায়ী খাদ্য-উপাদান ও খাদ্যের প্রকারের তারতম্য হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ সবে গঠিত হইতেছে, উহাদের বয়স বর্ধিষ্ণু। বর্ধিষ্ণু বয়সে দেহ-গঠনকারী খাদ্যের প্রয়োজন অধিক।




বর্ধিষ্ণু বালক বালিকার দেহ গঠনকারী প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন

ঐ বয়সের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও লবণ থাকা আবশ্যক, বিশেষ করিয়া **লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও আয়োডিন**। বর্ধিষ্ণু বালক-বালিকার দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, মাখন বা বাদাম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই প্রোটিন-প্রধান খাদ্য, এবং ইহাদের দেহ-পরিপোষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। বাড়ন্ত বয়সে দেহ-গঠনকারী ও দেহ-পরিপোষক খাদ্যের পরিমাণ ঠিকমত না হইলে, দেখিতে দেখিতে দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে ও উহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। শৈশব হইতে যদি প্রতিদিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুধ, দই, ছানা, মাখন প্রভৃতি শিশুর প্রতিদিনের খাদ্যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুর শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ হইয়া উঠিবে।

পরবর্তী দুইটি তালিকায় বিভিন্ন বয়সে ছেলে ও মেয়েদের কি পরিমাণ প্রোটিন ও কত ক্যালরি প্রয়োজন তাহা দেওয়া গেল :—

| প্রোটিনের পরিমাণ (গ্রাম) | ২—৬ বৎসর বয়স্ক শিশু | ৬—৯ বৎসর বয়স্ক শিশু | ১০—১৭ বৎসর বয়স্ক ছেলে | ১০—১৭ বৎসর বয়স্ক মেয়ে |
|---|---|---|---|---|
| | ৪০—৫০ | ৬০ | ৮০ | ৭৫ |

| ক্যালরির পরিমাণ | শিশুর বয়স — বৎসরে | | বালক-বালিকার বয়স, বৎসরে | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৪—৫ | ৬—৭ | ৮—৯ | ১০—১১ | ১২—১৩ |
| | ১০০০ | ১৩০০ | ১৮০০ | ১৮০০ | ২১০০ |

শিশুর কর্মচাঞ্চল্য এত অধিক ও উহারা এত দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে যে, বয়স অনুপাতে উহাদের কত তাপশক্তির খাদ্যের প্রয়োজন উহা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। তবে উহাদের খাদ্যে যদি প্রত্যহ একটি করিয়া **ডিম, ৪ গেলাস দুধ,** কিছু **মাখন,** কিছু **টাটকা ফল,** কিছু **সবজি,** ভাতের সঙ্গে **ভাল ঘি,** এবং **ডাল** ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে—উহাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি অনুযায়ী খাদ্য রচনা করা হইয়াছে।

সুষম ও আদর্শ খাদ্য, খাদ্য ও দেহের পুষ্টি, শিশুর খাদ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় পড়িলে। গৃহ কাহাকে বলে, গৃহ-রচনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্য কি, ও গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন কাজগুলি সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়াছে। তোমরা কৈশোর অতিক্রম করিয়াছ, বাস্তবের সহিত তোমরা প্রতিনিয়তই নূতন করিয়া পরিচিত হইতেছ। তোমাদের সামনে এখন বাস্তব জীবনের আসল সংসার—আমাদের নূতন সমাজ। শিশুর খেলাঘর তোমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছ। এই সংসারকে আসল রূপ দিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ তোমাদের। এই নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিবার ভার লইবে তোমরাই। এই কারণেই, গৃহ-শিল্প ও গৃহ-বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি তোমাদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। গৃহ-বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, উহাকে গৃহ-পরিচালনার প্রতি কাজে প্রয়োগ কর। একমাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই গৃহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। গৃহ বলিতে কেবলমাত্র একটি আশ্রয়স্থান বুঝায় না। গৃহের

অর্থই একটি **শিক্ষার কেন্দ্র, সৌন্দর্যের আকর** ও একটি **শান্তির উৎস**। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির নিলয় এইরূপ এক-একখানি গৃহ সমাজের সম্পদ জানিবে। এই গৃহই গড়িয়া তুলিবে সমাজের ভবিষ্যৎ মানুষ। এই গৃহই ফুটাইবে ভাবী




উহাদের খাদ্যে ডিম, মাছ ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন

মানুষের বুদ্ধির দীপ্তি, আনিবে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। গৃহের উপরই নির্ভর করিবে উহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। গৃহই সমাজের একমাত্র ভিত্তি ও ভরসা জানিবে। এই গৃহ রচনা করিবার গুরুদায়িত্ব তোমাদের। অর্থাৎ সমাজের ভাবী মানুষের জীবনকে যথাযথ রূপ দিবার কঠিন কাজটি অর্পিত হইয়াছে **তোমাদেরই উপর**। এই কাজে সাফল্য অর্জন করা সহজ হইবে না—যদি না তোমরা গৃহের পরিচ্ছন্নতা, প্রসাধন, গৃহের পরিচালনা, খাদ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি গৃহ-রচনার প্রতি কাজে, গৃহ-বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলি প্রয়োগ করিতে পার। সুতরাং তোমরা **গৃহ-বিজ্ঞানকে গ্রহণ** কর—উহাকে জীবনের সঙ্গে জড়িত কর। বিজ্ঞানের প্রয়োগে উন্নততর গৃহ-রচনায় ও জীবনযাত্রায় অগ্রণী হও। বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে। আজ বাংলাদেশের ঘর ও জীবন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির সমন্বয়ে তোমরা সেই **লুপ্ত শ্রীকে ফিরাইয়া আন**, এবং জাতির জীবনকে **মনোরম, ও লোভনীয়** করিয়া তোল।

## শ্রেণীর কাজ

১। একটি আদর্শ গৃহের পরিকল্পনা কর।

২। তোমাদের স্কুলবাড়ীর হলঘরের কোণগুলি আলপনা আঁকিয়া সজ্জিত কর; আলপনার একটি নক্‌শা অঙ্কিত কর।

৩। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ আলপনা কিরূপ হয়, একটি নক্‌শা অঙ্কিত করিয়া দেখাও।

৪। তোমাদের আসবাবপত্রাদি পরিষ্কার করিয়া পালিশ লাগাও।

৫। ফুল ও সব্‌জির বাগান করিয়া উহাতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও সব্‌জি উৎপন্ন কর।

৬। তোমাদের পশমের কাপড়-চোপড়গুলি যথাযথভাবে পরিষ্কার করিয়া সুবিন্যস্ত কর।

৭। মাছ ও মাংসের তরকারি বানাও। ডিমের ওমলেট প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যগুলি প্রস্তুত কর।

৮। 'সব্‌জির সুপ' ও চাপাটি তৈয়ারি কর।

## অনুশীলনী

### গৃহ

১। গৃহ-নির্মাণের বিভিন্ন উপাদানগুলির নাম কর। গৃহ-নির্মাণে নক্‌শার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। বায়ুর বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। বন্ধ ঘরে আমরা অসুস্থ বোধ করি কেন?

৩। জল দূষিত হইবার কারণ কি? জল বিশোধিত করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। গৃহে বিশুদ্ধভাবে জল সংরক্ষণ করিতে হইলে তুমি কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

### গৃহ-সজ্জা

১। কি কি উপায়ে দেওয়ালের সজ্জা রচনা করা যাইতে পারে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। দেওয়াল সজ্জায় চিত্র সন্নিবেশের স্থান নির্ণয় কর। কোন কক্ষের দেওয়ালে চিত্র-সন্নিবেশ করিতে হইলে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ?

৩। পার্সিয়ান কার্পেটের বৈশিষ্ট কি ? উহার রং ও নক্‌শা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। কোনও কক্ষে পর্দা সংযোজনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রাত দৃষ্টি রাখিবে ? ঘরের আবহাওয়ার উপর পর্দার রং কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৫। আসবাবপত্র নির্বাচন করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ? আসবাবপত্র সন্নিবেশ করিতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে, সংক্ষেপে লিখ।

৬। পুষ্পবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি কি, সংক্ষেপে লিখ। তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তুমি কোন্ কোন্ পুষ্প কিরূপ আধারে কিভাবে বিন্যস্ত করিতে চাও, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। 'আলপনা একটি মণ্ডনশিল্প'—এই উক্তিটির তাৎপর্য কি বুঝাইয়া দাও।

## গৃহ-পরিচালনা

১। গৃহ-পরিচালনায় শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা কি ও উহা কিভাবে করিবে সংক্ষেপে লিখ।

২। 'গৃহের সুশৃঙ্খল পরিচালনা সময়-তালিকার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে'—এই উক্তির সত্যতা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত কর।

৩। গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এইরূপ কতকগুলি কীট-পতঙ্গের নাম কর। এই সকল কীট-পতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিবে লিখ।

৪। তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন পরিষ্কার করিবার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা কর।

৫। লোহায় মরিচা পড়িবার কারণ কি ? মরিচার দাগ উঠাইতে হইলে তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে।

৬। জলের মধ্যে কিছুদিন কোনও ধাতুনির্মিত বাসন বসাইয়া রাখিলে দেখিয়াছ নিশ্চয়ই, উহার চারিধারে একটি নীল দাগ পড়ে। এই নীল দাগ পড়িবার কারণ কি ও উহা উঠাইবে কি প্রকারে, সংক্ষেপে বল।

৭। কাপড়ে অত্যধিক ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগের অপকারিতা কি? গঁদের কলপ তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৮। পশমের বোনা একটি জাম্পার পরিষ্কার করিতে হইলে তুমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিবে, বিশদভাবে বর্ণনা কর। পশমের কাপড় ইস্ত্রি করিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে?

৯। রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। সিদ্ধ করা, ভাজা ও দমে সিদ্ধ করা ( Stewing )—এই তিনটি প্রক্রিয়ার গুণাগুণ দেখাইয়া একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও।

১০। আগুনে ঝল্‌সানো ও ভাপে সিদ্ধ করা কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

## খাদ্য

১। 'ভাইটামিন' বা 'খাদ্যপ্রাণ' কাহাকে বলে? কত রকমের 'ভাইটামিন' আছে নাম কর ও আমাদের দেহে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। 'ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগ' কাহাকে বলে? কয়েকটি এইরূপ রোগের নাম কর ও উহাদের প্রতিরোধ করিবার উপায় কি লিখ।

৩। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় 'এ' ও 'সি' ভাইটামিনের স্থান নির্ণয় কর। 'এ' ও 'সি' ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে এরূপ কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

৪। খনিজ লবণ খাদ্য-বিভাগের কোন্ পর্যায়ে পড়ে? কয়েকটি প্রধান খনিজ লবণের নাম কর, ও আমাদের দেহে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। 'সুষম খাদ্য' কাহাকে বলে? খাদ্যের তাপমূল্য বলিতে কি বুঝায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

৬। একজন সুস্থ, পরিণত-বয়স্ক, শ্রমশীল ব্যক্তির জন্য একটি সুষম খাদ্য-তালিকা প্রণয়ন কর।